সরোজিনী

সরোজিনী

শ্রীঅমলা দেবী

রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড : কলিকাতা-৩৭

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৪৯

পুনর্মুদ্রণ—বৈশাখ ১৩৫৭

মূল্য চার টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭
হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
১১—১৬. ৫. ৫০

শ্রীযুক্ত ললিতানন্দ গুপ্ত

শ্রীচরণেষু

১

বিকালে বেড়াইতে বাহির হইতেছিলাম। পত্নী আসিয়া কহিলেন, রাত ক'রো না, সন্ধ্যে হবার আগেই ফিরবে। কহিলাম, কেন? পত্নী হাসিবার উপক্রম করিয়াই গম্ভীর হইয়া কহিলেন, জান না নাকি? পাড়ায় যে একটা পেত্নীর ভর হয়েছে। সভয়ে কহিলাম, তাই নাকি? কোথায়? পত্নী ফিক করিয়া হাসিয়া কহিলেন, গাঙুলীদের প'ড়ো বাড়িতে। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সন্ধ্যা হইতে বেশি দেরি নাই, অথচ ঐ পেত্নী-আশ্রিত বাড়িটার পাশ দিয়াই যাইতে হইবে এবং ফিরিতেও হইবে, অতএব কাজ নাই বেড়াইতে গিয়া। ফিরিবার উপক্রম করিতেই পত্নী কহিলেন, যাবে না? মাথা চুলকাইয়া কহিলাম, থাকগে, আজ বেশি বেলা নেই, তা ছাড়া গাঙুলী মশায় সকাল সকাল ছাড়তে চান না, রাত্রে একটু কাজও আছে আমার।

পত্নী সাহস দিয়া কহিলেন, না, যাও, একটু ঘুরেই এসগে, গাঙুলী বুড়োর কাছে নাই বা গেলে। মুচকি হাসিয়া কহিলেন, দিনের আলোতে তো পেত্নী কিছু করে না, অন্ধকারেই ভয়।

গাঙুলী মশায়ের বাড়ির দিকেই চলিলাম। ইহা ছাড়া আর যাইবার জায়গাই বা কোথায়? ডাক্তারবাবুর ডাক্তারখানাটি তো আমাদের বিপক্ষ দলের আড্ডা। পা দিলেই টীকা-টিপ্পনীর চোটে অস্থির করিয়া

দিবে। থানায় দারোগাবাবুর কাছে যাওয়া চলে, কিন্তু রাস্তা অনেকখানি। তা ছাড়া হাকিমদের দরবারে হাজিরা দিয়াই উঠিয়া আসা চলে না। বিশেষ করিয়া এই দারোগাবাবুটি এত সাংঘাতিক রকমের ভাল লোক যে, আমাদের মত লোকদেরও পাইলে ছাড়িতে চাহে না, চেয়ারে বসাইয়া, চা, এমন কি, সিগারেট পর্যন্ত খাওয়াইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করেন। কিন্তু আমাদের পাড়ায় পেত্নীর অধিষ্ঠান হইবার তো কোন কথা ছিল না! ও-পাড়ায় অবশ্য দিন কয়েক হইল একটি অল্পবয়সী বউ সন্তান প্রসব করিতে না পারিয়া শনিবারের ভরা সন্ধ্যায় চার পোয়া দোষ মাথায় লইয়া মারা গিয়াছে। পয়সার অভাবে প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। হিন্দুশাস্ত্র, বিশেষ করিয়া, পঞ্জিকা যদি মিথ্যা না হয়, তাহা হইলে মেয়েটির প্রেত-যোনিপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত। কিন্তু ও-পাড়ার পেত্নী এ পাড়ায় কেন? পেত্নী হইলেও বেআইনী কাজ করা উচিত নয়।

গাঙ্গুলী মশায়ের বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া দেখিলাম, আমাদের হারাণ আসিতেছে। হারাণ কালো, মোটা, মাথার ঠিক মাঝখানটিতে একটি ডবল পয়সার মত গোল টাক, মাকুন্দে মুখ, গায়ে গেঞ্জি, কাপড় ফেরতা দিয়া পরা, পা খালি। হারাণ চক্রবর্তীর বাবা তেজারতি করিয়া অনেক বিষয়-আশয় কিনিয়া রাখিয়া মারা গিয়াছে। কাজেই হারাণকে কোন কাজকর্ম করিতে হয় না, কেবল খাইতে, ঘুমাইতে, আড্ডা মারিতে, পরচর্চা ও পরছিদ্রান্বেষণ করিতে হয়। আমাকে দেখিয়া হারাণ একগাল হাসিয়া কহিল, কি ভায়া, কখন ফিরলে? জজিয়তি হয়ে গেল?

বলিয়া রাখি, দিন কয়েকের জন্য জেলায় সেসন্স-কোর্টে একটা খুনের মকদ্দমায় জুরি হইয়া গিয়াছিলাম, কহিলাম, আজ সকালে।

ঝুলিয়ে এলে নাকি ?

না, খালাস। কথাটি উল্টাইয়া দিয়া কহিলাম, গাঙুলী মশায়ের খবর কি ? বাড়িতে রয়েছেন তো ? হারাণ এক মুহূর্তে মুখের ভাব বদলাইয়া চিন্তাকুল হইয়া উঠিল এবং টাকের মাঝখানটিতে ডান হাতের তর্জনী দিয়া খুঁটিতে খুঁটিতে কহিল, তাই তো ভায়া, বড় শক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছ ! গাঙুলী মশায়ের কোন বিপদ-আপদ হইয়াছে নাকি ? উৎকণ্ঠিতভাবে কহিলাম, কি ব্যাপার, কোন অসুখ নাকি ? হাতটি মাথা হইতে নামাইয়া গাল চুলকাইতে চুলকাইতে হারাণ কহিল, অসুখ, না, সুখ, জানব কি ক'রে ! দুদিন ধ'রে গাঙুলী বুড়োর টিকি পর্যন্ত দেখা যায় নি। গিন্নীকে জিজ্ঞাসা করলেই ফ্যাসফ্যাস ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ছে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মুচকি হাসিয়া কহিল, পাড়ার লোকে বলছে, বুড়োকে পেত্নীতে পেয়েছে।

বিস্ময়ের সহিত কহিলাম, তার মানে ? পুরাপুরি হাসিয়া হারাণ কহিল, মানে অনেক কিছু, যাও না গিন্নীর কাছে, তোমাকে হয়তো সব কথা খুলে বলবে। হারাণকে ধরিয়া রাখিবার জন্য কহিলাম, তুমিও চল না, একসঙ্গে বাড়ি ফিরব এখন। হারাণ কহিল, না ভাই, আমি আর যাব না, সন্ধ্যে হয়ে আসছে, কনেবউ সন্ধ্যের পরে বাইরে থাকতে মানা করেছে।—বলিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

হায় হায় ! পেত্নীটা শেষে বৃদ্ধ গাঙুলী মশায়ের স্কন্ধে ভর করিল ! গ্রামে কি আর শক্ত-সমর্থ স্কন্ধ খুঁজিয়া পাইল না ! কিন্তু যে স্কন্ধে গাঙুলী-গিন্নীর মত স্ত্রীলোক আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া কায়েমী হইয়া বিরাজ করিতেছে, সেখানে ভাগ বসাইতে যাইয়া এই নবীনা পেত্নীটি কি ভাল কাজ করিয়াছে ?

গাঙুলী মশায়ের বাড়িতে আসিয়া বার দুই হাঁকাহাঁকি করিয়া ও

বার কয়েক গলা-খাঁকারি দিয়া ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম, উঠানে আসন পাতিয়া দুই পা মেলিয়া বসিয়া, গাঙ্গুলী-গিন্নী সলিতা পাকাইতেছেন। মাথার ও গায়ের কাপড় খুলিয়া ফেলিয়াছেন এবং বাম পায়ের হাঁটুর উপর পর্যন্ত কাপড় সরাইয়া দিয়া, বাম হাত দিয়া পুরাতন বস্ত্রখণ্ডটি অনাবৃত উরুদেশের উপর ধরিয়া ডান হাতের চাপ দিয়া দিয়া সেটিকে পাকাইয়া সলিতায় রূপান্তরিত করিতেছেন। আমাকে একবার কটাক্ষে দেখিয়া লইয়া আবার গম্ভীর বদনে নিজের কাজ করিতে লাগিলেন। অঙ্গের আবৃত ও অনাবৃত অংশের অনুপাত অপরিবর্তিত রহিল। মনটা ছোট হইয়া গেল। কথা না বলুন, কিন্তু আমার মত একজন পুরাদস্তুর পুরুষমানুষকে দেখিয়াও বেপরোয়া বসিয়া রহিলেন! বিন্দুমাত্র লজ্জা করিলেন না! আমাকে কি এখনও ছেলেমানুষ মনে করেন, না, আজকাল চোখে কম দেখিতেছেন! যাহাই করুন, তাঁহাকে লজ্জিতা হইয়া উঠিবার সুযোগ দিবার জন্য আর একবার গলা-খাঁকারি দিলাম। ফলে লজ্জার না হোক, বাক্‌শক্তির আবির্ভাব ঘটিল, গলা ঝাড়তে হবে না, দেখতে পেয়েছি। কহিলাম, পেয়েছেন তো একটু সামলে বসুন, একেবারে জখম হয়ে গেলাম যে! দিদিমা গায়ে কাপড় তুলিয়া গম্ভীর মুখে কহিলেন, জখম করবার যদি ক্ষমতা থাকত তো অমনই খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতে? এতক্ষণ পায়ের তলায় লুটোপুটি খেতে।

তাই তো ইচ্ছে করছে দিদিমা। নেহাত খালি উঠানটা ব'লে পেরে উঠছি না, একটা মাদুর-টাদুর—

থাক্‌, আর লুটোপুটি খেয়ে কাজ নেই, ইচ্ছে হয় তো ঐ মোড়াটা নিয়ে ব'স। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, আজ না হয় বুড়ী হয়েছি, কিন্তু এমন দিন ছিল, একবার চোখে দেখবার জন্যে তোমার মত

অনেক সিঙ্গে রাস্তার ধারে ঘুরঘুর করত ; তাও তোমাদের বউদের মত মুখ খুলে মেমসায়েবদের মত বেড়িয়ে বেড়াবার রেওয়াজ ছিল না তখন, ঘরে বাইরে চব্বিশ ঘণ্টা এক হাত ঘোমটা দিতে হ'ত।

মোড়াটা টানিয়া লইয়া দিদিমার সামনে বসিয়া কহিলাম, সত্যি দিদিমা, এখনই দেখে আমার বুকের ভেতরটা কি রকম ক'রে উঠছে, চল্লিশ বছর আগে আপনাকে এমন ক'রে দেখলে কি যে ক'রে বসতাম বলা যায় না. হয়তো—

দিদিমা হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, নিয়ে সটকাতে, এই তো ? কিন্তু তোমার দাদামশায়ের লাঠি ছিল না ? মাথা একেবারে ভেঙে দিত। আজকালই এমনই অগ্রাহ্যি, আগে একদণ্ড ও কাছ-ছাড়া হ'ত নাকি ! সব সময়ে চোখে চোখে রাখত, আর কি সন্দেহ ! দেওরদের সঙ্গে পর্যন্ত হেসে কথা কইবার জো ছিল না. ভিখিরীদের ভিক্ষে দিতে গেলে রেগে আগুন হয়ে যেত। প্রবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, এখন বলে কিনা, বুড়ী মাগীর মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না !

উৎসুক কণ্ঠে কহিলাম, কি ব্যাপার দিদিমা ? দাদামশায়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছেন বুঝি ?

দিদিমা খ্যাঁক করিয়া উঠিলেন, ঐ তোমার একচোখোমি। আমিই কেবল ঝগড়া করি ! তোমার দাদামশায়টি একেবারে পরমহংসদেব ! আমি যে কত সহ্যি করি কি ক'রে জানবে ? কথায় কথায় বুড়ী, ঢিপসী, তুবড়ী—সহ্যি হয় ? আর বয়েস কি আমার একলার হয়েছে, ওর হয় নি ? আমারই দাঁত পড়েছে, ওর পড়ে নি ? আমি যদি উল্টে বলি, বুড়ো, ঢিপসে, তোবড়া, তবে ?

ব্যাপারটা পরিষ্কার করিবার জন্য কহিলাম, আমাকে সব খুলে বলুন দেখি, আমি মিটমাট ক'রে দিচ্ছি।

দিদিমা কহিলেন, ঝগড়া-টগড়া কিছু নয় যে, মিটমাট করতে হবে। ভাল কথা বলতে গেলাম, তো রেগে টঙ হয়ে সকালে বেরিয়ে গেল, এখনও ঘর ঢুকল না।

প্রশ্ন করলাম, কি ভাল কথা বলেছেন ?

দিদিমা জবাব না দিয়া ডান হাত দিয়া বাম হাতের শাঁখাটি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে কহিলেন, আচ্ছা ভাই, ওর বয়েস হয় নি ? আমার চেয়ে দশ বছরের বড়, আমারই পঞ্চাশ পার হতে গেল—

কহিলাম, নিশ্চয়ই। কিন্তু দিদিমা, আপনাকে দেখলে কিন্তু এত বয়স ব'লে মনে হয় না। মনে হয় খুব জোর ত্রিশ, কি—

দিদিমা ধমক দিয়া কহিলেন, থাক্, আর তোষামোদি করতে হবে না। যা বলছি শোন, বয়েস ওর হয়েছে, আমিই খাইয়ে-দাইয়ে তরিবৎ ক'রে অমনিটি রেখেছি তাই, নইলে ষাট বছরের বুড়ো, তা যতই দাঁত বাঁধিয়ে মেরজাই গায়ে দিয়ে ছোকরা সেজে ঘুরে বেড়াক।

চুপ করিয়া চাহিয়া রহিলাম।

দিদিমা বলিতে লাগিলেন, তা এখন পূজো-আচা ক'রে পরলোকের কাজ গোছানো উচিত, না, একটা ছুঁড়ী বিধবার পেছনে ছুটোছুটি করা উচিত ? বনজঙ্গল নয়, সমাজ জায়গা—লোকে কি বলছে বল দেখি !

ব্যাপার খুব ঘোরালো বলিয়া মনে হইতেছে, কহিলাম, কিছুই তো বুঝতে পারছি না, সব কথা খুলে বলুন।

দিদিমা আবার ধমক দিলেন, ন্যাকামি দেখলে গা জ্বালা করে ! সব কাজের সাগরেদ তুমি, তুমি কিছু জান না ?

সত্যি বলছি দিদিমা, আমি তো ছিলাম না দিন কয়েক।

দিদিমা দুই চোখ ডাগর করিয়া কহিলেন, তুমি আবার কোথায়

গিয়েছিলে ? নাত-বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বাড়ি পালানো শুরু করেছ বুঝি ?

হাসিয়া কহিলাম, না না, জেলায় গিয়েছিলাম, একটু কাজ ছিল।

দিদিমা দুই ভ্রূ তুলিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, ওঃ, তাই। আমি বলি—। তা যাক, শোন তবে, প্রবোধ ঠাকুরপোর বিধবা বউটা ফিরে এসেছে, শুনেছ তো ?

সবিস্ময়ে কহিলাম, না, কখন এসেছে ?

পরশু। এক বছর স্বামী মরেছে, এতদিন পরে স্বামীর ভিটের কথা মনে পড়ল। বুড়ো শাশুড়ীকে নিয়ে নাকি এতদিন তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।—বলিয়া যুগপৎ ভ্রূ ও অধরোষ্ঠ কুঞ্চিত করিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, নেহাত কচি বয়েস, ছেলেপিলে একটাও হয় নি। পশ্চিমে ছিল, যেমন শরীর হয়েছে, তেমনই গায়ের রঙ, রূপ যেন ফেটে পড়ছে। প্রবোধ ঠাকুরপোকে তখন বার বার মানা করেছিলাম বিয়ে করতে, তোমার দাদামশায়ের পরামর্শেই এ কাজ করলে কিনা! মিছিমিছি মেয়েটার সারা জীবনটা মাটি ক'রে দিয়ে গেল। টাকা-কড়ি ধন-দৌলত যাই থাক্, তাতে কি মেয়েমানুষের মন মানে ? একটা ছেলে, নেহাত একটা মেয়ে থাকলেও হ'ত।—বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

* * *

প্রবোধ গাঙুলী পশ্চিমে রেলের কণ্ট্রাক্টারি করিয়া অনেক টাকা উপার্জন করিত। দেশে পৈতৃক জমিদারি অনেক বাড়াইয়াছিল এবং কর্মস্থানেও নাকি বিস্তর সম্পত্তি করিয়াছিল। বৎসর ছয় পূর্বে বিপত্নীক হইয়া দেশে ফিরিয়া প্রচার করিল, এ সংসারে আর থাকিবে

না, সন্ন্যাস লইবে; গুরু ও গেরুয়া দুইই সংগৃহীত হইয়াছে; শুধু গুরুদেবের আদেশে পৈতৃক ভিটা জন্মের মত একবার শেষ দেখা দেখিবার জন্য দেশে আসিয়াছে। প্রবোধের গুরুজন স্থানীয় ও স্থানীয়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা 'হায়-হায়' করিয়া উঠিল, প্রবোধের মত ছেলে সংসারে থাকিবে না তো কাহাদের জন্য সংসার? এতবড় জমিদারি, এত টাকা, এত সুখ, এত স্ফূর্তি ছাড়িয়া প্রবোধের কি সন্ন্যাসী হওয়া চলে? প্রবোধ পরম বৈরাগ্যের সহিত কহিল, চলে, বুদ্ধদেব রাজার ছেলে ছিলেন। প্রবোধ এণ্ট্রান্স ক্লাসে ইতিহাস পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহার শ্রোতাদের সে সৌভাগ্য হয় নাই। তাহারা বলিয়া উঠিল, ওসব বুদ্ধু-টুদ্ধুর কথা থাক্। প্রবোধের সন্ন্যাসী হওয়া চলিবে না।

প্রবোধ বলিল, কি হবে সংসারে থেকে? ছেলেপিলে নেই—

বলিতে না বলিতে দুই হইতে দ্বাদশ বৎসর বয়সের এক ডজন ছেলে প্রবোধের সামনে আনীত হইল। প্রবোধ যাহাকে ইচ্ছা এখনই পোষ্যপুত্র লউক। প্রবোধ ঘাড় ও হাত নাড়িয়া কহিল, এখন না, পরে ভেবে স্থির করব।

গাঙুলী মশায় গোপনে প্রবোধকে কহিলেন, পোষ্যপুত্র নিয়ে কি হবে? পরের ছেলে কখনও আপনার হয় না, একটা পুরোপুরি স্বকীয় ছেলের ব্যবস্থা কর।

প্রবোধ আন্দাজে গাঙুলী মশায়ের বক্তব্য বুঝিয়া মৃদু হাস্য সহকারে কহিল, কি করতে বলছেন? বিয়ে? এই পঞ্চাশ বছর বয়সী বুড়োকে কে মেয়ে দেবে?

গাঙুলী মশায় কহিলেন, কুলীন বামুনের বয়েস! খাবি খেতে খেতে বিয়ে করতে চাইলেও আমাদের কনের অভাব হয় না।

পরদিন প্রচার হইয়া গেল, প্রবোধ গাঙুলী বিবাহ করিবে।

গ্রামের কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতাদের মহলে হিড়িক পড়িয়া গেল; তাহারা নিজ নিজ বিবাহযোগ্যা মেয়েগুলিকে প্রবোধের সামনে হাজির করিয়া রূপ ও গুণের পরীক্ষা দেওয়াইল, এবং শেষে মণীন্দ্র চক্রবর্তীর পিতৃহীনা মামাতো বোন সপ্তদশী সরোজিনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া প্রবোধের পত্নীত্ব লাভ করিল।

সরোজিনীর কথা মনে পড়িল,—শান্তশিষ্ট লাজুক মেয়েটি, ছিপছিপে গঠন, দুধে-আলতা-গোলা গায়ের রঙ। প্রবোধের সামনে যখন চুলের মাপ দিতেছিল, কাছে দাঁড়াইয়া দেখিয়াছিলাম, ঘনকৃষ্ণ চুলের রাশি পিঠ ছাপাইয়া হাঁটু পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। লম্বা ধরনের মুখ, টানা-টানা না হউক, সুন্দর ডাগর চোখ, সুগঠিত চিবুকপ্রান্তে একটি অকৃত্রিম তিল। মনু চক্রবর্তীর যে এমন সুন্দরী বোন ছিল, তাহা কে জানিত! এ যেন ভিক্ষার ঝুলি হইতে লাখ টাকার হীরা বাহির করিয়া মনু গ্রামের ছোকরাদের তাক লাগাইয়া দিল।

আমরা সকলেই এমন চমৎকার মেয়েটিকে নিশ্চিত অকাল-বৈধব্যের কবলে সঁপিয়া দেওয়ার জন্য মনুকে গঞ্জনা দিতে লাগিলাম। কিন্তু গ্রামের প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধারা তাহার পক্ষাবলম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন, মনু বেশ কাজ করিয়াছে, অদৃষ্টে থাকিলে ওই স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া, সিঁথিতে সিন্দুর লইয়া সরোজিনী মরিবে; তা ছাড়া এত টাকা, এত সুখ, এত সম্পত্তি!

* * *

দিদিমা বলিতে লাগিলেন, বুড়ী শাশুড়ী চোখে দেখতে পায় না, কে যে ওই মেয়েকে সামলাবে!

বলিলাম, কেন? সরোজিনী তো খুব শান্তশিষ্ট মেয়ে।

দিদিমা ঠোঁট উল্টাইয়া কহিলেন, শান্তশিষ্ট মেয়ে! দেখে এসগে

একবার, মেয়ে যেন উড়ছে! বিধবা হয়েছিস, থান-কাপড় পরবি, শুধু-হাত করবি, স্বামীর জন্যে দিনরাত কাঁদবি-কাটবি, তা নয়,—পরনে ধোপদস্ত কালাপেড়ে শাড়ি, গায়ে এক গা গয়না, চুলের তেমনই বাহার।

আপনি কি দেখতে গিয়েছিলেন নাকি?

দুই হাতের প্রসারিত বৃদ্ধাঙ্গুলি সামনের দিকে উঁচাইয়া দিদিমা কহিলেন, আমার দায় পড়েছে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, তোমার দাদামশায়টি যত নষ্টের গুরু কিনা! বউটা ওর ভাইয়ের ওখানে উঠতে যাচ্ছিল, তা মিন্সের মাথা টনটন ক'রে উঠল, গাঙুলী-বাড়ির বউ হয়ে চক্রবর্তীর বাড়িতে উঠবে! তা হ'লে সৃষ্টি রসাতলে যাবে যে! ব'লে শাশুড়ী বউকে টেনে এনে বাড়িতে ঢোকাল। হঠাৎ নাকী সুর ধরিয়া কহিলেন, এ ক'দিন আমার যে কি ক'রে কেটেছে ভাই, আমিই জানি, চোখ মেলে তাকাই নি, কানে শুনি নি।

প্রশ্ন করিলাম, কেন?

দিদিমা তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, কেন? দেখা যায়? শোনা যায়? বাপের বয়েসী বড়ঠাকুর, তার সামনে মাথার কাপড় খুলে ফরফর ক'রে ঘুরে বেড়ানো, রাতদিন আড়ালে-আবডালে গনগন ফসফস! কি করি, নতুন লোক, তা ছাড়া লোকের কথার ভয়, নইলে মনে হচ্ছিল, ঝেঁটিয়ে বার ক'রে দিই। সহসা কণ্ঠস্বর করুণ পর্দায় নামাইয়া কহিলেন, আহা! শাশুড়ী মাগীটা বড় ভাল। ছেলের জন্যে দিনরাত দুধারা বইছে। চোখে দেখতে পায় না, বউয়ের ভয়ে সন্ত্রস্ত। ওই বউয়ের হাতে অনেক হেনস্তা হবে মাগীর, আমি ব'লে দিলাম তোমাকে। কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ উঁচু পর্দায় চড়াইয়া কহিলেন, কিন্তু ওই ছুঁড়ীর? একটুও কষ্ট হয় নি। দিনরাত কেবল টাকা, টাকা আর টাকা। কোথায় কোন্ খাতকের

দলিল তামাদি হচ্ছে, কোন্ প্রজা খাজনা ফাঁকি দিয়ে জমি খাচ্ছে, কে কোথায় ওর জায়গা মেরে নেবার চেষ্টা করছে, ছুঁড়ী সব খবর জানে। প্রবোধ ঠাকুরপোকে বোধ করি মরবার সময়ে ইষ্টনাম পর্যন্ত করতে দেয় নি। আর কত চালাক! দলিলের হাতবাক্সটি কিছুতে হাতছাড়া করছে না। তোমার দাদামশায় কত বললে, একবার দাও দলিলগুলো, দেখি, না হ'লে বুঝব কি ক'রে, ব্যবস্থাই বা করব কি ক'রে, তা ছুঁড়ী কেবল মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

আর দাদামশায় কি করলেন?

রোষ-কষায়িত লোচনে দিদিমা কহিলেন, ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকতে লাগলেন। যেন কেউ কখনও অমন ক'রে হাসে নি। দাঁত কিড়মিড় করিয়া কহিলেন, ও হাসি ছুঁড়ীর থাকবে না, তুমি দেখো, মুখ ওর পুড়বে। গাঙুলী-বাড়ির মাথা নীচু হবে ব'লে তোমার দাদামশায় মাথা ঘামিয়ে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু ওই মেয়েই গাঙুলী-বাড়ির মাথা মাটিতে লুটিয়ে দেবে, আমি ব'লে দিচ্ছি।

কহিলাম, কখন গেছে ওরা এ বাড়ি থেকে?

দিদিমা কহিলেন, ছাড়তে কি চায় তোমার দাদামশায়! বলে, ঘরের বউ, শোকটা একটু সামলাক, তারপর যাবে। শোকে তো একেবারে উল্টে যাচ্ছে মেয়ে! আমি বললাম, ঘরদোর ওদের পরিষ্কার হয়েছে, সেইখানেই গিয়ে শোক সামলাক ওরা। আমার সংসারে আর আমি রাখতে পারব না, তা কি রাগ মিন্সের! কাল বিকেলে নিয়ে গেল সব ওখানে। আবার, ছুঁড়ীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলা হ'ল, ওই কিপটে মাগীর সহ্য হচ্ছে না তোমাদের এখানে থাকা, মাগী ধান-চাল টাকা-কড়ি মরবার সময় গাঁটরি বেঁধে নিয়ে যাবে। তা শুনে ছুঁড়ীর কি ফিকফিক হাসি! যাবার সময় একটা পেনাম পর্যন্ত ক'রে গেল না!

দাদামশায় কাল ফিরলেন কখন ?

ওই নিয়েই তো ঝগড়া সকালে। কাল সন্ধ্যে থেকে হা-পিত্যেশ ক'রে ব'সে রইলাম, এই আসে, এই আসে! এল কিনা দুপুর রাত্রি পার ক'রে একেবারে খেয়ে-দেয়ে! পাড়ার লোক বলছে, ওখানেই নাকি ভাশুর-ভাদ্রবউ মিলে রান্না করেছে,—কত হাসি! কত মস্করা! পাড়ায় ঢি-ঢি প'ড়ে গেছে। হঠাৎ কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ করিয়া কহিলেন, বাঁচতে ইচ্ছে হয় না ভাই। মনে হচ্ছে, বিষ খেয়ে কিংবা গলায় দড়ি দিয়ে মরি। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বাষ্প-লেশ-শূন্য কণ্ঠে কহিলেন, তাই বললাম সকালে, গাঁসুদ্ধ ছেলে বুড়ো বউ ঝি তোমাকে গাঁয়ের মাথা ব'লে মানে, বুড়ো বয়েসে কেলেঙ্কারি ক'রে সেই মাথা হেঁট ক'রো না, তা কি রাগ! বলে, নিজের দাঁত পড়েছে, চুল পেকেছে ব'লে বিশ্ব-সুদ্ধু সবাইকে বুড়োই দেখছে, মাগীকে দেখলে গা ঘিনঘিন করে। আবার নাকী সুরে কহিলেন, এই কথা আমাকে বলা! এই সহ্য করব আমি! ভারি রাগ হ'ল; ঝাঁটা হাতে ক'রে বললাম, যাও দেখি কোথা যাবে! এক পা বাড়ালে ঝাঁটা মেরে বিষ ঝেড়ে দোব, তো মিন্সে কথা শুনলে না, আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে চ'লে গেল। অঞ্চলে চক্ষু মার্জিত করিয়া কহিলেন, চল্লিশের পর মেয়েমানুষের বেঁচে থাকা ভাল নয়।

কহিলাম, দুঃখ করবেন না, দাদামশায়ের রাগ তো! এতক্ষণ জল হয়ে গেছে, ফিরে এসে আবার আদর করবেন এখন।

দিদিমা কহিলেন, সারাদিন ফেরে নি। ওইখানেই নেয়েছে, খেয়েছে। যা ইচ্ছে করুক। কিন্তু পাড়ার লোক কি বলছে বল দেখি! সব সহ্যি করতে পারি, কিন্তু ওই যে পাড়ার মেয়েরা দেখলেই 'আহা, উহু' করবে, আর পেছন ফিরলেই মুখ টিপে হাসবে, ও কখনও সহ্যি করতে পারি না. এতদিন সহ্যি করতে হয় নিও।

ব্যাপারটা বুঝিলাম। গাঙ্গুলী মশায়কে এতদিন ধরিয়া দেখিয়া বুঝিয়াছি, মেয়েদের সম্পর্কে কোনরূপ হৃদয়দৌর্বল্যের বালাই তাঁহার নাই। যাহার জন্য তিনি মেয়েটির পাছু লইয়াছেন, তাহা মেয়েটির রূপ-যৌবন নহে, স্বামীপরিত্যক্ত অর্থ ও ভূ-সম্পত্তি। পাছে অন্য কেহ মেয়েটির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাতে ভাগ বসায়, এই ভয়ে তিনি মেয়েটির কাছ-ছাড়া হইতে পারিতেছেন না।

কহিলাম, আপনি কিছু ভাববেন না। আপনি যা ভয় করছেন, তা নয়। মেয়েটির সত্যিই আপনার ব'লে আপনারা ছাড়া কেউ নেই।

দিদিমা ফোঁস করিয়া উঠিয়া কহিলেন, আমরা কিসের আপনার! আমাদের সঙ্গে সাত পুরুষ হয়ে গেছে। ওর বেশি আপনার বরং রাধানাথ।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, কই, রাধানাথ তো নেচে বেড়াচ্ছে না! একবার খবর পর্যন্ত নের নি।

মনে মনে কহিলাম, নিয়েছে, তবে বিশেষ সুবিধে করতে পারে নি বোধ হয়।

উঠিবার উপক্রম করিতেই দিদিমা কহিলেন, ভাই, ভুলিয়ে-ভালিয়ে এনে দাও, তারপর ব্যবস্থা করব আমি।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। শুক্লপক্ষের রাত্রি। কিন্তু পশ্চিম আকাশ মেঘে ঢাকা থাকায় চতুর্থীর চাঁদের ক্ষীণ আলোটুক আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি। কয়েক দিন আগে সপ্তাহ খানেক ধরিয়া বাদল গিয়াছে; ফলে রাস্তার ধারের ঘাসগুলা গজাইয়া উঠিয়াছে, ঝোপ-ঝাপগুলা ঘন হইয়া উঠিয়াছে এবং খানা-ডোবাগুলিতে জল জমিয়াছে। রাস্তার দুই পার্শ্বের আঁস্তাকুড়গুলাতে পচিয়া-উঠা

আবর্জনার গন্ধ নাকে আসিতেছে, এবং ডোবার ধার হইতে ভেকের সবিরাম গর্জন ও ঝোপগুলার মধ্য হইতে মশকের অবিরাম গুঞ্জন শোনা যাইতেছে।

গাঙুলী মশায়ের মতলব কি? সরোজিনীর জমি-জায়গা টাকা-কড়ি গয়না-গাঁটি সব ফুসলাইয়া বাহির করিয়া লইয়া বেচারাকে পথে বসাইতে চান নাকি? কিন্তু রাধানাথ চুপ করিয়া আছে কেন? সে-ই তো শুনিলাম, গাঙুলী মশায়ের চেয়ে সরোজিনীর বেশি আপনার, সে কি বসিয়া বসিয়া গাঙুলী মশায়কে নির্বিবাদে সরোজিনীর সম্পত্তি হজম করিতে দিবে? রাধানাথকে যতদূর জানি, তাহাতে ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। তবে দিদিমা বলিয়াছেন, সরোজিনী অনেক চালাক হইয়াছে, মুখে চোখে নাকি খই ফুটিতেছে! পশ্চিমের জল-হাওয়ার গুণে নেহাত হাবা-গোবা লোকও চালাক-চতুর হইয়া উঠে। তবুও, রাধানাথ ও গাঙুলী মশায়ের টানাটানি সামলাইয়া সরোজিনী তাহার সারা জীবনের সম্বলটুকু বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না।

প্রবোধ গাঙুলীর বাড়ির সামনে হাজির হইলাম। রাস্তার ধারেই দোতলা পাকা বাড়ি; বাড়ির ডান পাশে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা পড়িয়া আছে, পিছনে কিছু দূরে বাউরী ও মুচী পাড়া। রাস্তার উপরেই ফটক, আগে কাঠের দরজা ছিল, এখন ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ফটক পার হইলেই ডান দিকে বৈঠকখানা এবং কয়েক পা আগাইলেই সামনে সদর-দরজা। দেখিলাম, বৈঠকখানা অন্ধকার, বাড়ির ভিতরে আলো জ্বলিতেছে।

গাঙুলী মশায় কি আজও এখানে নৈশ-ভোজন সারিয়া বাড়ি ফিরিবেন নাকি? ওদিকে তো দিদিমা বিরহানলে দগ্ধপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু গাঙুলী মশায়কে বাহির করিয়া আনিব কিরূপে?

হাঁকাহাকি করিলে কি ভাল দেখাইবে? আমি আসিয়াছি জানিতে পারিলে দাদামশায় নিশ্চয়ই বাহির হইয়া আসিবেন। কিন্তু ইহা জানাইবার দুইটি মাত্র উপায় আছে; প্রথম, গলা-খাঁকারি দেওয়া; দ্বিতীয়, গান গাওয়া। প্রথমটির সম্বন্ধে আপত্তি এই, আমার গলা-খাঁকারির যে বিশেষ ধরনটি আমার ব্যক্তিত্বের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তাহা পৃথিবীর একটি মাত্র লোকের কাছেই বিশেষ পরিচিত। কাজেই, গাঙ্গুলী মশায় আমার গলা-খাঁকারি বিপক্ষদলীয় কাহারও—বিশেষ করিয়া রাধানাথের মনে করিয়া, হয়তো আরও চাপিয়া বসিবেন। দ্বিতীয় উপায়টি তো আমার পক্ষে একেবারে অচল। কারণ, গান গাহিতে জানি না, এবং জানিলেও একজন স্কুল-শিক্ষকের এমন সময়ে একজন ভদ্রমহিলার (বিশেষ করিয়া সুন্দরী বিধবার) বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া সঙ্গীত-চর্চা করা উচিতও নয়। অতএব—?

এমনই ভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নানাপ্রকার সম্ভব অসম্ভব উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে কে হাঁক দিল, কে, কে হে তুমি?

চমকিয়া চাহিয়া দেখিলাম, অদূরে লণ্ঠন হাতে রাধানাথ দাঁড়াইয়া আছে। রাধানাথের গতিবিধিও তাহা হইলে আরম্ভ হইয়াছে। কহিলাম, আমি। রাধানাথ ধমকাইয়া কহিল, তুমি কে? ভদ্রলোকের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করা হচ্ছে শুনি? রাধানাথ বোধ হয় চিনিতে পারে নাই। লণ্ঠনের আলোকে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য পা বাড়াইতেই রাধানাথ হাঁকিল, খবরদার! আগাবে না, এক পা আগালেই লোক ডাকব।

থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, আমি রাধুদা। রাধানাথ পা দুই আগাইয়া আসিয়া লণ্ঠনটা তুলিয়া ধরিয়া কহিল, অ্যাঁ! তুমি! তোমার এই কাজ—বাড়িতে অমন বউ থাকতে! ছিঃ ছিঃ, রাধানাথ বলে

কি! প্রতিবাদ করিলাম, কি যা-তা বলছ? আমি গাঙ্গুলী মশায়ের খোঁজে এসেছি।

রাধানাথ লণ্ঠনটা নামাইয়া ড্যাবডেবে চোখ দুইটা আরও বড় করিয়া কহিল, বুড়ো কি এখনও রয়েছে নাকি? ওঃ, ছিনে জোঁককেও হার মানিয়েছে দেখছি! আচ্ছা, দাঁড়াও তুমি, আমি এখনই তাড়াচ্ছি বুড়োকে। আমার নিজের বউঠান, আর কোথাকার কে সাউকিরি ফলাতে এসেছে!—বলিয়া রাধানাথ বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরেই বাড়ির ভিতর হইতে রাধানাথের হাঁক শোনা গেল, বুড়ো নেই হে, স'রে পড়। কোমল নারীকণ্ঠের প্রশ্ন শ্রুত হইল, কে ঠাকুরপো? রাধানাথ তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, ঐ আমাদের মাস্টার, গাঙ্গুলী বুড়োর খোঁজ করছিল। বুড়ো এখানে এসেছিল বুঝি?

উত্তর হইল, এসেছিলেন আবার কি! সকাল থেকেই তো ছিলেন। গিন্নীর সঙ্গে বুঝি ঝগড়া হয়েছে। অনেক কষ্টে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এই একটু আগে বিদেয় করেছি। রাধানাথ বিস্ময়ের স্বরে কহিল, তাই নাকি? ওঃ! খোঁজ-টোজ বাজে কথা তা হ'লে, বুড়োর হয়ে পাহারা দিচ্ছিল মাস্টার। হাঁক দিয়া কহিল, কি হে, গেলে, না, আড়ি পাতছ দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?

নারীকণ্ঠ হাস্য-তরল স্বরে কহিল, ও বিদ্যেও আছে নাকি?

রাধানাথ উচ্চকণ্ঠে, বোধ করি আমাকে শুনাইবার জন্যই, কহিল, খুব। দিন কয়েক থাক না, হরেক রকমের বিদ্যে দেখতে পাবে।

অগত্যা চলিয়া আসিলাম। কিন্তু রাধানাথের কাণ্ড দেখুন দেখি! একজন নিরপরাধ লোকের নামে এমনই করিয়া দুর্নাম প্রচার করা! তাহা আবার একজন মহিলার সামনে! সরোজিনী আমাকে কি মনে করিল, কে জানে!

মনটা বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। আমি একজন স্কুলের শিক্ষক; ছাত্রদের লেখাপড়া ও স্কুল সম্বন্ধীয় কাজকর্ম লইয়াই আমার থাকা উচিত। গ্রাম্য দলাদলির মধ্যে মাথা গলাইবার আমার প্রয়োজন কি? কিন্তু উপায় নাই। প্রত্যেক গ্রামেই কি হিন্দু, কি মুসলমান—দুই জাতির মধ্যেই দুই বা ততোধিক দল আছে; গ্রামে বাস করিতে হইলে কোন একটা দলে যোগদান না করিয়া উপায় নাই। কারণ নিরপেক্ষ ব্যক্তি বিপদে-আপদে কোনও দলের কাছ হইতেই সাহায্য পাইবে না। অবশ্য গ্রাম্য দলাদলি যে আজকালই দেখা দিয়াছে তাহা নহে, আগেও ছিল। তবে আগে ইহার প্রকৃতি ছিল সামাজিক, আজকাল হইয়াছে রাজনৈতিক, অর্থাৎ সদাশয় সরকার বাহাদুর স্বায়ত্ত-শাসন দান করিয়া আমাদিগকে সামাজিক জীব-পর্যায় হইতে রাজনৈতিক জীব-পর্যায়ে প্রমোশন দিয়াছেন। ইউনিয়ন-বোর্ডের ইলেক্‌শনের সময়ে কেহ দয়া করিয়া কোন পল্লীগ্রামে আসিলেই, আমাদের রাজনৈতিক চেতনা যে কিরূপ চাড়া দিয়া উঠিয়াছে, বুঝিতে পারিবেন। বুঝিতে পারিবেন, দল বাঁধাবাঁধিতে, বিপক্ষ দলের মিথ্যা কুৎসা প্রচারে, কূট-বুদ্ধি ও কলা-কৌশলে, যেন-তেন-প্রকারেণ ভোট সংগ্রহে, এবং ভোটার লইয়া হাতাহাতি ও টানাটানিতে, কলিকাতা কর্পোরেশন, জেলা-বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির ধুরন্ধরদের চেয়ে আমরা তিলমাত্র কম নহি। পাড়াগাঁয়ের প্রত্যেকটি স্কুল এই রাজনৈতিক সংগ্রামের দুর্গ-স্বরূপ। যে পক্ষ এই দুর্গ অধিকার করিতে পারে, তাহার জয় অনিবার্য। কারণ, বিনা খরচে এতগুলি নিষ্কাম ও নিরতিশয় বিশ্বস্ত প্রচারক ও ভোট-সংগ্রাহক অপর পক্ষ পয়সা দিয়াও জুটাইতে পারে না।

দেখিলাম, গাঙ্গুলী মশায় হনহন করিয়া আসিতেছেন। আমাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কোথায় ছিলে এতক্ষণ, অ্যাঁ?

কহিলাম, আপনার ওখানে।

গাঙুলী মশায় ঢোক গিলিয়া কহিলেন, গিন্নী কিছু বলছিল নাকি?

কহিলাম, হ্যাঁ, আপনি নাকি রাগ ক'রে সারাদিন বাড়িতে পা দেন নি?

গাঙুলী মশায় সক্ষোভে কহিলেন, হ্যাঁ, তাই তো। ঘরে আর ফিরব না, থাকুক মাগী একলা। আমি কোথায় একটা অনাথা বিধবা যাতে দু মুঠো খেতে পরতে পায়, তার ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করছি, আর তাতে ও মাগী টিকটিক করছে! এই বয়সে ওসব ভাল লাগে? তুমিই বল দেখি ভায়া?

অজ্ঞতার ভান করিয়া কহিলাম, অনাথা বিধবা আবার কোথায় পেলেন?

কেন? আমাদের প্রবোধের স্ত্রী এসে পড়েছে যে! আমার ওখানেই উঠল এসে। ভারি আনন্দ হ'ল। গ্রামে প্রবোধের সত্যিকার আপনার বলতে তো আমিই, রাধানাথ আত্মীয় হ'লেও চিরদিন শত্রুতা ক'রেই এসেছে। তা, তোমার দিদিমা এ সম্বন্ধে কিছু বলে নি?

কহিলাম, বলেছেন। কিন্তু, তিনি তো বলছিলেন, রাধানাথই মেয়েটির নিকট-আত্মীয়।

দুই চোখ ডাগর করিয়া গাঙুলী মশায় কহিলেন, তাই নাকি? বুড়ী বলছিল ঐ কথা? ঘাড়টি নাড়িয়া কহিলেন, ও তাই বলবে, ভীমরতি ধরেছে কিনা! সক্রোধে কহিলেন, হুঁ, আত্মীয়! আত্মীয় নয় হে, জ্ঞাতি। মহাভারত তো পড়েছ, জ্ঞাতি শত্রুর চেয়ে শত্রু আছে নাকি জগতে?—বলিয়া মাথাটা উঁচাইয়া চোখ দুইটা আমার দিকে স্থির করিয়া দিলেন। পরক্ষণেই মাথাটা সোজা করিয়া, ঝাঁকানি দিয়া

কহিলেন, শত্রু ছাড়া ও কিছু নয়, পরম শত্রু, প্রবোধের বিয়ের সময় কেমন বাগড়া দিয়েছিল মনে নেই? আমি দাঁড়িয়ে বিয়ে দিয়েছিলাম তাই।

তবে যে রাধানাথকে দেখলাম প্রবোধ গাঙ্গুলীর বাড়ি ঢুকতে?

দুই চোখ কপালে তুলিয়া উৎকণ্ঠিত স্বরে গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, সত্যি নাকি? কখন?

এইমাত্র, আপনাকে খুঁজতে গিয়েছিলাম আমি।

শুষ্ককণ্ঠে গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, তারপর?

তারপর আর কি? রাধানাথ ঢুকল, সাদরে অভ্যর্থনাও হ'ল, মেয়ে-গলার হাসিও শুনলাম যেন একবার, তারপর এতক্ষণ বউঠান-ঠাকুরপোতে রসালাপ চলছে বোধ হয়।

গাঙ্গুলী মশায়ের মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। আর্তকণ্ঠে কহিলেন, সত্যি! হায় হায়! বিধবাটাকে আর বাঁচাতে পারলাম না, রাঘব-বোয়ালের পেটেই গেল শেষে।—বলিয়া রাস্তার উপরেই বসিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেই ব্যস্ত হইয়া কহিলাম, ও কি করছেন? গাঙ্গুলী মশায় ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, দাঁড়াও, একটু বসি; আমার বুকের ভেতরটা কেমন করছে।—বলিয়া উবু হইয়া বসিয়া দুই হাঁটুর উপর খাড়া ভাবে স্থাপিত বাহুদ্বয়ের প্রসারিত করতলে মুখটি রাখিয়া মূর্তিমান শোকের মত বসিয়া রহিলেন।

গাঙ্গুলী মশায় কি বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও হার মানাইবার মতলব করিয়াছেন নাকি? না হইলে, অনাথা বিধবার জন্য এই বয়সে এতখানি দরদ বাংলা দেশে সচরাচর দেখা যায় না।

কহিলাম, বাড়ি চলুন; এখানে ব'সে থেকে কি হবে?

গাঙ্গুলী মশায় আমার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া

রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে কহিলেন, এখনও গল্প করছে বোধ হয়; আড়ি পেতে শুনলে হয় না?

কহিলাম, পাগল হয়েছেন নাকি? লোকে দেখলে বলবে কি?

তা বটে। কিন্তু কি করা যায় বল দেখি?

কহিলাম, বেশ তো। রাধানাথই সব ব্যবস্থা করুক। যে কেউ হোক করলেই হ'ল; মোটের ওপর, বিধবাটির কোন কষ্ট না হয়, এইটি সকলকেই দেখতে হবে।

গাঙ্গুলী মশায় তাতিয়া উঠিয়া কহিলেন, পাগল নাকি! আমি বেঁচে থাকতে রাধানাথ মুরুব্বিয়ানা করবে? কিছুতেই না।—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, আজই একটা হেস্তনেস্ত করব আমি, এখনই যাব ছুঁড়ীর কাছে। চোখে আঙুল দিয়ে ব'লে আসব, মরণ-দশা ধরেছে তোর। মাথা ধরেছে, গা ম্যাজম্যাজ করছে ব'লে আমাকে বিদেয় ক'রে দিয়ে, রাধানাথকে বসিয়ে গল্প করার ফল ভাল হবে না। ইহকাল পরকাল দুইই হারিয়ে পথে বসতে হবে, এস দেখি আমার সঙ্গে তুমিও, কাছে দাঁড়িয়ে থেকে শুনে আসবে।—বলিয়া হাত ধরিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। বাধা দিতে দিতে কহিলাম, দাঁড়ান, দাঁড়ান, ওতে ভাল হবে না। হঠাৎ রাগের মাথায় কোন কাজ না ক'রে ভেবে চিন্তে করা উচিত। আজ বাড়ি চলুন, কাল ভেবে চিন্তে কর্তব্য স্থির করা যাবে।

গাঙ্গুলী মশায় থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কি হবে?

কহিলাম, রাধানাথের অসাধ্য কিছু নেই, এখনই হয়তো এমন ফ্যাসাদে ফেলে দেবে যে, কাল গাঁয়ে মুখ দেখানো যাবে না।

মন্ত্রাভিভূত সর্পের মত এক মুহূর্তে শান্ত হইয়া গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, তা বটে। কিন্তু বাড়ি তো যেতে পারব না। মাগীকে বড়

গলা ক'রে ব'লে এসেছি, আর বাড়ি ফিরব না। চল, তোমার ওখানেই আজ যাওয়া যাক। রাত্রিটা তোমার বৈঠকখানায় প'ড়ে কাটিয়ে দোব। মাগীর তেজটা একটু কমুক।

কহিলাম, তা কি হয়?

গাঙুলী মশায় ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিলেন, বুড়ো বামুনকে এক রাত্রি দুমুঠো খেতে দিতে পারবে না হে?

ছি ছি, কি বলছেন!—বলিয়া পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় ঠেকাইয়া কহিলাম, আমাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন সে তো আমার ভাগ্যের কথা, কিন্তু দিদিমা ভারি দুঃখ করবেন। তা ছাড়া মনের যা অবস্থা দেখে এসেছি—

গাঙুলী মশায় কিঞ্চিৎ উদ্বেগের সহিত প্রশ্ন করিলেন, কি?

জবাব দিলাম, মনের অবস্থা খুবই খারাপ। অন্য বিষয় নিয়ে ঝগড়া হ'লেও বা, মানে, এর মধ্যে ঐ সুন্দরী বালবিধবাটি রয়েছে কিনা, মানে, ওঁর মনে একটু সন্দেহ হয়েছে, আপনি হয়তো—

বাধা দিয়া গাঙুলী মশায় কহিলেন, পাগল নাকি! মেয়ের বয়সী।

যাই হোক, এ অবস্থায় আপনি যদি বাড়ি না ফেরেন তো মনের দুঃখে একটা কিছু ক'রে বসতেও পারেন।

গাঙুলী মশায় এবার সত্যই উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, সত্যি। যা ওর মেজাজ, কিছু অসাধ্য নেই ওর। একবার রেগে কুয়োতে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিল। ফেরাই যাক, কিন্তু তুমিও সঙ্গে চল ভায়া।

সাহস দিয়া কহিলাম, কিছু চিন্তা নেই আপনার? আমি বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি, কিছু বলবেন না আপনাকে।

গাঙুলী মশায় ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, বেশ বোঝবার লোকটি!

পিঠে হাত দিয়া কহিলেন, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মিটমাট ক'রে দিয়ে আসবে চল, না হ'লে সারারাত ঝগড়া করবে এখন।

অগত্যা যাইতেই হইল। বাড়ি পৌঁছিয়া দাদামশায়কে বৈঠকখানায় বসাইয়া, ভিতরে গিয়া দেখিলাম, দিদিমা উঠানে গালে হাত দিয়া বিরহ-ব্যাকুলা কণ্বতনয়া শকুন্তলার পোজে বসিয়া আছেন। খুব যে চিন্তা-মগ্না, দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম। আমার পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলেন না বোধ হয়। কাছে গিয়া ডাক দিলাম, দিদিমা! চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, কে? আমার দিকে তাকাইয়া কহিলেন, ওঃ, তুমি? উনি এসেছেন? মৃদুকণ্ঠে কহিলাম, এসেছেন, অনেক বুঝিয়ে-শুঝিয়ে এনেছি। আজ আর ঝগড়া করবেন না। দিদিমা অভিমানাহত কণ্ঠে কহিলেন, না, ঝগড়া কেন করব? ঝগড়া আমি নিজে হতে করি? উনি করেন ব'লেই করি।—বলিয়া আবার হাতে গাল রাখিয়া অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে কহিলেন, এও কপালে ছিল! কবে যে মরণ হবে জানি না। মৃদুতর কণ্ঠে আশ্বাস দিয়া কহিলাম, ভয় নেই আপনার। রাধানাথ জুটে গেছে।

দিদিমা এক মুহূর্তে চাঙ্গা হইয়া উঠিয়া কহিলেন, তাই নাকি? হঠাৎ দুই হাত যুক্ত করিয়া কপালে ঠেকাইয়া কহিলেন, মা চণ্ডী! তুমি আছ, তোমাকে ষোল আনার পূজো দোব আমি। আমাকে কহিলেন, ওকে পাঠিয়ে দাওগে।

কহিলাম, তা কি হয়! আপনি নিজে গিয়ে নিয়ে আসুন।

দিদিমা ফোঁস করিয়া উঠিয়া কহিলেন, কি, ও নিজে করবে দোষ, আর আমাকে তোষামোদ ক'রে বাড়ি আনতে হবে? কি মনে করেছ বল দেখি তোমরা? বিষ নেই? ঐ করবীগাছের শেকড় বেটে খেয়ে মরতে পারি না আমি?—বলিয়া উঠানের এক কোণে একটা করবীগাছের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিলেন।

সত্যই তো! গাঙ্গুলী মশায়ের বেশ কাণ্ড! হাতের কাছে বিষ আগাইয়া দিয়া বাহিরে এই কীর্তি করিয়া বেড়াইতেছেন! ত্রস্তকণ্ঠে কহিলাম, আবার পাগলামি শুরু করলেন! বলছি যে, আর কিছু ভয় নেই। আমি বাড়িতে ছিলাম না তাই এতটা করেছেন, থাকলে করতে দিতাম না। ফিসফিস করিয়া কহিলাম, প্রবোধ গাঙ্গুলীর স্ত্রী ওঁকে বিদায় ক'রে দিয়ে রাধানাথের সঙ্গে ব'সে ব'সে গল্প করছে, নিজের চোখে দেখে এসেছি।

দিদিমা সজল চক্ষে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিলেন, বেশ, তুমি যাও, আমি ডেকে নিয়ে আসছি এখনই। বাহিরে আসিতেই দাদামশায় কহিলেন, কি হ'ল? কহিলাম, আসছেন এখনই।

আসছেন তো কখন! মশার কামড়ে যে অস্থির ক'রে দিলে!—বলিয়া চটাস করিয়া একটি মশকের প্রাণ-সংহার করিলেন।

হাসিয়া কহিলাম, অত অস্থির হ'লে চলবে কেন? পাপ করেছেন, প্রায়শ্চিত্ত একটু হোক।

গৃহে ফিরিতেই পত্নী কহিলেন, এত রাত পর্যন্ত বাইরে কোথায় ছিলে? মানা করলাম না তখন!

গম্ভীর মুখে কহিলাম, পেত্নী ছাড়াচ্ছিলাম।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া পত্নী কহিলেন, গাঙ্গুলী বুড়োর বুঝি?

হুঁ, ছাড়িয়ে, তাঁকে গিন্নীর হেপাজতে রেখে এলাম।

পেত্নী গেলেন কোথায়?

রাধানাথের ঘাড়ে।

তার মানে?

ব্যাপার সব খুলিয়া বলিলাম। পত্নী সব শুনিয়া কহিলেন, এ গাঁয়ের সবই উল্টো। গাঁয়ে এমন একটা সুন্দরী ছুঁড়ী এসেছে, কোথায় গাঁয়ের ছোকরা-মহলে হৈ-হৈ প'ড়ে যাবে, কিন্তু তার কিছু নেই। ওদিকে বুড়োদের মধ্যে মাতামাতি শুরু হয়ে গেছে। গম্ভীর হইয়া উঠিয়া কহিলেন, কিন্তু তুমি এই রোজাগিরি ছাড় দেখি, পেত্নী যদি ঘাড়ে চেপে বসে তো মুশকিল হবে। রোজাকে পেলে নাকি পেত্নীরা সহজে ছাড়তে চায় না।

২

পরদিন—রবিবার, বেলা আটটা। মুখ হাত ধুইয়া চা খাইয়া একটু স্কুলের কাজ করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে গ্রামের চৌকিদার গোষ্ঠ ডোম আসিয়া ডাক দিল, ম্যাষ্টর বাবু রইছেন গো? হাঁক দিয়া কহিলাম, কে? গোষ্ঠ? কি খবর রে? গোষ্ঠ কহিল, তেমন কিছু লয় বাবু। কর্তাবাবু আপনাকে একবার ডাকছেন, এখনই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন রে?

জানি না বাবু, আপুনি এখনই এস একবার।

জামা জুতা চাপাইয়া বাহির হইলাম। গাঙুলী মশায়ের বাড়ি আসিয়া দেখিলাম, বৈঠকখানা খালি। বাড়ির ভিতরে ঢুকিতেই দেখিতে পাইলাম, দিদিমা রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া তরকারি কুটিতেছেন। বদন প্রসন্ন। পদশব্দে মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিলেন এবং পরক্ষণেই আবার মুখ নামাইয়া তরকারি কুটিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায়?

দিদিমা মুখ তুলিয়া ভ্রূর ইঙ্গিতে জানাইলেন, শোবার ঘরে।

ডাক শোনা গেল, এখানে এস হে।

বার্ধক্য-জীর্ণ শ্লথ কণ্ঠের স্বর। দাদামশায়ের অসুখ করিয়াছে নাকি?

শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু একি! দাদামশায়ের শয়নকক্ষে, দাদামশায়ের শয্যায়, দিদিমার চিত্তে হর্ষ ও বদনে হাস্য বিকশিত করিয়া কে আসিয়া জুটিয়াছে? বিগলিতদন্ত বিরূত মুখ, গাল দুইটাতে এক ইঞ্চি করিয়া গভীর গর্ত, চিবুকটা চ্যাপ্টা হইয়া গিয়া নীচের ঠোঁট-টাকে সামনের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। দিদিমা শক্ত-পোক্ত দাদামশায়কে বর্জন করিয়া শেষে এই বাহাত্তুরে বৃদ্ধের হাতে আকৈশোর সযত্নে রক্ষিত সতীত্ব-রত্নটিকে তুলিয়া দিলেন?

বৃদ্ধ ফোকলা মুখে হাসিয়া জড়িত স্বরে কহিলেন, ভায়া, চিনতে পারছ না? আমি—

কাছে আসিয়া সবিস্ময়ে কহিলাম, দাদামশায়! আপনি!

দাদামশায় ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' জানাইলেন।

প্রশ্ন করিলাম, অসুখ হয়েছে? কখন থেকে হ'ল? কি অসুখ?

দাদামশায় ডান হাতটি মুখের উপর বাম কর্ণ হইতে দক্ষিণ কর্ণ পর্যন্ত বুলাইয়া দিলেন।

কহিলাম, মুখের অসুখ? দাদামশায় ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, না। তারপর আলগা ঠোঁট দুইটাকে ফাঁক করিয়া মাড়ি দুইটা দেখাইতেই দেখিলাম, সমস্ত মাড়িতে একটিও দাঁত নাই।

হঠাৎ দাদামশায়ের বাঁধানো দাঁতের কথা মনে পড়িল, কহিলাম, দাঁত কই?

দাদামশায় কহিলেন, ঐ মাগীকে জিজ্ঞাসা করগে, ও-ই জানে। কাল রাত্রে খুলে রেখে শুয়েছিলাম, রোজই তাই করি, সকালে উঠে দেখি, নেই। মাগী বলছে, ইঁদুরে নিয়ে গেছে; আমি বিশ্বাস করি না।

ওরই কাজ। ও-ই লুকিয়ে রেখেছে, আমি যাতে প্রবোধের বাড়ি না যেতে পারি এই জন্যে।

আমি দিদিমার পক্ষাবলম্বন করিয়া কহিলাম, তা কি হয়! দিদিমা কখনও এ কাজ করতে পারেন না।

ঠিক ওর কাজ! কোন দিন ইঁদুরে নিলে না, আর কালই হঠাৎ নিয়ে গেল? ওর কাজ, তুমি দেখে নিও।

আপনি চেয়েছিলেন?

কথাবার্তা না কইলে চাইব কি ক'রে?

কাল কথাবার্তা কন নি?

দাদামশায় ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, হ্যাঁ, কয়েছে, ছুঁড়ে ছুঁড়ে, আর ঠেস দিয়ে দিয়ে, যেমন—'রাত অনেক হয়েছে, বাইরে আর কার পিতিক্ষেয় থাকা,' 'খেতে দেওয়া হয়েছে', 'এবার শুলেই ভাল হয়', 'বুড়ো বয়সে রাত জেগে অসুখ হ'লে কোনও মুখপুড়ী ঠ্যালা সামলাতে আসবে না', এমনই আর কি! সারা রাত্রি মেঝেতে মাদুর পেতে শুয়েছে।

রাগ তা হ'লে যায় নি এখনও? আচ্ছা, আমি একবার ব'লে দেখি।

দিদিমা আড়ি পাতিতেছিলেন। চোখোচোখি হইবামাত্র হাত নাড়িয়া কথা কহিতে নিষেধ করিলেন। রান্নাঘরে ফিরিয়া গিয়া কহিলেন, কি বলছিল বুড়ো?

সবই তো স্বকর্ণে শুনেছেন।

শুনেছি তো; কিন্তু অমন তবল তবল ক'রে কথা বললে কি বোঝা যায়?

আপনিই তো বুড়ো ক'রে দিয়েছেন।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিরক্তির সহিত দিদিমা কহিলেন, তার মানে ?

মানে—দাঁতগুলি লুকিয়ে রেখেছেন। এখন দয়া ক'রে বার ক'রে দিয়ে দাদামশায়ের বার্ধক্য দূর করুন।

দিদিমা রুষ্ট স্বরে কহিলেন, ঐ সব বাজে কথা শুনলে রাগ ধরে। আমার আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, ঐ এঁটো দাঁতগুলো নিয়ে লক্ষ্মীর ঝাঁপির মধ্যে লুকিয়ে রাখব! কিছু জানি না আমি। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, যা ইঁদুর ধরে! কতদিন বলেছি, একটা জাঁতি-কল এনে দাও। দেয় নি। ইঁদুরই নিয়ে কোন গর্তে ঢুকিয়েছে।

তা হ'লে তো মুশকিল!

কিসের মুশকিল ?

মানে, বাইরে যেতে পারছেন না।

শ্রীরাধার কুঞ্জে যেতে পারছেন না!

মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন, তা, তার জন্যে ভাবনা নেই, শ্রীরাধাকে খবর দিয়েছি, এখনই এসে হাজির হ'ল ব'লে।

সবিস্ময়ে কহিলাম, তার মানে ?

সকাল থেকে কোঁত পাড়ছে শুনলাম, বুকটা বোধ হয় ভারি টনটন করছে। তাই শ্রীরাধাকে খবর দিয়ে পাঠালাম, নাগরের ভারি অসুখ, এখনই একবার দেখা দিয়ে—নাকী বক্তৃতার সুরে,—তাপিত প্রাণ শীতল ক'রে যাক।

মাস দেড় আগে গাজনের সময় দুই দিন কৃষ্ণ-যাত্রা হইয়াছিল—একদিন 'মান' ও আর একদিন 'মাথুর'। দিদিমা বোধ হয় বিরহী কৃষ্ণ অথবা বিরহিণী রাধিকা, যাহারই হউক বক্তৃতার নকল করিলেন।

চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। দিদিমা কহিলেন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও, বলগে, আর ধড়ফড় করতে হবে না, প্রাণেশ্বরী এসে

হাজির হ'ল ব'লে। আর তুমিও একটু এর মধ্যেই ঠিকঠাক হয়ে নাও, কপালে থাকলে তোমার ওপরও নেকনজর প'ড়ে যেতে পারে।

দিদিমাকে আর না ঘাঁটাইয়া ফিরিয়া আসিলাম। দাদামশায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হ'ল ?

বললেন—জানি না, ইঁদুরে নিয়েছে বোধ হয়।

দাদামশায় এপাশ ওপাশ মাথা নাড়িয়া কহিলেন, না, ওরই কর্ম। রাধানাথ ছুঁড়ীটার সর্বনাশ না করা পর্যন্ত ফিরে দেবে না। মেয়েটার অদৃষ্ট। আমি আর কি করব ?—বলিয়া প্রচণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

হঠাৎ দিদিমার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আপ্যায়ন-সহকারে কহিতেছেন, এস ভাই, এস। এই রোদেই এলে ?

দাদামশায় চক্ষের ইঙ্গিতে কহিলেন, কে ? বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তবু একটু ঝুঁকিয়া দেখিয়া কহিলাম, কে একটি বিধবা মেয়ে। দাদামশায় ফিসফিস করিয়া কহিলেন, বয়স কত ?

কম, প্রবোধ গাঙ্গুলীর স্ত্রী বোধ হয়।

তাই নাকি ?—বলিয়া দাদামশায় পলকমধ্যে বিছানার চাদরটা টানিয়া লইয়া আপাদনাসিকা ঢাকা দিলেন, শুধু মাথা, কপাল ও চোখ দুইটি খোলা রহিল। কহিলেন, সকালে যাই নি কিনা, তাই খবর নিতে এসেছে। ভারি বিপদে পড়েছে বেচারা! আমি ছাড়া যে গাঁয়ে তার আপনার আর কেউ নেই, কদিন ধ'রে সেই কথাই বুঝিয়েছি কিনা। আর এমনই ক'রে বুঝিয়েছি যে, রাধানাথ, রাধানাথ কেন—স্বয়ং জনার্দন (গাঙ্গুলী মশায়ের কুল-দেবতা) এলেও আর কল্কে পাবেন না।

মধুর মৃদু ও কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন হইল, বঠ্‌ঠাকুর কেমন আছেন ? দিদিমা বিনাইয়া বিনাইয়া এবং আমাদের শুনাইয়া শুনাইয়া কহিলেন, ঐ তো সকাল থেকে প'ড়ে আছেন, এক ঢোঁক জল পর্যন্ত গেলেন নি।

এই বয়েস, এত হাঁটাহাঁটি ছুটোছুটি কি সহ্যি হয়! তুমি নিজে গিয়ে দেখে এস না ভাই। তাতে আর দোষ কি?

দাদামশায় কহিলেন, এই দেখ মাগীর কাণ্ড! এখানে দিচ্ছে পাঠিয়ে, আমি ঘুমোলাম, ডাকাডাকি করলে জাগব, যা বলবার তুমিই ব'লো।

বারান্দায় লঘু পদধ্বনি শুনিয়া দাদামশায় চোখ বুজিয়া টানিয়া টানিয়া নিশ্বাস ফেলিতে শুরু করিলেন। পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিলাম, দরজার সামনে জীবন্ত মর্মরপ্রতিমার মত সরোজিনী দাঁড়াইয়া আছে। পরিধানে এক-ইঞ্চি কালাপাড় সাদা শাড়ি, সাদা শেমিজ, সাদা আদ্দির ব্লাউজ। পা দুইটি খালি। দুই হাতে দুইগাছি করিয়া সোনার চুড়ি, গলায় একটি সরু বিছা-হার। মুখখানি তাজা স্থল-পদ্মের মত ঢলঢল করিতেছে। মাথায় এলো খোঁপা বাঁধা, চুলের উপর স্বল্প অবগুণ্ঠন। সাত বৎসর আগে সরোজিনীকে দেখিয়াছিলাম কৃশাঙ্গী, রঙেরও বিশেষ জলুস ছিল না। পাড়াগাঁয়ের পিতৃহীনা গরিবের মেয়ে, বিধবা মা পরের বাড়িতে দাসীবৃত্তি করিয়া নিজের ও মেয়ের পেট চালাইত। কাজেই যত্ন-আত্তি ছিল না, ঘষা-মাজাও ছিল না। কিন্তু প্রবোধ গাঙুলীর কাছে আদরে-যত্নে সুখে-স্বচ্ছন্দে, বিলাসে ও আলস্যে থাকিয়া সরোজিনী কিঞ্চিৎ স্থূলাঙ্গী হইয়াছে, গাত্রবর্ণও প্রায় বিলাতী মেমসাহেবদের মত হইয়া উঠিয়াছে।

সরোজিনী আগাইয়া আসিয়া অবগুণ্ঠনে হাত দিয়া টানার ভঙ্গী করিয়া সপ্রতিভভাবে আমাকে প্রশ্ন করিল, ঘুমুচ্ছেন নাকি?

উত্তর দিলাম, হ্যাঁ।

কি হয়েছে?—বলিয়াই দাদামশায়ের বিছানায় পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল, এবং পায়ে হাত দিয়া কহিল, জ্বর নেই তো! দাদামশায়ের

নিদ্রাভঙ্গ হইল, ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, কে? আমি ও সরোজিনী দুই-জনেই নীরব রহিলাম। দাদামশায় কিছুক্ষণ সরোজিনীর দিকে নির্নিমেষে তাকাইয়া থাকিয়া কহিলেন, তুমি এসেছ মা! জনার্দন তোমার মঙ্গল করুন, তোমার—

সরোজিনী আশীর্বচনে বাধা দিয়া কহিল, কি হয়েছে আপনার? দাদামশায় গলায় হাত দিয়া আমার দিকে চাহিলেন। কহিলাম. দাঁতের গোড়া ফুলেছে, ভারি যন্ত্রণা, হাঁ করতে পারছেন না।

মিহি স্বরে সরোজিনী কহিল, খাওয়া-দাওয়া?

দাদামশায় ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন। কহিলাম, অতিকষ্টে চামচে দিয়ে—

কিন্তু কাল তো বেশ ভাল ছিলেন!

দাদামশায় জবাব না দিয়া স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। কহিলাম, হ্যাঁ, ভালই তো ছিলেন। ঘণ্টা-কয়েকের মধ্যেই এমনই হয়ে দাঁড়িয়েছে—

সরোজিনী সন্ত্রস্তভাবে কহিল, প্লেগ নয় তো?

আশ্বাস দিয়া কহিলাম, না, এ রকম প্রায়ই হয়।

তাই নাকি? সাবধানে থাকুন, সেক-টেক দিন, সেরে যাবে বোধ হয়। আমি চললাম।—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

দাদামশায় কহিলেন, বাড়ি যাচ্ছ? একা এসেছ তো, কেউ সঙ্গে যাক।

সরোজিনী কহিল, রাধানাথ ঠাকুরপোর বাড়ি যাচ্ছি। আজ নেমন্তন্ন করেছেন। ওঁদের ঝি সঙ্গে এসেছে

দাদামশায় ঢোঁক গিলিয়া কোনমতে কহিলেন, আচ্ছা, যাও মা।

সরোজিনী আর একবার দাদামশায়ের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম

করিল এবং আমার দিকে চাহিয়া নমস্কার করিয়া কহিল, আপনার সঙ্গে আলাপ হ'ল না আজ। যাব একদিন আপনাদের বাড়ি।—বলিয়া প্রস্থান করিল।

দাদামশায় কহিলেন, শুনলে? রাধানাথের বাড়ি নেমন্তন্ন; সারাদিন বোধ হয় ঐখানেই থাকবে। কি পরামর্শ হবে কে জানে!

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। সরোজিনী আমাকে আশ্চর্য করিয়া দিয়াছে। পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা মেয়ে সে; সতরো বৎসর বয়স পর্যন্ত নিজেদের পল্লীর বাহিরে পা বাড়ায় নাই; পুরুষমানুষের ছায়া দেখিয়া লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিত। সাত বৎসরের মধ্যে তাহার এই পরিবর্তন! পাড়াগাঁয়ে ভাশুর-ভাদ্রবধূ সম্পর্ক, বহু বিধি-নিষেধের বেড়ি দিয়া আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। কেহ কাহারও মুখ দেখিবে না, কেহ কাহাকেও স্পর্শ করিবে না, কেহ কাহারও সহিত কথা বলিবে না। দীর্ঘ অবগুণ্ঠনের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া কেহ কোন দিন কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিবে না। এই সকল নিয়ম যে সরোজিনী জানে না, তাহা নহে। তবু সে কেমন সঙ্কোচহীন, সহজ অথচ ভদ্র-ভাবে আসিল, কাছে বসিল, কুশল জিজ্ঞাসা করিল এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত এক মুহূর্তও কালক্ষেপ না করিয়া চলিয়া গেল। আমি তো এক রকম তাহার অপরিচিত, তথাপি আমার সহিত ব্যবহারেও তাহার সৌজন্যের বিন্দুমাত্র অভাব হইল না।

দাদামশায় দন্তহীন মাড়ি দুইটা ঘষিয়া সক্রোধে সরোজিনীর উদ্দেশ্যে কহিলেন, খুব তো সেজে-গুজে ফেরতা দিয়ে যাওয়া হচ্ছে, রাধানাথের ফন্দিবাজিতে যখন পথে দাঁড়াবে, তখন মজা বুঝবে বাছা।

বেলা হইয়াছিল। বাড়ি যাইবার জন্য বাহির হইতেই দিদিমা কাছে ডাকিয়া কহিলেন, কেমন দেখলে হে, নয়ন-প্রাণ সার্থক হ'ল তো?

চুপ করিয়া রহিলাম। দিদিমা কহিতে লাগিলেন, ভাদ্রবউয়ের ভাশুরের গায়ে ঢ'লে পড়া জন্মে দেখি নি। ছি ছি! সাতজন্ম আগুনে পুড়লেও ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না যে! ধারালো কণ্ঠে কহিলেন, গাঁয়ে যে মানুষের মত মানুষ নেই, তাই মেমসাহেব সেজে সারা গাঁয়ের চোখের সামনে এই কীর্তি ক'রে বেড়াচ্ছে। থাকত তেমন লোক তো ওর চুল কেটে, মুখে ছ্যাঁকা দিয়ে, থান পরিয়ে ওকে এতদিন ঢিট ক'রে দিত।

দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়ার পরে শুইয়া শুইয়া সরোজিনীর কথা ভাবিতেছিলাম। সুশ্রী সপ্রতিভ মেয়েটি। কেমন সহজ সুন্দর ব্যবহার! বিদায় লইবার সময়ে কেমন মিষ্ট করিয়া হাসিয়া, ফুটনোন্মুখ কমল-কোরকের মত যুক্তপাণি কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিল! আমাদের বাড়ির মেয়েরা কি অপরিচিত অথবা স্বল্পপরিচিত পুরুষের সঙ্গে এমন ব্যবহার করিতে পারে? স্বামীদের কাছে যতই বিক্রম প্রকাশ করুক, বাহিরের কোন পুরুষ দেখিলেই একেবারে তিন হাত ঘোমটা টানিয়া কনেবউ সাজিয়া বসে (স্বামীদের তাহারা পুরুষ বলিয়াই গণ্য করে না বোধ হয়)। এই লজ্জাসবস্ব পল্লীরমণীদের মধ্যে সরোজিনী নিজেকে খাপ খাওয়াইবে কি করিয়া? ইহারা ইহাকে কিছুতেই সহ্য করিবে না। হয় টানাটানি করিয়া ইহাকে নিজেদের স্তরে নামাইয়া আনিবে, কিংবা ইহাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়া, ঘৃণায় ও ঈর্ষায় ইহার প্রতি মারমুখী হইয়া উঠিবে।

সরোজিনীর জন্য দুঃখ হইল। সারাজীবন কাটাইবে কি লইয়া? প্রবোধ গাঙ্গুলী অবশ্য বিস্তর অর্থ ও সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছে, খাওয়া-পরার অভাব কোন দিন তাহার হইবে না। কিন্তু শুধু খাইয়া ঘুমাইয়া মানুষ বাঁচিতে পারে—বিশেষ করিয়া মেয়েমানুষ? তাহার স্বামী

চাই, সংসার চাই, সন্তান চাই। না পাইলে রাজ-সিংহাসনে বসিয়া সে সুখ পায় না, পাইলে দুই বেলা আধ-পেটা খাইয়া, ভাঙা শাঁখা ও ছিন্ন মলিন বসন পরিয়া, নিজেকে রাজরাণীর চেয়েও সুখী মনে করে। কিন্তু সরোজিনীর কোন অবলম্বনই নাই। যদি একটা ছেলে থাকিত, তাহা হইলে তাহাকে নাওয়াইয়া, খাওয়াইয়া, ঘুম পাড়াইয়া, মানুষ করিয়া ও ভবিষ্যতের সুখের স্বপ্ন দেখিয়া জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারিত। যদি শ্বশুর-শাশুড়ী, ভাশুর-দেওর, জা-ননদ লইয়া মস্ত সংসার থাকিত, তাহা হইলেও সংসারে গিন্নী সাজিয়া, সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়া, জা ও ননদের ছেলে-মেয়ে মানুষ করিয়া কোনমতে দিন কাটাইয়া দিত। অবশ্য আজকাল বাংলা দেশে সন্তানহীনা ধনী বিধবা, বিশেষ করিয়া বাল-বিধবাদিগকে জীবন ও যৌবন দুইই পার করিয়া দিবার জন্য স্বামীজী-আখ্যাধারী কতকগুলি কাণ্ডারীর আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু সরোজিনী তাহাই বা জুটাইবে কি করিয়া?

পত্নী আসিয়া কহিলেন, হ্যাঁ গা, শুনতে পাচ্ছ না? জবাব দিলাম না। গায়ে হাত দিয়া নাড়িয়া কহিলেন, শুনছ! ঘুমোচ্ছ নাকি?

কহিলাম, হুঁ।

ওঠ দেখি, মনু চক্রবর্তী কি জন্যে তোমাকে ডাকছে দেখ।

ডাকুক, ব'লে পাঠাও ঘুমোচ্ছি।

পাগল নাকি! বেচারা রোদে রোদে ছুটে এসেছে, নিশ্চয় খুব দরকার।

শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠে বিরক্তির সহিত কহিলাম, দরকার তো ভারি!

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, মনু বৈঠকখানার বারান্দার এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ঘনঘন পায়চারি করিতেছে। এটি মনু চক্রবর্তীর অভ্যাস, উত্তেজিত হইলেই পায়চারি করে। কিন্তু হঠাৎ এই উত্তেজনার কারণ?

মণীন্দ্র ঢ্যাঙা, কাহিল ; সরু ও লম্বা গলা ; মাথার চুল চারিদিকে সমান করিয়া ছাঁটা ; গা ও পা দুইই খালি, কাপড়টি কোমর বাঁধিয়া পরা। মণীন্দ্রের মেজাজ ও কথাবার্তার প্রায়ই কোন ঠিক থাকে না ; স্বভাবের গুণে নয়, নেশার গুণে ; মণীন্দ্র গাঁজা খায়।

কোমরের দুই পাশে দুই হাত দিয়া মণীন্দ্র একেবারে সামনে আসিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, কি ব্যাপার বল দেখি ?

জবাব না দিয়া কহিলাম, এস, ব'স।

মণীন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া বসিয়া কহিল, বসতে পারব না বেশিক্ষণ, অনেক কাজ। কিন্তু তোমাদের ব্যাপারখানা খুলে বল সব।

কহিলাম, কিসের ব্যাপার ?

মণীন্দ্র উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া কহিল, কিসের ব্যাপার, জান না ? কেন, আমার বোন সরোজিনীর ব্যাপার ?

সপ্রশ্ন মুখে চাহিয়া রহিলাম।

মণীন্দ্র বলিতে লাগিল, আমার বোন ; আমিই বিয়ে দিলাম। আসবার খবর শুনে আমিই আনতে ইষ্টিশানে গেলাম। কিন্তু সেখান থেকে কেড়ে এনে যে নিজের ঘরে ঢোকালে, তা কোন্ আইনে বলতে পার ?

প্রতিবাদ করিলাম, আমি আবার ঢোকালাম কখন ?

তুমি না হোক, তোমাদের পাণ্ডাটি তো বটে। সে একই কথা, ভাগ তোমরাও পাবে।

কিসের ভাগ ?

টাকা-কড়ি, গয়না-গাঁটি, জমি-জায়গা—তার লোভেই তো এত কাণ্ড। না হ'লে তো আরও কচি কচি বিধবা গাঁয়ে রয়েছে, তাদের জন্যে তো তোমাদের কারও মাথাব্যথা দেখি নি।

কথাটা সত্য। আমাদের গ্রামে, শুধু আমাদের গ্রামে কেন, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক সংসারে গড়ে একজন করিয়া বাল-বিধবা আছে; আমাদের চোখের সামনে অশেষ দুঃখে ও যন্ত্রণায় প্রতিদিন তিল তিল করিয়া দেহে ও মনে মরিতেছে, কিন্তু কয়জনের কথা ভাবি আমরা?

মণীন্দ্র বলিতে লাগিল, ভাবলাম, যা হোক, এতদিনে ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। এতগুলো ছেলে-মেয়ে, বড় মেয়েটি তো বিয়ের যুগ্যি হয়েছে, এক পয়সা কোন দিকে আয় নেই, বড়লোক বিধবা বোনটা বাড়িতে এলে একটু সুরাহা হবে। ও বাবা! আসবামাত্র চিলের মত ছোঁ মেরে নিয়ে গেল!

দম লইয়া কহিল, কিন্তু কদিন রাখতে পারলি? চুরির ধন বাটপাড়ে নিয়ে গেল, আর নিজে শাপের মুখে মরলি—

সবিস্ময়ে কহিলাম, সাপ?

না হে, শাপ। আধোয়া মুখে শাপ দিয়েছিলাম না সেদিন—বেটা, যেমন বামুনের গরাসে বাগড়া দিলি, তেমনই ভোগ করতে হবে না তোকে, মরবি, মরবি। তা ঠিক ফ'লে গেছে। তিন দিনও পেরোয় নি। বাবা! নেশাই করি আর যাই করি, সকাল-সন্ধ্যে গায়ত্রীটি তো এখনও ছাড়ি নি।

বাক্যস্রোত কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইবামাত্র প্রশ্ন করিলাম, কার কি হয়েছে?

দুই ভ্রূ চাড়াইয়া কহিল, কেন? গাঙ্গুলী বুড়োর। পেলেগ হয়েছে।

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া কহিলাম, দূর!

দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া মণীন্দ্র কহিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, পেলেগ, রাধানাথ নিজে দেখে এসেছে, গাল-গলা ফুলে ফেঁপে ঢোল।

আর প্রতিবাদ করিলাম না। মণীন্দ্র আত্মপ্রসাদে উৎফুল্ল হইয়া কহিল, ও বেটা টেঁসে যাবে, তুমি দেখো। পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, কিন্তু রাধানাথটাকে কি উপায়ে টিট করা যায় বল দেখি?

ওকেও শাপ দিয়ে দাও।

তা কি আর দিচ্ছি না ভাবছ, দিন রাত দিচ্ছি। কিন্তু বেটা যা নিরেট বজ্জাত, তাতে কিছু হবে ব'লে মনে হচ্ছে না।—বলিয়া কিছুক্ষণ চিন্তাকুলভাবে থাকিয়া আবার উত্তেজিতভাবে কহিল, কিন্তু কি বদমায়েশী বুদ্ধি দেখেছ! আজ আবার নেমন্তন্ন করেছে। আমার নিজের বোন. আমি কিছু করলাম না, আর কোথাকার কে, ও কিনা—

বাধা দিয়া কহিলাম, তা তোমার এত মাথাব্যথা কেন বল দেখি?

মণীন্দ্র খ্যাঁক করিয়া উঠিল, মানে? আমারই মাথা তো আমার ব্যথা হবে না? হবে বুঝি তোমাদের ঐ বুড়ো গাঙুলীর আর ঐ বেটা রাধানাথের?

আমি বলছি, তোমার ভাবনার কোন দরকার নেই। রাধানাথ যদি ওর আদায়-উসুল ক'রে দিতে পারে, সে তো ভাল কথা। তোমার তো ওসব করবার সাধ্য নেই।

বলিলাম না যে, প্রজা ও খাতকরা কেহ তোমাকে বিশ্বাস করিয়া কিছু দিবে না।

মণীন্দ্র রুষ্টকণ্ঠে কহিল, কেন? আমি কি পাঠশালায় পড়ি নি, না, ধারাপাত মুখস্থ করা আমাদের আমলে ছিল না? মণকষা, কড়িকষা, মাস-মাহিনা, বিঘাকালি একেবারে ভাত-জল করেছিলাম যে একদিন, কুড়োবা কুড়োবা কুড়োবা লিজ্জে, কাঠায় কুড়োবা কাঠায় লিজ্জে, হ্যাঁ বাবা! যেমন-তেমন লোক পাও নি, ঝাড়া মুখস্থ ব'লে দিতে পারি এখনও।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আর রাধানাথই বা কি এমন রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পাস করেছে শুনি?

তা বলছি না। কত কাজ তোমার! অত হাঙ্গামা কি তোমার পোষাবে? এই ধর না, আমি কি ওসব পারি? যারা ঐসব নিয়ে থাকে, তাদেরই সাজে—

ঘাড় নাড়িয়া মণীন্দ্র কহিল, তা বটে, তা বটে। তা হ'লে রাধানাথই করুক, গাঙুলী বুড়োর চেয়ে তো ভাল। কাপড়ের দোকানে ধার-ধোর দেয়। রাধানাথ কিন্তু—। কিছুক্ষণ কপাল কুঁচকাইয়া চিন্তা করিয়া কহিল, শেষ পর্যন্ত সব সাবড়ে দেবে না তো? কিছু অসাধ্যি নেই ওর। সেই মেয়েটার কথা মনে নেই?

মনে আছে, বৎসর কয়েক পূর্বে রাধানাথ তাহার পিসতুতো ভাইয়ের শক্ত অসুখের সংবাদ পাইয়া খবর লইতে গেল। ভাই দিন কয়েক ভুগিয়া মারা গেল, এবং মরিবার আগে স্বীয় পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও সহধর্মিণীর ভার রাধানাথের হাতেই দিয়া গেল। শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিলে রাধানাথ সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিজের জিম্মায় রাখিয়া ভ্রাতৃবধূকে লইয়া বাড়িতে ফিরিল। বৎসর খানেক পরে একদিন দুপুর-রাত্রে রাধানাথের বাড়িতে হৈ-চৈ উঠিল, সেই বিধবা মেয়েটি নাকি নিজের শয়নকক্ষে বাড়ির চাকরের সহিত ধরা পড়িয়াছে, এবং ধরিয়াছে স্বয়ং রাধানাথ। গ্রামে নিন্দার ঢেউ বহিয়া যাইতে লাগিল। পরের দিন রাত্রে মেয়েটি আত্মহত্যা করিয়া নিন্দার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

কহিলাম, না, সে ভয় নেই। তোমার বোনটি যা চালাক শুনছি, রাধানাথ তার কাছে বেশি কিছু করতে পারবে না। বরং উল্টে ও-ই রাধানাথকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে।

মণীন্দ্র সায় দিবার ভঙ্গীতে কহিল, সত্যি। যা বলেছ। ভারি চালাক মেয়ে। কদিনই বলছি—গোটা কয়েক টাকা দে, কতকগুলো দেনা আছে, শোধ ক'রে দিই। ঘাড় নাড়িয়া কহিল, কিছুতেই দিচ্ছে না। ক্ষোভের সহিত কহিল, অমন একটা বোন থাকতে যদি আমার কষ্ট হয় তো কি বলব বল? দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, অদৃষ্ট! অভাগার হাতে পড়লে কপিলা গাইয়েরও বাঁট শুকিয়ে যায়।

কহিলাম, গোটা কয়েক ছেলে-মেয়েকে বোনের ওখানে পাঠিয়ে দিলেও তো পার। তুমিও অনেকটা হালকা হবে, ওরও একা একা মনে হবে না।

মণীন্দ্র হাসিয়া কহিল, দিই নি নাকি? ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে জন চার, তা ছাড়া বড় মেয়েটাকেও দিয়েছি পাঠিয়ে। সেদিকে কসুর কিছু করি নি। এতেও একা মনে হয় তো বললেই পারে, গুষ্টিসুদ্ধ তুলে নিয়ে গিয়ে গাজন বসিয়ে দোব এখনই।

হাসি চাপিয়া কহিলাম, তবে আর দুঃখ কিসের? ওদিকেও তো অনেকটা সাহায্য পাচ্ছ।

চোখ পাকাইয়া মণীন্দ্র কহিল, ধুৎ! ও আবার সাহায্য কিসের? বড় মেয়েটা পনরো পেরিয়ে গেছে, চোখের সামনে ধ'রে দিয়েছি, বিয়ে দিয়ে দিক। আমি ওর বিয়ে দিয়েছিলাম ব'লেই তো এত ঐশ্বর্য্যি! ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, একটা কথা বলে না। কত রকম ভাবে কথাটা পাড়বার চেষ্টা করেছি, এড়িয়ে যায়। আমার ভিণ্টেটা তো দেখতে শুনতে মন্দ নয়। চার পার হয়ে পাঁচে পড়ল। যদি পোষ্যপুত্র নিতে চায় তো ওকেই নিক। তাতে আমারও একটা উপকার হয়, ওরও মরার পর পিণ্ডি পাবার একটা ব্যবস্থা হয়। মুখটা বিরক্তিতে কুঞ্চিত করিয়া মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়া কহিল, না না, ওসব খেয়াল নেই।

কি যে মতলব কে জানে! হঠাৎ কণ্ঠস্বর নামাইয়া কহিল, তোমার সঙ্গে আলাপ-টালাপ হয়েছে?

কহিলাম, না।

ঘাড় নাড়িয়া মণীন্দ্র কহিল, ভেবো না, হবে। যেন আলাপ করিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। মণীন্দ্র বলিতে লাগিল, আমি বলেছি কিনা! খুব প্রশংসা করেছি তোমার; বলেছি, গাঁয়ের নাক আমাদের মাস্টার; যদি কথা কইতে চাস, ওর সঙ্গে ক'গে, বাকি সব গলাকাটা।—বলিয়া প্রসারিত দক্ষিণ করতল নিজের গলার ঠিক মাঝখানে ছুরির মত করিয়া বসাইয়া বার কয়েক ঘষিয়া দিল।

মণীন্দ্রকে উঠাইবার জন্য কহিলাম, রাধানাথের ওখানে গিয়ে বোনটিকে একবার দেখে এস না।

মণীন্দ্র হাসিয়া কহিল, ঐজন্যেই তো বেরিয়েছি। খেতে বসেছে কিনা, খাওয়া হোক, যাব এখনই, কি পরামর্শটা হয় শুনব। কিন্তু ভায়া, যদি তোমার সঙ্গে দেখা হয়, আমার কথাটা ব'লো। ভিণ্টেটার ব্যবস্থা না হয় যখন হোক হবে, তাড়া নেই; কিন্তু মেয়েটার বিয়ে আর দেরি করা চলে না, এখনই লোকে নিন্দে করতে শুরু করেছে।

মণীন্দ্র যাইতেই পত্নী আসিয়া কহিলেন, হ্যাঁ গো! গাঙুলী বুড়োর কি হয়েছে?

গম্ভীর মুখে কহিলাম, প্লেগ।

স্ত্রী আঁতকাইয়া উঠিয়া কহিলেন, ওমা! সে কি গো! কি সর্ব্বনাশ! তবে তুমি রাতদিন যাচ্ছ যে বড়?

বল কি! খবর নোব না? রোগে-শোকেই তো বন্ধু।

স্ত্রী কহিলেন, তা বটে। তবে বেশি ছোঁয়া-নাড়া ক'রো না। গাঙুলী-গিন্নী কি করছে? একদিন দেখতে যাব নাকি?

যেও, তোমাকে এত স্নেহ করেন ওঁরা দুজনেই—

স্ত্রী একটু চিন্তিতভাবে থাকিয়া কহিলেন, ঐ মেয়েটাই বোধ হয় রোগের বিষ এনেছে, পশ্চিমে শুনেছি প্লেগের আড্ডা।

তা হবে।

কিঞ্চিৎ ধারালো কণ্ঠে কহিলেন, তা বেশ হয়েছে, যেমন বুড়ো ছুঁড়ীর সঙ্গে মাখামাখি করতে গিয়েছিল। ভগবানের কৃপায় ভাল হয়ে উঠুক, কিন্তু শিক্ষা হয়েছে।

চুপ করিয়া রহিলাম।

তুমিও যেন বেশি মাখামাখি ক'রো না। তোমার সঙ্গেও তো ভাব করতে আসবে শুনছি।

প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই, করিলামও না।

কণ্ঠস্বর শাণিত করিয়া কহিলেন, সাপিনীর সঙ্গে প্রেম করা সাপেরই সাজে। অন্য কেউ কিছু করতে গেলেই ছোবল খেয়ে বিষে জ'রে যেতে হবে, এই কথাটা না ভুলে যার সঙ্গে পার ভাব ক'রো গিয়ে, আমি কিছু বলব না।—বলিয়া কিছুক্ষণ কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া থাকিয়া চলিয়া গেলেন।

দমিয়া গেলাম, ইহার মধ্যেই চব্বিশ বৎসর বয়সের সাপিনীর সাপ হইবার যোগ্যতা হারাইয়াছি নাকি?

৩

পরদিন সন্ধ্যার পর, বৈঠকখানায় বসিয়া পড়াশুনা করিতেছিলাম। গুমট গরম, তাহার উপর মশার উপদ্রব। কাজেই, উর্ধ্বাঙ্গ একেবারে

নিরাবরণ করিয়া, নিম্নাঙ্গে কোনমতে পরিধেয় বস্ত্রখানি ধারণ করিতেছিলাম, এবং বাম হাতে একটি হাত-পাখা লইয়া ঘন ঘন সঞ্চালন করিতেছিলাম। হঠাৎ পত্নীর কণ্ঠস্বর শুনিলাম, ওগো, শুনছ ?

অন্যমনস্কভাবে কহিলাম, কি ?

একেবারে পাশে আসিয়া হাজির হইয়া কহিলেন, দেখ, কে এসেছে !

চাহিয়া দেখিলাম, সরোজিনী স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া আছে, কেশ ও বেশ পূর্ববৎ।

দেখুন দেখি কি কাণ্ড ! এই অর্ধনগ্ন ঘর্মাক্ত কলেবরে কোন দিন কোন সুন্দরী তরুণীর, বিশেষ করিয়া সরোজিনীর, সম্মুখীন হইব কখনও ভাবিয়াছিলাম কি ? যখনই শুনিয়াছিলাম, সরোজিনী আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে, তখনই তাহার সম্মুখে কেমন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিব, সে সম্বন্ধে একটি প্ল্যান মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম। ধোপদস্ত একখানি ধুতি গুছাইয়া পরিব ; গায়ে থাকিবে খদ্দরের ধবধবে সাদা পাঞ্জাবিটি (আমি যে স্বদেশপ্রেমিক, ইহা দেখিয়া বুঝা যাইবে) ; পুরাতন চটি জোড়াটি ঝাড়িয়া মুছিয়া পায়ে পরিব ; টেবিলটির টেবিল-ক্লথ অভাবে ধোয়া বিছানার চাদর দিয়া ঢাকিয়া, তাহার উপরে দুই-চারিখানি মোটা মোটা বই সাজাইয়া রাখিব। সরোজিনীর আগমন-বার্তা পাইবামাত্র সুবিধামত একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া, যে কোন একটা বই খুলিয়া তাহার প্রসারিত পত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিব। সরোজিনী হয়তো কাছে আসিয়া স্বভাবসুলভ মিহি ও মিষ্ট সুরে কহিবে, নমস্কার। সাড়া দিব না। সুগভীর তত্ত্বের মধ্যে যেভাবে নিমজ্জিত হইয়া থাকিব, তাহাতে সহস্র সরোজিনী সমস্বরে ডাকিলেও সাড়া দেওয়া সম্ভব হইবে না। হঠাৎ ভাবাকুললোচনে কড়িকাঠের দিকে তাকাইতে গিয়া সরোজিনীর সহিত চোখোচোখি হইবামাত্র শশব্যস্তে

উঠিয়া দাঁড়াইয়া সাদরে তাহাকে বসাইব। তারপর, কথায় বার্তায়, আচারে আচরণে, ভাবে ভঙ্গীতে, আমার শিক্ষা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ, হৃদয়ের ঔদার্য, মনের কুসংস্কারবিমুক্ত প্রগতিশীলতা এমন নির্ঘাতভাবে প্রকাশ করিব যে, সরোজিনী হাঁ করিয়া আমার দিকে তাকাইয়া ভাবিতে থাকিবে, এই অজপাড়াগাঁয়ে, রাধানাথ ও গাঙ্গুলী মশায়দের সমাজে এমন একটা লোক থাকা সম্ভব ? হয়তো মনের কোণে প্রবোধ ও আমাকে পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া একটি ক্ষীণ ক্ষোভের নিশ্বাসও ফেলিবে।

কিন্তু তাহার বদলে কি হইল বলুন দেখি ? গৃহিণীর কাণ্ডজ্ঞানের অভাব ঘটিতেছে, না, আমাকে অপদস্থ করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া এই কাণ্ড করিয়াছেন ?

পাখাটা ফেলিয়া, বইটা ঠেলিয়া, কাপড় সামলাইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিয়া কহিলাম, কখন এলেন ? বসুন।—বলিয়া একটা চেয়ারের উদ্দেশ্যে আগাইবার উপক্রম করিতেই সরোজিনী কহিল, থাক্, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? বসছি।—বলিয়া নিজেই একটা চেয়ার টানিয়া আমার স্ত্রীকে কহিল, বসুন। এবং আর একটা চেয়ার টানিয়া নিজে বসিয়া মিহি গলায় বিনাইয়া বিনাইয়া কহিল, 'আসুন, বসুন' ব'লে আমাকে অপরাধী করবেন না। আমি আপনার ছোট বোনের মত।

বোকার মত হাসিয়া কহিলাম, তা বটে, তা বটে—

সরোজিনী কহিল, বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?

এই যে বসছি।—বলিয়া বসিয়া পড়িলাম।

সরোজিনী আমার স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, কদিনই মনে করেছি—আসব, নানা ঝঞ্ঝাটে ঘ'টে ওঠে নি। ঘরদোর যা হয়েছিল,

পা দেওয়া যায় না। যাক, কোনমতে—। হঠাৎ আমার দিকে চাহিয়া কহিল, আপনি ঘেমে নেয়ে গেলেন যে, পাখাটা দিন দেখি, একটু বাতাস ক'রে দিই।—বলিয়া পাখাটার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াইতেই 'থাক্ থাক্, আমিই করছি' বলিয়া পাখাটা তুলিয়া লইলাম। সরোজিনী আমার হাত হইতে পাখাটা প্রায় ছিনাইয়া লইয়া, চেয়ারটা একটু আমার কাছে টানিয়া আনিয়া বসিয়া কহিল, বাঃ রে! ছোট বোন কাছে থাকতে আপনি নিজে পাখা করবেন?—বলিয়া পাখা করিতে লাগিল। সরোজিনীর দেহ হইতে একটি মৃদু সুগন্ধ নাকে আসিল; এসেন্স মাখিয়াছে বোধ হয়; পুলকিতচিত্তে নাক ভরিয়া নিশ্বাস লইবার আগে পত্নীর দিকে কটাক্ষে চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার চক্ষে ও ওষ্ঠে বিদ্রূপের হাসি, অগত্যা নিশ্বাস লওয়া বন্ধ করিলাম। কিন্তু আমার কি অপরাধ বলুন দেখি? আমি ইচ্ছা করিয়া ঘামি নাই, বা কাহাকেও পাখা করিতে বলি নাই।

সরোজিনী কহিতে লাগিল, উনি আপনার কথা প্রায়ই বলতেন। গাঁয়ের মধ্যে আপনিই নাকি তাঁর একমাত্র সত্যিকার বন্ধু ছিলেন।

বন্ধু! প্রবোধের কাণ্ড দেখুন! পঞ্চাশ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ আমার বন্ধু! সরোজিনী কি মনে করে আমাকে? সোজাসুজি প্রতিবাদ না করিয়া ঘুরাইয়া বলিলাম, হ্যাঁ, আমাকে ছোট ভাইয়ের মতই স্নেহ করতেন তিনি।

উৎসাহিত হইয়া সরোজিনী কহিল, সত্যি। প্রায়ই বলতেন—যদি কোন দিন আমার কিছু হয়, আর যদি গাঁয়ে গিয়ে বাস করতে চাও তো, আপনার নাম ক'রে বলতেন, ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াবে, গাঁয়ের আর কাউকে বিশ্বাস ক'রো না।

সরোজিনী ধাপ্পা দিতেছে। যদি স্বামী তাহার এই কথাই বলিয়াছিল

তো রাধানাথ ও গাঙুলী মশায়ের সঙ্গে আগে সলা-পরামর্শ না করিয়া আমার কাছেই আসা উচিত ছিল। কাজেই কথাটার মোড়টা ফিরাইবার জন্য কহিলাম, কি হয়েছিল ওঁর ?

প্রথমে জ্বর, তারপর পেটের অসুখ। ডাক্তারবাবু অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। দিন দিন অবস্থা খারাপ হতে লাগল। ডাক্তারবাবু শেষে বললেন, আমার দ্বারা সুবিধে হচ্ছে না, বাইরে থেকে কাউকে আনাবার ব্যবস্থা হোক। উনি আমাকে বললেন—কাউকে আর ডাকতে হবে না, কেউ আমার কিছু করতে পারবেন না। গুরুদেবকে খবর দাও, ওঁর চন্নামেত্ত খেয়ে সারি তো সারব। গুরুদেবকে তার করা হ'ল ; ভারি ভালবাসতেন ওঁকে, তার পেয়েই চ'লে এলেন। এসে দেখে আমাকে বললেন—আগে খবর দিস নি কেন ? ভারি দেরি হয়ে গেছে। মৃত্যু অনেকটা গ্রাস ক'রে নিয়েছে। যাক, তবু যদি মাথার কাছে ব'সে এক লক্ষ একবার নাম জপ ক'রে উঠতে পারি তো প্রবোধকে আমি টেনে বের ক'রে নিয়ে আসব। তারপর তিনি আসন ক'রে শিয়রে বসলেন, নামজপ শুরু হ'ল, কিন্তু এমনই আমার কপাল—। সরোজিনীর কণ্ঠে অশ্রু ঘনাইয়া আসিল, ধরা গলায় কহিল, জপ শেষ হতে না হতে ওঁর সব শেষ হয়ে গেল। শেষের দিকটায় সরোজিনী কণ্ঠস্বর ভাঙিয়া ফেলিল এবং চক্ষে অঞ্চল দিয়া বারংবার চক্ষু দুইটি মার্জনা করিতে লাগিল।

করুণরসের সৃষ্টি হইতেছে দেখিয়া প্রসঙ্গান্তরে চলিলাম, প্রশ্ন করিলাম, গুরুদেবটি কে ?

বাষ্পলেশহীন কণ্ঠে দুই চোখ ডাগর করিয়া সরোজিনী কহিল, আনন্দময় স্বামীকে জানেন না ? সারা পৃথিবীর লোক ওঁর নাম জানে যে। কত বড় বড় লোক যে ওঁর শিষ্য, তার ইয়ত্তা নাই।

অপরাধীর মত কহিলাম, নাম শুনেছি ব'লে তো মনে হচ্ছে না, বাঙালী, না—

সরোজিনী কহিল, বাঙালী বইকি। পূর্ববঙ্গে বাড়ি ছিল। রেলে মস্তবড় চাকরি করতেন। একদিন ভগবান স্বপ্নে তাঁকে বললেন, করছিস কি? তোর কি এই কাজ? জীব উদ্ধার করবার জন্যে তোকে পাঠিয়েছিলাম, ভুলে গেছিস? এই শুনে উনি অতবড় চাকরি ছেড়ে দিয়ে হিমালয়ে চ'লে গেলেন। সেখানে বারো বৎসর সাধনা ক'রে সিদ্ধ হয়ে ফিরে এলেন। রেলের যত বড় বড় চাকুরে ওঁর শিষ্য, শুধু বাঙালীরাই নয়, বেহারী, মারাঠী, সিন্ধী, গুজরাটী, মাদ্রাজী সব দেশের লোক। এই দেখুন না, আমাদের ডাক্তারবাবু গুজরাটী, তিনি গুরুদেবের একজন প্রধান শিষ্য।

প্রশ্ন করিলাম, যিনি প্রবোধদাদার চিকিৎসা করেছিলেন?

ঘাড় নাড়িয়া সরোজিনী কহিল, হ্যাঁ। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিতে লাগিল, ভারি ভাল লোক তিনি। এতবড় ডাক্তার, এত রোজগার, কিন্তু অহঙ্কারের লেশমাত্র নেই। আর চেহারাও চমৎকার, যেমন লম্বা-চওড়া, তেমনই টকটকে গায়ের রঙ। স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া কহিলেন, সত্যি, এমন চেহারা বাঙালীদের মধ্যে কোন দিন দেখি নি।

স্ত্রী ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না।

কিন্তু ডাক্তারবাবুর গুণের প্রশংসা করিতে গিয়া সরোজিনী যে তাঁহার রূপের প্রশংসায় গদগদ হইয়া উঠিতেছে দেখি!

পত্নী হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, তোমরা গল্প কর, আমি আসছি এখনই।

সরোজিনী কহিল, বসুন না বউদিদি, কোথায় যাবেন?

স্ত্রী কহিলেন, আসছি ভাই, বেশি দেরি হবে না।

কিন্তু কিছু হাঙ্গামা করবেন না যেন।

পাগল! হাঙ্গামা আবার কি করব? বাড়িতে নতুন এলে, একটু মিষ্টিমুখ করতে হয় কিনা, তারই একটু ব্যবস্থা—। বলিয়া কথা শেষ না করিয়াই চলিয়া গেলেন।

সরোজিনী অনুযোগের সুরে কহিল, দেখুন দেখি, বউদিদি আবার কি সব পাগলামি শুরু করলেন!

গম্ভীর মুখে কহিলাম, দাদার বাড়িতে এলে বউদিদির অত্যাচার একটু সহ্য করতে হবে বইকি।

সরোজিনীর দুই চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, কহিল, ভারি ভাল লাগল আপনার কথা শুনে। আজ থেকে কিন্তু সকলের সামনেই 'দাদা' ব'লে ডাকব।

বেশ তো, ডেকো।

বউদিদিকেও 'বউদিদি' ব'লে ডাকব।

হাসিয়া কহিলাম, তা তো ডাকতেই হবে। দাদার স্ত্রীকে অন্য কিছু ব'লে ডাকা উচিত হবে না বোধ হয়।

সরোজিনী হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, না না, তা বলছি না। মানে, সকলের সামনে।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীর মুখে কহিল, শুধু দাদা হ'লেই তো হবে না, তার দায়িত্বও নিতে হবে কিন্তু।

যেন দাদা হইবার জন্য ঝুলোঝুলি করিতেছিলাম এতক্ষণ। দয়া করিয়া কাজে বহাল করিয়া কাজের ফিরিস্তি দিতেছে।

কহিলাম, কি দায়িত্ব?

অনাথা ছোট বোনটার দিকে একটু দৃষ্টি রাখা, তাকে একটু সাহায্য করা।

দৃষ্টি আমি রাখব। কিন্তু সাহায্য কি করব বল? মাস্টার মানুষ, বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপার কিছু বুঝি না, তবে নিজ বুদ্ধিমত পরামর্শ দিতে পারি।

তাতেই আমার হবে। সম্প্রতি একটা পরামর্শ দিন দেখি। গাঙুলী বঠ্‌ঠাকুর তো অসুখে পড়েছেন। রাধানাথ ঠাকুরপোকে বলতেই তিনি সব ব্যবস্থা ক'রে দিতে রাজি হয়েছেন, কিন্তু বলছেন, তাঁকে রেজিস্টরি ক'রে একটা ক্ষমতা-পত্র দিতে হবে।

কহিলাম, কেন?

বলছেন, বিধবার সম্পত্তি, শেষে লোকে তাঁকে দোষ দিতে পারে। আমিও নাকি ভবিষ্যতে ইচ্ছে করলে তাঁকে বিপদে ফেলতে পারি।

কহিলাম, এত সব করবার দরকার আমি দেখি না। উনি প্রজা-খাতকদের ডেকে ব'লে দিন। তারা এসে তোমাকে খাজনা দিয়ে যাবে। তোমার মন্টুদাকে বললে সে দাখলে-টাখলে লেখা, তা ছাড়া আরও অনেক বিষয়ে তোমাকে সাহায্য করতে পারে।

আমিও তো তাই বলেছি। উনি বলছেন, না, এতে তাঁর সম্মানের হানি হবে; লোকে বলবে, রাধানাথ প্রবোধ গাঙুলীর স্ত্রীর গোমস্তা।

কিছুক্ষণ বিজ্ঞের মত চিন্তাকুলভাবে বসিয়া থাকিয়া কহিলাম, আমার কিন্তু ওসব হাঙ্গামা ভাল মনে হচ্ছে না, তবে তোমার যদি—

সরোজিনী বাধা দিয়া কহিল, আমারও ভাল মনে হয় নি। আমি কালই রাধানাথ ঠাকুরপোকে ব'লে দোব, ওসব দরকার নেই। তা ছাড়া, তাঁর নিজে করবার দরকার কি? দোকানে এতগুলো কর্মচারী রয়েছে, যে কোন একজনকে দিয়ে করালেই পারেন। আমি বরং তাকে মাসে কিছু ক'রে দোব। অবশ্য আমি নিজে লোক রাখতে পারতাম, তবে রাধানাথ ঠাকুরপোর লোক হ'লে কাজ বেশি হবে।

পত্নী আসিয়া হাজির হইলেন, হাতে একটা থালা, তাহাতে খানকয়েক লুচি ও মিষ্টি।

সরোজিনী কহিল, দেখুন দেখি কি কাণ্ড! আমি কিন্তু কিছু খেতে পারব না।

পত্নী কহিলেন, বেশি কিছু নয়, একটুখানি।

কিঞ্চিৎ বাদ-প্রতিবাদের পর সরোজিনী 'মিষ্টিমুখ' করিল এবং আরও কিছুক্ষণ পরে বিদায় লইল।

রাত্রে আহারের সময়ে কহিলাম, মেয়েটি ভারি চমৎকার, নয়?

পত্নী মুখ টিপিয়া হাসিলেন, চমৎকারই তো, পাখা করছিল যখন।

না না, সেজন্যে বলছি না, এমনই মেয়েটি বেশ ভাল।

পত্নী গম্ভীর হইয়া উঠিয়া কহিলেন, ভালই তো। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, তবে পাখা তোমাকে যত না করুক, নিজেকেই করছিল বেশি, না হ'লে ঘামে মুখের পাউডারটা ধুয়ে যেত কিনা।

দূর! পাউডার আবার কোথায়?

কেন? ড্যাবড্যাব ক'রে মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলে, আর পাউডার দেখতে পাও নি?

পাউডার যাক, প্রতিবাদ করিলাম, তাকিয়ে আবার ছিলাম কখন?

খুব ছিলে। তোমার কি হুঁশ ছিল কিছু? আমারই লজ্জা করছিল। ভাবছিলাম, কি মনে করছে ও!

কহিলাম, তোমার যেমন কথা!

সত্যি বলছি। কিন্তু তুমি আমাকে আশ্চর্য ক'রে দিয়েছ।

সন্দিগ্ধস্বরে কহিলাম, কেন?

ভাবতাম, তুমি যা মানুষ, পরের মেয়ে দেখলে হয়তো লজ্জায় জড়সড় হয়ে যাবে। ওমা! দেখলাম, বেশ চনচনে ভাব, গা ঘেঁষে

বসতেও একটু ইতস্তত করতে দেখলাম না, আর কত প্রাণের কথা! আমি যে একটা জীব কাছে ব'সে আছি, খেয়াল নেই।

বাঃ রে! তুমি গোঁজ হয়ে ব'সে থাকলে আমি কি করব?

আমি কি করব! কিন্তু বেশি লাফিও না। ডাক্তারের রূপের ব্যাখ্যান করতে করতে যা 'ধর-ধর' ভাব দেখলাম, ওর কাছে বেশি সুবিধে হবে না।

কি যে বল! দাদা পাতিয়ে গেল না!

দাদা!—বলিয়া পত্নী অধর ও ওষ্ঠ সহযোগে শ্লেষসূচক শব্দ করিলেন।

৪

পরদিন স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিবার সময়ে রাধানাথের সঙ্গে দেখা হইল। আমাকে দেখিয়া একেবারে হাসিয়া 'আটখানা' হইয়া গেল। বিরক্ত মুখে কহিলাম, কি ব্যাপার? রাধানাথ আরও কিছুক্ষণ টানিয়া টানিয়া হাসিয়া, শেষে হাস্য সংবরণ করিয়া কহিল, ভায়া একেবারে বর্ণচোরা আম। বাইরে নিরীহ ভালমানুষটি, ভেতরে একেবারে জিলিপির পাক। কহিলাম, মানে?

মানে, বউঠানকে যা পরামর্শ দিয়েছ, একেবারে মোক্ষম। তার ওধারে আর পা নেই, রাধানাথ গাঙ্গুলী হুমুঠো ক'রে খাবার যোগাড় করছিল, তা একেবারে ভেস্তে দিয়েছ।—বলিয়া কোলা ব্যাঙের মত চোখ দুইটা মেলিয়া তাকাইয়া রহিল। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হইয়া কর্কশস্বরে কহিল, ভায়া, তোমাদের গাঙ্গুলী বুড়োর মত প্রবোধ গাঙ্গুলীর বউয়ের পেছনে আমি ছুটোছুটি করি নি। আমাকেই পাঁচবার

ডেকে পাঠিয়ে হাত ধ'রে বলতে আমি রাজি হয়েছি। তবে সাদাসিধে মানুষ কিনা, তোমাদের মত বাঁকাচোরা ভালবাসি না। তাই বলেছিলাম একটা কাগজ ক'রে দিতে, যাতে ভবিষ্যতে কোন গোলমালের সৃষ্টি না হয়। গাঁয়ে তোমরা পাঁচজন বেঁচে থাকতে কুপরামর্শ দেবার লোকের অভাব হবে না। তখন ঐ বউটিই হয়তো আমাকে বিপদে ফেলতে পারে। তা তোমরা ভাবলে, রাধানাথ বুঝি সব মেরে দেবে। ওহে! এখনও ইংরেজ রাজত্ব চলছে, আর চিরদিন চলবেও, যতই তোমরা হিট্‌লার হিট্‌লার ব'লে হাঁকাহাঁকি কর না—

সন্ত্রস্তভাবে কহিলাম, ওসব কি বলছ?

কপাল কুঁচকাইয়া, চোখ দুইটা ছোট করিয়া ও মাথাটা উপর দিকে ঝাঁকানি দিয়া রাধানাথ কহিল, কেন? চেঁচাও না তোমরা? আজ এত হাজার টন ইংরেজের জাহাজ ডুবেছে, আজ এত ইংরেজ মরেছে—ব'লে তুড়িলাফ দাও না তোমরা?

দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করিলাম, কি যা-তা বলছ?

যা-তা বলছি না, দারোগাবাবু পর্যন্ত জানেন। বেশ, ও কথা যাক, প্রবোধের বউ তো তোমার পরামর্শ শুনে কাগজ ক'রে দিতে রাজি হ'ল না। তুমি ভাবলে, আমি একেবারে জব্দ হয়ে গেলাম, না? ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি নাড়িয়া কহিল, একদম না, বরং ক্ষতি প্রবোধের স্ত্রীর। আমার একটা কর্মচারী প্রবোধ গাঙুলীর সেরেস্তায় ঠেলে দিলাম। মানে, প্রবোধের স্ত্রীর কাছে মাইনে নেবে আর কাজ করবে দুজনেরই। আমার ক্ষতি, না, লাভ?—বলিয়া ঠোঁট দুইটা চাপিয়া ভ্রূ দুইটা তুলিয়া আমার দিকে আড়-চোখে চাহিয়া রহিল।

কোনমতে রাধানাথের হাত ছাড়াইয়া বাড়ি পৌঁছিলাম। কিন্তু

মনের মধ্যে রাধানাথের মন্তব্যটা সারাক্ষণ খচখচ করিতে লাগিল। রাধানাথ কি দারোগাবাবুর কাছে আমাদের বিরুদ্ধে লাগাইতেছে নাকি? তাহা হইলেই তো বিপদ! সারা ভারত জুড়িয়া সরকার বাহাদুর যে ভারত-রক্ষা-আইনের জাল পাতিয়াছেন, তাহাতে একটু বেকায়দায় হাঁচিলে কাশিলে আটকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা। তাহার উপর যদি সত্য সত্যই কোন অপরাধ বাহির হইয়া পড়ে এবং সাক্ষীর মুখে তাহা প্রমাণিত হইয়া যায়, তাহা হইলে বৎসর কয়েক শ্রীঘরবাস অনিবার্য।

সন্ধ্যার সময়ে গাঙুলী মশায়ের সহিত দেখা করিতে গেলাম—পারিবারিক সঙ্কটটা কাটাইয়া উঠিয়াছেন কি না সংবাদ লইতে ও রাধানাথ-কৃত মন্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে। বাড়ির মধ্যে গিয়া দেখিলাম, গাঙুলী মশায় উঠানে একটা খাটিয়ায় বসিয়া তামাক টানিতেছেন। যাইতেই আপ্যায়ন করিয়া পাশে বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, কেমন আছেন? ঠোঁট দুইটা ফাঁক করিয়া দুই পাটি দাঁত দেখাইয়া গাঙুলী মশায় কহিলেন, ভালই।

কবে পেলেন?

সেদিন রাত্রে। বললাম যে, গিন্নীর কাণ্ড, ঠিক তাই। সারাদিন খেলাম না, জল পর্যন্ত গিললাম না, রাত্রেও তাই, গিন্নী শেষে বার ক'রে দিলে।

মিটমাট হয়ে গেছে তা হ'লে?

তা হয়েছে, কিন্তু বিপদ যা ঘটবার তা ঘ'টে গেছে কিনা।

বিপদ আর কি?

সমস্ত ইউনিয়নে রাধানাথ রটিয়ে দিয়েছে যে, আমার প্লেগ হয়েছে। বাঁচবার আশা নেই, তাই শুনে সবাই দেখতে আসছে, মায় দারোগাবাবু

পর্যন্ত। তবে ভাগ্যি যে, কেউ ঘরে ঢুকছে না, সব বাইরে থেকেই খবর নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সারাদিন এই গুমট গরমে ঘরের মধ্যে বিছানায় শুয়ে রোগী সেজে থাকতে হচ্ছে তো। প্রথম দুদিন তো গরম কম্ফর্টার জড়িয়ে থাকতে হয়েছিল, কি বিপদ বল দেখি!

দারোগাবাবু ঘরে ঢুকেছিলেন নাকি?

পাগল! প্লেগের রোগীর কাছে কেউ ঘেঁষতে চায়! উনি তো বাইরে দাঁড়িয়েই দু-চার কথা জিজ্ঞেসা ক'রে চ'লে গেলেন।

বলিলাম, রাধানাথ আমাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করছে বোধ হয়।

উৎসুক কণ্ঠে গাঙুলী মশায় কহিলেন, কি করছে?

আমার বৈঠকখানায় মাস্টাররা মাঝে মাঝে জড়ো হয়ে যুদ্ধের আলোচনা করেন। হৈ-চৈও একটু হয় অবশ্য। আজ রাধানাথ বলছিল, আমরা নাকি ইংরেজের বিপক্ষে কথাবার্তা বলি। দারোগাবাবুও নাকি এ কথা জানেন। আমার মনে হয়, রাধানাথই আমাদের নামে দারোগাবাবুর কাছে ব'লে এসেছে।

গাঙুলী মশায় সস্নেহ তিরস্কারের সুরে কহিলেন, তোমার যত ছেলেমানুষি! ওসব আড্ডা বসতে দাও কেন? খবরের কাগজ নিজে নিজে পড়বে, মতামত নিজের মনের মধ্যেই রেখে দেবে। একালে কাউকে বিশ্বাস নেই। তোমার মাস্টারদের মধ্যেই হয়তো কেউ গোয়েন্দাগিরি করছে।

কহিলাম, দারোগাবাবুকে কি রকম লোক মনে হয়?

মুখে তো বেশ ভদ্র। দেখা করতে গেলে আদর-আপ্যায়নও করে। তবে হিন্দু তো নয়, মুসলমান। হিন্দু হ'লে খাইয়ে-দাইয়ে, মেয়েছেলেদের মধ্যে আসা-যাওয়া ঘনিষ্ঠতা করিয়ে একেবারে হাত করা যেত। একে তো তা চলবে না, ঘি-মাছ খাইয়েই যতটা হয়।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, চপাই চাঁদাই-এর মুসলমানদের সঙ্গে খুব দহরম-মহরম। আসছে ইলেকশানে নাকি চপাইয়ের আজিজ সাহেবকে বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট করবার চেষ্টা করছে।

কহিলাম, তা কি ক'রে হবে? বোর্ডে হিন্দু মেম্বারই তো বেশি।

গাঙুলী মশায় ক্ষোভের সুরে কহিলেন, হিন্দুদের মধ্যে একতা কই হে? রাধানাথই হয়তো ওদের দলে যোগ দেবে, দেখো।

আজিজ সাহেব তো ডিস্ট্রিক-বোর্ডের সরকার-মনোনীত সভ্য, ও আবার এদিকে কেন?

গাছেরও খাবে, তলেরও কুড়োবে আর কি। তা ছাড়া বাংলা দেশে এখনও মুসলমানদের রাজত্ব চলছে, কোথাও হিন্দুপ্রাধান্য ওরা সহ্য করবে কেন? কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, তবে এখনও অনেক দেরি, এখন থেকে ভাববার দরকার নেই।

কহিলাম, কিন্তু আমার ব্যাপারটা—। গাঙুলী মশায় সাহস দিয়া কহিলেন, ওতে এত ভাবনার কি আছে? হয়তো রাধানাথ মিথ্যে বলেছে, আর যদি সত্যিও হয়, দারোগাবাবুকে একটু ঠাণ্ডা ক'রে দিয়ে এলেই চলবে।—বলিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী সহযোগে টাকা বাজাইবার ভঙ্গী করিলেন।

প্রসঙ্গটা বদলাইবার জন্য কহিলাম, দিদিমাকে দেখছি না? গাঙুলী মশায় মুখের ইঙ্গিত করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, অন্ধকার ঘরে ব'সে হরিনাম হচ্ছে। মাগীর ভিটলেমি অনেক আছে তো। এদিকে ধর্ম করছেন, আর ওদিকে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করছেন।

ভালই তো করছেন, মিছামিছি এসব গোলমালে যাবার দরকার কি?

হুঁ।—বলিয়া গাঙুলী মশায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। কিছুক্ষণ চুপ

করিয়া থাকিয়া কহিলেন, হ্যাঁ, মনে পড়ল, প্রবোধের বউ নাকি তোমার ওখানে এসেছিল ?

কে বললে আপনাকে ?

হারাণ। কি জন্যে এসেছিল ?

হারাণ, গাঙুলী মশায়ের গুপ্তচর, হিট্‌লারের হিম্‌লার। শয়নকক্ষের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীতে কি কথাবার্তা হইতেছে, হারাণ তাহার খবর লইয়া গাঙুলী মশায়কে সরবরাহ করে। হারাণের ইহাতে লাভ কিছুই নাই, স্বার্থ কিছু নাই, একেবারে নিষ্কাম কর্মযোগ।

আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিল।

কি কথাবার্তা হ'ল ?

আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, রাধানাথ ওর সম্পত্তি দেখাশোনা করবার জন্যে ওকে একটা ক্ষমতাপত্র রেজিস্টারি ক'রে দিতে বলেছে, ওর দেওয়া কি উচিত হবে ? আমি নিষেধ ক'রে দিলাম।

খুশি হইয়া গাঙুলী মশায় কহিলেন, বেশ করেছ। তবে, বিছানায় প'ড়ে থেকেও যা ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছি, স্বয়ং লাট সায়েবের কাছ থেকে ক্ষমতাপত্র আনলেও কিছু করতে পারবে না।

বিস্ময়ের সহিত কহিলাম, কেন ?

ডান হাতের তর্জনীটি ঠিক আমার নাকের সামনে প্রসারিত করিয়া, নাড়িতে নাড়িতে গাঙুলী মশায় কহিলেন, কলকাঠি নেড়ে দিয়েছি ভায়া। প্রজা-খাতক কেউ গাঙুলী মশায় সামনে না থাকলে একটি পয়সা দেবে না।

চুপ করিয়া রহিলাম।

গাঙুলী মশায় কহিলেন, মন্মু চক্রবর্তী নাকি খুব রাধানাথের কাছে আনাগোনা করছে ? ভাবছে, রাধানাথ মাগীর কাছে টাকা আদায়

ক'রে ওর মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবে। ও মাগীও বড় সোজা! আর তেমনই সোজা রাধানাথ! আমার হাতে ব্যবস্থা থাকলে মন্নুকে পাইয়ে দিতাম কিছু। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, পৃথিবীতে পরের উপকার করাটাই সবচেয়ে শক্ত কাজ ভায়া।

৫

পরদিন সকালে মণীন্দ্র আসিয়া কহিল, ভায়া, এ কি বুদ্ধি?

কহিলাম, কার?

তোমার। লোকে যে বলে, বারো বৎসর মাস্টারি করলে ডান-বাম জ্ঞান থাকে না, সত্যি।

কি হ'ল?

সরুকে ও কি পরামর্শ দিয়েছ? মাসে মাসে পনরো টাকা একজন পরের হাতে তুলে দেবে?

ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়া কহিলাম, আমি কি করব? যার টাকা সে যদি নিজের ইচ্ছেয় দেয়—

ওর ইচ্ছে তো নয়, তোমার পরামর্শেই দিচ্ছে।

বিরক্ত হইয়া কহিলাম, পাগল নাকি! আমার কি দায় পড়েছে পরামর্শ দিতে?

মণীন্দ্র ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, তোমার পরামর্শ নয়? তবে যে শুনলাম—। তা যাক, আমার সঙ্গে একবার এস দেখি।—বলিয়া আমার ডান কাঁধটা চাপিয়া ধরিয়া টান মারিল।

বিস্ময়ের সহিত কহিলাম, কোথায়?

সরুর ওখানে। তোমার ওপরই নাকি ভারি ভক্তি আজকাল। তা এস দেখি, একটু বুঝিয়ে দিয়ে আসবে।

বাধা দিয়া কহিলাম, ক্ষেপেছ নাকি! স্কুলের সময় হয়ে গেছে আমার, এখন বিরক্ত ক'রো না।

মণীন্দ্র অনুযোগের সুরে কহিল, বাঃ রে! ভুলুকটি কেটে দিয়ে এখন বোজাবার সময় যাবার নাম নেই!

মানে?

দিন কত ক'রে বেরিয়ে যাচ্ছে জান? আট গণ্ডা পয়সা, অথচ মিথ্যে। কোন কাজ হচ্ছে না। ওই পয়সাটা আমার হাতে এলে—

বাধা দিয়া কহিলাম, কাজ হচ্ছে না মানে? আদায়-উসুল হচ্ছে না নাকি?

মণীন্দ্র ঘাড়টি এদিক ওদিক বার কয়েক নাড়িয়া কহিল, একটি পয়সাও না। গাঙুলী বুড়ো বারণ ক'রে দিয়েছে সবাইকে। কাতরকণ্ঠে কহিল, মিথ্যে এতগুলো টাকা মাসে মাসে পরের হাতে যাবে?

কহিলাম, বেশ তো, বোনকে বলগে, লোক রাখবার দরকার নেই।

ক্ষোভের সহিত মণীন্দ্র কহিল, আমার কোন্ কথাটা শোনে!— বলিয়া করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া রহিল। হঠাৎ চোখের ভঙ্গী বদলাইয়া, ভ্রূ দুইটা নাচাইয়া কহিল, মনে পড়েছে। ভিণ্টে ফুণ্টির কথা বলেছিলে সরুকে?

কৃত্রিম অনুশোচনার সহিত কহিলাম, এই যা! একদম ভুলে গেছি ভাই। বলা হয় নি।

মণীন্দ্র কহিল, জানি, জানি। তুমি যে বলবে না, আগেই জানতাম। আচ্ছা, এর পর দেখা হ'লে দয়া ক'রে ব'লো দেখি।

নিশ্চয় বলব।

উৎসাহিত হইয়া মণীন্দ্র কহিল, বেশ তো। এখনই চল না।

ত্রস্তকণ্ঠে কহিলাম, না না, এখন না, স্কুলের দেরি হয়ে যাবে।

বেশ, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও ; ওই রাস্তা দিয়েই স্কুলে যাবে, বেশিক্ষণের তো মামলা নয় ; একবার দাঁড়িয়ে দু-চার কথা ব'লে দেবে।

কেন ক্ষ্যাপামি করছ মনুদা ? এখন যেতে পারব না।

বেশ, আজ সন্ধ্যেয় ?

চুপ করিয়া রহিলাম। মণীন্দ্র কহিল, এই কথা রইল। সন্ধ্যের সময় তোমাকে ডেকে নিয়ে যাব, পালিও না যেন।

স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিতেছি, দেখিলাম, রাস্তার ধারে মণীন্দ্র দাঁড়াইয়া। আমাকে দেখিবামাত্র একগাল হাসিয়া কহিল, ভায়া, আজ এত দেরি ?

গম্ভীর মুখে ভারী গলায় কহিলাম, কাজ ছিল।

অনুযোগের স্বরে কহিল, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল।

বিরক্ত হইয়া কহিলাম, এখনই যেতে হবে নাকি ?

মণীন্দ্র কহিল, না না, তার দরকার কি ? সরোজিনী তো পালিয়ে যাচ্ছে না।

রাগতস্বরে কহিলাম, পালিয়ে যাচ্ছে না জান তো এখন থেকে ওত পেতে দাঁড়িয়ে আছ কেন ?

মণীন্দ্র কিঞ্চিৎ অপ্রতিভভাবে কহিল, ভায়া, কি যে আমার মনের অবস্থা, বুঝতে পারছ না তো ! ঘরের টাকা পরের হাতে টুপটুপ ক'রে ঝ'রে পড়ছে, ঘণ্টায় এক পয়সার ওপর, অথচ মিথ্যে, কোন কাজ হবে না। আজ রাধানাথ স্বয়ং গিয়েছিল, সব হাঁকিয়ে দিয়েছে।

চলিতে লাগিলাম। মণীন্দ্র ফিসফিস করিয়া কহিল, রাধানাথ

রেগে আগুন হয়ে গেছে, বলছে, দারোগাবাবুর কাছে নালিশ করবে।

কহিলাম, এর মধ্যে আবার দারোগা পুলিস ঢোকানো কেন?

দুই করতল চিত করিয়া দিয়া মণীন্দ্র কহিল, কি জানি বল। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, এই গোলমালে আমার ভিণ্টে আর ফুন্টির ব্যবস্থাটা ভেস্তে না যায়।

সন্ধ্যার পর দুইজনে বাহির হইলাম। প্রবোধ গাঙ্গুলীর বাড়ির সামনে আসিতেই মণীন্দ্র কহিল, তুমি বাইরে একটু দাঁড়াও ভাই, ভেতরে খবর দিই, যাকে-তাকে ধাঁ ক'রে বাড়িতে ঢোকানো ঠিক নয়।—বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

মিনিট কয়েক পরেই মণীন্দ্র যখন ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার অবস্থা সাংঘাতিক। চোখের তারা দুইটা বনবন করিয়া ঘুরিতেছে, কপালে কোঁচ পড়িয়াছে, স্বাভাবিক চওড়া নাকটা আরও চওডা হইয়া উঠিয়াছে, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে ও সেই নিশ্বাস-বায়ুতে নাসিকা-গহ্বরের চুলগুলি বাত্যাতাড়িত কাশ-ঝোপের মত দুলিতেছে। আমার কাছে আসিয়া, মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত দিয়া বাতাসে ঘুষি মারিয়া কহিল, রাধানাথকে আজ খুন করব।

সভয়ে কহিলাম, কেন?

আমার বোনকে বেইজ্জত করেছে।

ঘাবড়াইয়া গেলাম। সবিস্ময়ে কহিলাম, সে কি?

হ্যাঁ, ফুন্টি বললে।

অতীব বিস্ময়ের স্বরে কহিলাম, ফুন্টির চোখের সামনে? এই বয়সে? দিনের বেলায়? তোমার বোন কিছু—

মণীন্দ্র ধমকাইয়া কহিল, তুমি একটি আস্ত বেকুব। সে বেইজ্জত

নয়, সরোজিনীকে সুদ্ধ দারোগাবাবুর কাছে টেনে নিয়ে গেছে। একটু শান্ত হইয়া কহিল, কি কাণ্ড বল দেখি! বামুনের মেয়ে, বাল-বিধবা, মুসলমানের সামনে নিয়ে যাওয়া! একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই! ওদিকে গাঙুলী বুড়ো মুকিয়ে আছে, একটু খুঁত পেলে হয়, একঘরে ক'রে দেবে। তখন আমার ফুন্টির বিয়ের কি হবে বল দেখি?—বলিয়া আমার মুখের দিকে কটমট করিয়া তাকাইয়া রহিল।

চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। হঠাৎ আমার গায়ে হাত দিয়া মণীন্দ্র কহিল, তুমি ভাই, বাড়ি যাও, আমি একবার থানায় যাই, আমি সঙ্গে থাকলেও নিন্দেটা একটু কম হবে।—বলিয়া এক রকম ছুটিয়াই চলিয়া গেল।

বাড়ি ফিরিলাম। রাধানাথ সত্যই ভাল কাজ করে নাই। দারোগাবাবুটি লোক ভাল, হয়তো কোন একটা সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন। কিন্তু শুনিয়াছি, স্ত্রীলোকের, বিশেষ করিয়া হিন্দু স্ত্রীলোকদের, সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দুর্বলতা আছে। কাজেই সরোজিনীকে স্বচক্ষে দেখিলে কি করিয়া বসিবেন, বলা যায় না।

৬

পরদিন সকালে বৈঠকখানার বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিলাম। দেখিলাম, আমাদের হারাণের বোন পদ্ম হনহন করিয়া আসিতেছে। পদ্ম পাঁচ বছরের ছেলে লইয়া কুড়ি বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিল। স্বামী রামরতন হালদারের অবস্থা মন্দ ছিল না—জমি-জমা পুকুর-বাগান ছিল, দুই-দশ ঘর প্রজা ছিল, কিছু মহাজনি-তেজারতিও ছিল। কিন্তু পদ্ম দ্বিরাগমনে তাহার সংসারে পা দিবার পরেই এমনই এক মামলা ঘরে

ঢুকিল যে, তাহার খোরাক যোগাইবার জন্ম রামরতনকে সমস্ত সম্পত্তি খোয়াইতে হইল, এবং বৎসর-খানেক জ্বর ও কাশিতে ভুগিয়া যখন সে ইহলোক ত্যাগ করিল, তখন দেখা গেল, পদ্ম ও তাহার পুত্রের জন্ম পৈতৃক ভিটাটুকু ও কিঞ্চিৎ দেনা ছাড়া আর কিছুই সে রাখিয়া যাইতে পারে নাই। কাজেই পদ্ম স্বামীর শ্রাদ্ধ কোনমতে সারিয়া মহাজনের হাতে ভিটাটুকু তুলিয়া দিয়া, স-পুত্র ভাই হারাণের বাড়িতে আশ্রয় লইল। এখন পদ্মর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, দেখিতে কালো, বেঁটে ও কাহিল। যৌবনে পদ্মর মুখশ্রী মন্দ ছিল না, দেহে লাবণ্যও কিছু ছিল এবং গ্রামের মেয়ে হওয়ার দরুন তাহার গতিও সর্বত্র অব্যাহত ছিল, তবু তাহার খর-রসনার ভয়ে কেহ কোন দিন তাহার পাশ মাড়াইতে সাহস করে নাই। কাজেই পদ্মর সতীত্ব অদ্যাবধি অক্ষুণ্ণ এবং এইজন্যই গ্রামের মেয়েদের, বিশেষ করিয়া অল্পবয়সী বিধবাদের, সে স্বয়ংসিদ্ধা প্রহরিণী।

পদ্ম আমার কাছে আসিয়া থনথন করিয়া কহিল, গলায় দড়ি দাওগে তোমরা।

কহিলাম, কিসের জন্যে?

কেন! প্রবোধ গাঙুলীর বউ রাধানাথ গাঙুলীর সঙ্গে কাল থানার দারোগাবাবুর কাছে বেড়াতে গেছল, কত গল্প, কত হাসি-তামাশা ক'রে এল, শোন নি?

কে বললে?

দাদা নিজের চোখে দেখেছে, এসবের একটা ব্যবস্থা কর বাপু। না হ'লে গাঁয়ে বাস করা যাবে না। তা ছাড়া হিন্দু হ'লেও কথা ছিল, মুসলমান—মুসলমানের সামনে হিন্দু মেয়ের মুখ দেখানো—ছিঃ, ছি!

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার দাদা কি করছে?

পদ্ম জবাব দিল, দাদা কাল সারারাত্রি ঘুমোয় নি। সোজা ব্যাপার নাকি! বামুনের ঘরের বিধবা বউ! ধ্যাড়াং ধ্যাড়াং ক'রে একটা পরপুরুষের হাত ধ'রে থানায় বেড়াতে যাওয়া! আমরা গাঁয়ের মেয়ে হয়ে কোন দিন ওদিকে পা দিই নি। একটু দম লইয়া পদ্ম কহিল, দাদা সকালে উঠেই দাঁতন চিবোতে চিবোতেই গাঙুলী দাদামশায়ের কাছে গেছে।

মণীন্দ্র ঠিক বলিয়াছিল। সরোজিনীর থানায় যাওয়া লইয়া সামাজিক একটা দলাদলির সৃষ্টি হইবে বোধ হয়। কহিলাম, তুমি কোথায় চললে?

পদ্ম মুরুব্বিয়ানার সহিত কহিল, যাচ্ছি একবার গাঙুলী-পাড়ায়। ব'লে আসি পাড়ায় গিন্নীদের, পুরুষদের দিয়ে একটা ব্যবস্থা করাক, না হ'লে মেয়ে-বউগুলোকে আর ঘরে রাখা যাবে না।

বলিয়া পদ্ম দ্রুতপদে চলিয়া গেল। বৈঠকখানায় ঢুকিতেই দেখি, পত্নী দাঁড়াইয়া আছেন। সংসারের কাজে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকিলেও বাহিরে কোথায় কি হইতেছে, কে কাহাকে কি বলিতেছে, কিছুই তাঁহার চোখ ও কানকে এড়াইতে পারে না। কহিলেন, কি বলছিল পদ্ম?

স্বকর্ণেই তো শুনলে।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া পত্নী কহিলেন, তখন বলেছিলাম না?

কি?

ও মেয়ে একদিন উড়বে। যে মেয়ে বিধবা হয়েও মুখে পাউডার মাখে, গায়ে এসেন্স ঢালে, কুঁচিয়ে কাপড় পরে, সে ঘরে থাকবার নয়।

গৃহিণী এরূপ কোন ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন কি না মনে পড়িল না, তথাপি চুপ করিয়া রহিলাম। গৃহিণী কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে

তাকাইয়া থাকিয়া কহিলেন, দারোগাবাবুর কুঞ্জে কি জন্যে যাওয়া হয়েছিল, শুনি ?

কি করবে বেচারা ? গাঙ্গুলী মশায় প্রজা-খাতকদের আদায় দিতে মানা ক'রে দিয়েছেন।

চোখ দুইটি ডাগর করিয়া গৃহিণী কহিলেন, তাই নাকি ! বুড়ো আবার এসব কখন করলে ? বিছানায় প'ড়ে ছিল যে !

লোক পাঠিয়ে—

হঠাৎ উচ্চকণ্ঠের ডাক শোনা গেল, ভায়া ! আছ নাকি ? মণীন্দ্র চক্রবর্তী আবার জুটিয়াছে ! গৃহিণী মাথায় কাপড় দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গিয়া বোধ করি আড়ি পাতিতে লাগিলেন। মণীন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া ডান হাতটি তুলিয়া নাড়িতে নাড়িতে কহিল, কেল্লা মার্ দিয়া।—বলিয়া একটা চেয়ার টানিয়া আমার কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া কহিল, তোমরা বল, দারোগাবাবু খারাপ লোক—। প্রতিবাদ করিলাম, আমরা আবার কখন বলি ?

বল না ? কে বলছিল যেন, মনে নেই। যাকগে, আমি তো দেখলাম, চমৎকার লোক, মহানুভব ব্যক্তি।

চুপ করিয়া রহিলাম।

কিন্তু ভাগ্যে আমি কাল ছুটে গিয়েছিলাম।

প্রশ্ন করিলাম, কি ব্যবস্থা হ'ল কাল ?

চমৎকার ব্যবস্থা। রাধানাথ একেবারে খতম।

বিস্ময়ের সহিত কহিলাম, মানে ?

দারোগাবাবু বললেন, দু পক্ষে টানাটানি ক'রে দরকার নেই। একজন তৃতীয় পক্ষের হাতে ভার দেওয়াই ভাল।

সকৌতুকে কহিলাম, তৃতীয় পক্ষটি কে ?

কেন, আজিজ সাহেব! পয়সাওলা লোক, তা ছাড়া ওপরওলাদের সঙ্গে খাতির খুব।

তা হ'লে গাঙ্গুলী মশায় আর রাধানাথের বদলে দারোগাবাবু আর আজিজ সাহেব তোমার বোনের কাছে যাতায়াত করবেন, এই তো?

পাগল নাকি! স্বয়ং শর্মা ছাড়া আর কাউকে যেতে হবে না।

কেন? পরামর্শ করতে?

পরামর্শ সব আমার সঙ্গে।—বলিয়া ডান হাত দিয়া নিজের বুকটা চাপড়াইল।

নির্বোধের মত তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। সে উচ্চাঙ্গের হাসি হাসিয়া কহিল, বুঝতে পারছ না? আমিই আদায়-উসুল করব, আজিজ সাহেব ব'লে-ক'য়ে দেবেন, আর স্বয়ং ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট থাকবেন আমার পেছনে, বুঝলে?—বলিয়া চেয়ারটায় হেলান দিয়া পা দুইটা টেবিলের উপর চাপাইয়া দিল। কিছুক্ষণ ঐ ভাবে বসিয়া থাকিয়া আবার পা নামাইয়া সোজা হইয়া বসিয়া কহিল, কিন্তু মাইনেটা বড় কম।

কহিলাম, সে কি হে, বোনের কাছে মাইনে!

মণীন্দ্র ধমক দিয়া কহিল, মাইনে নয়, মাইনে নয়, মাসোহারা। আমার কত ক্ষতি হবে, সেটা দেখতে হবে তো! পনরো টাকায় চলবে না আমার।

বললে না কেন দারোগাবাবুকে?

মণীন্দ্র ইতস্তত করিয়া কহিল, বলতে পারলাম না, পাছে আবার কিছু গোলমাল হয়ে যায়। তা ছাড়া দারোগাবাবুকে বলবার কি দরকার? নিজের বোন, একটু বোঝালেই হবে।

তাই কর। এখনই যাও না তার কাছে।—বলিয়া টেবিলের উপর হইতে একটা বই তুলিয়া লইয়া পড়িবার উপক্রম করিলাম।

মণীন্দ্র কহিল, আরে, সেইজন্যেই তো' তোমার কাছে আসা। আজ একবার সন্ধ্যের সময় গিয়ে—

বাধা দিয়া কহিলাম, না ভাই, আমাকে আর ওর মধ্যে টেনো না। তোমাদের ব্যাপার অনেক গোলমেলে হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আহতকণ্ঠে মণীন্দ্র কহিল, গোলমেলে কি হে! এখনই তো বরং সোজা হয়ে গেছে।

প্রতিবাদ করিয়া কহিলাম, না না, সোজা নয়।

যাবে না তা হ'লে? একবার দেখাও হয়ে যাবে হে, এই সুযোগে।

বিরক্ত হইয়া কহিলাম, দেখা হবার জন্যে ছটফট করছি নাকি?

মুচকি হাসিয়া মণীন্দ্র কহিল, কাল তো ছুটেছিলে!

মণীন্দ্র বিপদ ঘটাইবে দেখিতেছি। গৃহিণী আড়ি পাতিয়া শুনিতেছেন, আর এই সব কথা! তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলাম, রসিকতা রাখ। কাল আমি ছুটেছিলাম, না, তুমি টেনে নিয়ে গিছলে?

হাসিয়া মণীন্দ্র কহিল, সেটা লোক-দেখানো। ইচ্ছে না থাকলে কাউকে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়?

জবাব না দিয়া পড়িতে শুরু করিলাম।

মণীন্দ্র কহিল, বেশ, না যাও তো সরোজিনীকেই এনে হাজির করব। তখন তো আর 'দেখা করব না' বলতে পারবে না।—বলিয়া উঠিয়া লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল। মণীন্দ্রের আজ আনন্দের সীমা নাই। আনন্দ হইবারই কথা। এতবড় একটা সম্পত্তি হাতছাড়া হইতে বসিয়াছিল, আবার পাকে-চক্রে হাতে ফিরিয়া আসিয়াছে। সত্য কথা বলিতে গেলে, হিন্দু বাঙালীর সংসারে নিঃসন্তানা বিত্তবতী বিধবা বোন ও পিসীমা, বিশেষ করিয়া যদি তাহার

আর কোন উত্তরাধিকারী না থাকে, ছোটখাটো জমিদারির চেয়ে ঢের ভাল। জমিদারির নানা হাঙ্গামা আছে, খাজনা দেওয়া ও আদায় করা, তদারক করা, মামলা-মকদ্দমা করা ইত্যাদি। কিন্তু বিধবা বোন ও পিসীমার একটু মন যোগাইয়া চলিতে পারিলে, এবং যাহাতে ধর্মে-কর্মে তাহাদের অটল মতি থাকে, তাহার সুলভ ও সুবিধামত ব্যবস্থা করিতে পারিলে, বিনা আয়ে ও বিনা আয়াসে সংসার স্বচ্ছন্দ-গতিতে চলিতে থাকে। কিন্তু রাধানাথ ও গাঙুলী মশায় কি করিবেন? তাঁহাদের তাল-ঠোকাঠুকিই সার হইল। ইহার পর কি পরস্পরের মাথায় হাত বুলাইয়া জোট পাকাইবেন? কিন্তু স্বয়ং দারোগাবাবু নিজহস্তে যে ভার তৃতীয় স্কন্ধে চড়াইয়া দিয়াছেন, তাহাকে স্কন্ধচ্যুত করিতে তাঁহারা সাহস করিবেন কি?

স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিতেই পত্নী কহিলেন, চণ্ডীমণ্ডপে আজ সব ডাক হয়েছে, গোবিন্দ নাপিত ব'লে গেল।

কহিলাম, কেন?

তোমার সোহাগী বোন সুভদ্রার আজ বিচার হবে।

কথাবার্তার ধরন দেখিয়া চুপ করিয়া গেলাম। গৃহিণী কিছুক্ষণ পর কহিলেন, আর শুনেছ? মুখ তুলিয়া চাহিলাম।

পত্নী কহিল, রাধানাথের বউ জলে ডুবতে গেছল।

তাই নাকি! তারপর?

ছেলেপিলেগুলো কান্নাকাটি করাতে পেরে ওঠে নি।

ছেলেমেয়েরা যে কান্নাকাটি করবে তা তো আগেই জানত।

পত্নী রাগিয়া উঠিয়া কহিলেন, জানলেই বা। তবু ছেলেমেয়ের কান্না দেখলে মরা যায়? আমি পারি?

জবাব না দিয়া কহিলাম, রাধানাথ কি করলে?

বাড়িতে ছিল না, খবর পেয়ে ছুটে এল।

তার পর?

বুঝিয়ে-শুঝিয়ে ধরাধরি ক'রে ঘরে নিয়ে এল।

কারণটা কি শুনেছ?

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে পত্নী কহিলেন, কারণ তোমার ঐ সরোজিনী। পদ্ম ঠাকুরঝি সকালে গিয়ে কি সব ব'লে এসেছে—কাল রাতে হাত-ধরাধরি ক'রে রাধানাথ আর সরোজিনী নাকি দুজনে বেড়াচ্ছিল, আরও সব কত কাণ্ড! লোকে নাকি চোখে দেখেছে।

ঢোক গিলিয়া কহিলেন, বউটা সহজে ফিরতে চায় নি, জনার্দনের ফুল ছুঁয়ে, 'আর কখনও সরোজিনীর পাশ মাড়াব না' ব'লে রাধানাথ প্রতিজ্ঞা করবার পর তবে ফিরেছে।

রাধানাথের বউ নেহাত ভালমানুষ। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। ঢ্যাঙা, কাহিল, একদা গৌরবর্ণা, বর্তমানে তাম্রবর্ণা। প্রায় কুড়িটি সন্তানের জননী, গোটাদশেক ছাড়া বাকিগুলো কেহ ভ্রূণ-অবস্থায়, কেহ ভূমিষ্ঠ হইবার পর, মারা গিয়াছে। প্রসব-কার্য এখনও বন্ধ হয় নাই, বৎসরে একবার করিয়া চলিতেছে। এক পাল ছেলেমেয়ের টানা-ছেঁড়া সামলাইতে ও ভাবী জননীত্বের অনিবার্য দৈহিক ক্লেশ ও গ্লানির ভার বহন করিতে, তাহাকে দিবারাত্র এত ব্যস্ত ও ব্যাপৃত থাকিতে হয় যে, স্বামীর সম্বন্ধে চিন্তা করিবার তাহার অবসর থাকে না। পদ্ম খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া এই নির্জীব প্রাণীটাকেও এমন উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে যে, না মরুক, অন্তত মরিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহার জন্য পদ্মকে বাহবা দিতে হইবে। সরকার বাহাদুর সৈন্য সংগ্রহের জন্য যাহাকে তাহাকে প্রচারক নিযুক্ত না করিয়া যদি পদ্মর মত জনকয়েককে নিযুক্ত করিতেন তো এতদিন সারা ভারতবর্ষের

আবালবৃদ্ধ মরণ-যজ্ঞে ঝাঁপ দিবার জন্য আরব সমুদ্রের তীরে গিয়া ভিড় করিত।

কিন্তু সরোজিনী মুশকিল করিল দেখিতেছি। যাহার স্কন্ধে চাপিতেছে, তাহারই গৃহে দুর্যোগের সৃষ্টি হইতেছে। আমার স্কন্ধে পুরাপুরি চড়িয়া বসিতে পারে নাই, চড়িবার চেষ্টা করিয়াছে মাত্র, তাহাতেই গৃহিণী মধ্যে মধ্যে শর-সন্ধান করিতেছেন।

সন্ধ্যার পর চণ্ডীমণ্ডপে যাইয়া দেখিলাম, প্রায় সকলেই হাজির হইয়াছে। খালি মেঝের উপরেই সকলে বসিয়া, প্রায় প্রত্যেকের সামনে একটি করিয়া লণ্ঠন, এবং প্রত্যেকটি লণ্ঠনের আলো এত কমানো যে, এতগুলি লণ্ঠনের আলোকেও চণ্ডীমণ্ডপটি ভাল করিয়া আলোকিত হইয়া উঠে নাই। দোলু গাঙ্গুলী গ্রামের ব্রাহ্মণদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ, কাশ-রোগজীর্ণ অস্থিচর্মসার দেহ, সকলের ঠিক মধ্যস্থলে খালি গায়ে উবু হইয়া বসিয়া তামাক টানিতেছে ও কাশিতেছে; তাহার পাশেই গাঙ্গুলী মশায় (অনেক দিনের পর বাড়ির বাহির হইয়াছেন); গাঙ্গুলী মশায়ের সামনে বসিয়া হারাণ; চক্রবর্তী-পাড়ারও জনকয়েক আসিয়াছে; গ্রামের জনকয়েক ছোকরাও আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের এক পাশে জটলা করিতেছে। মন্দিরের দাওয়ায় পাড়ার প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা বিধাতারা (অধিকাংশই গ্রামের মেয়ে) আসিয়া বসিয়া আছে, পদ্ম হাত নাড়িয়া নাড়িয়া বোধ হয় সকলকে বিচার্য বিষয়টি বুঝাইয়া দিতেছে। আমাকে দেখিয়াই দোলগোবিন্দ কাশিতে কাশিতে কোনমতে কহিল, এস ভায়া। গাঙ্গুলী মশায় ইঙ্গিতে তাঁহার পাশে বসিতে আহ্বান করিলেন। যথাস্থানে বসিয়া কহিলাম, আলোচনা শেষ হয়ে গেল নাকি? দোলগোবিন্দ গাঙ্গুলী মশায়ের হাতে হুঁকাটি দিয়া কহিল, কই আর হয়েছে! তুমি আস নি, রাধানাথ আসে নি।

কহিলাম, মন্নুদাও তো আসে নি দেখছি।

গাঙ্গুলী মশায় পিছন ফিরিয়া তামাক টানিতেছিলেন, মুখ ফিরাইয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে কহিলেন, হ্যাঃ, ওর দায় পড়েছে আসতে! বড়লোক বোন, এখন গরিবদের বুঝি তোয়াক্কা করে!

কহিলাম, তা হ'লেও একবার ডাকতে পাঠানো উচিত।

দোলু হাঁকিল, গোবিন্দ!

গোবিন্দ কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল, সাড়া দিল, কি বলছেন?

দোলু কহিল, যা দেখি একবার, রাধানাথ আর মন্নু চক্রবর্তীকে ডেকে নিয়ে আয়।

গোবিন্দ হাতের কাছে একটা লণ্ঠন তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিতেই, লণ্ঠনের মালিক লণ্ঠনটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া কহিল, আমারটা না। পার্শ্ববর্তী লণ্ঠনটিকে মুখের ইঙ্গিতে দেখাইয়া কহিল, ঐটে নে।

মুহূর্তের মধ্যে দ্বিতীয় লণ্ঠনের মালিক এবং তাহার দেখাদেখি প্রায় সকলেই নিজ নিজ লণ্ঠন কোলের কাছে টানিয়া লইল। গোবিন্দ আমাদের দিকে তাকাইয়া হতাশভাবে কহিল, কেউ যে লণ্ঠন দিচ্ছেন না, অন্ধকারে যাব কি ক'রে?

দোলগোবিন্দ কহিল, তোর সব বাড়াবাড়ি গোবিন্দ। কোথায় অন্ধকার?

গোবিন্দ কহিল, অন্ধকার বইকি। কি রকম মেঘ করেছে দেখছেন না?

দোলু বিরক্ত হইয়া কহিল, হ'লই বা অন্ধকার, এইটুকু রাস্তা আর যেতে পারবি না?

গোবিন্দ কাহারও বেতনভোগী চাকর নহে। পুরুষানুক্রমে কিছু জমি ভোগ করে এবং পূজা-পার্বণে, বিবাহ শ্রাদ্ধ ও পৈতার সময়ে

কিছু পায়। কাজেই, সে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, অন্ধকারে যেতে পারব না, মনু চক্রবর্তীর বাড়ির কাছে যা সাপের আড্ডা।

আমি ডাকিয়া কহিলাম, আমার লণ্ঠনটা নিয়ে যাও গোবিন্দ। বলিতেই গোবিন্দ আমার লণ্ঠনটা লইয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে রাধানাথ আসিল। বোধ হয় পুকুরে সদ্য-সদ্য পা ধুইয়া আসিয়াছে, সেইজন্য সি ড়ির উপরে অনেকক্ষণ ধরিয়া পা ঝাড়িল। শেষে আসিয়া দোলগোবিন্দের অন্য পাশে বসিল। মণীন্দ্র চক্রবর্তী আসিল না, তাহার নাকি ভারি পেটের অসুখ। শুনিয়া সকলে মুচকিয়া হাসিল।

রাধানাথ কহিল, পেটের অসুখ হবে বইকি। কুকুরের পেটে কি ঘি হজম হয়?

দোলগোবিন্দ বার-কয়েক কাশিয়া কহিল, কি জন্যে যে সকলের ডাক হয়েছে, তা সবাই জানে। মোট কথা, গ্রামে যে রকম অনাচার আরম্ভ হয়েছে, তাতে আর ভদ্রস্থতা—। বলিয়া কাশিতে শুরু করিল এবং বুকের কফ মুখে টানিয়া আনিয়া অক শব্দ করিয়া ঘাড় উঁচু করিতেই সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল; কারণ দোলগোবিন্দ রাত্রে চোখে কম দেখে, কাহার গায়ে ফেলিয়া দিবে ঠিক নাই। মুহূর্তমধ্যে তাহার লক্ষ্যপথ হইতে সকলে সরিয়া বসিল; দোলগোবিন্দ থুঃ শব্দ করিয়া একদলা কফ চণ্ডীমণ্ডপের মেঝের উপরেই ছুঁড়িয়া ফেলিল, এবং বুকে হাত দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে গাঙুলী মশায়কে কহিল, তুমিই বল।

গাঙুলী মশায় কহিলেন, পুরুষানুক্রমে আমাদের এ নিয়ম যে, আমাদের পাড়ার মেয়েরা কেউ কখনও পাড়ার বাইরে পা দেবে না। আজ পর্যন্ত কেউ এ নিয়ম লঙ্ঘন করে নি। প্রবোধ গাঙুলীর বিধবাটি শোনা যাচ্ছে—

হারাণ কহিল, শোনা যাচ্ছে কেন? স্বচক্ষে দেখা।

ঘাড় নাড়িয়া গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, হ্যাঁ, তাই—স্বচক্ষে দেখা, পায়ে হেঁটে থানায় দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা করেছে; এক ঘণ্টা ধ'রে কথাবার্তা কয়েছে।

রাধানাথ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া কহিল, শুধু কথাবার্তা! আরও কত কি—

গাঙ্গুলী মশায়ের একজন অনুগত লোক প্রশ্ন করিল, একা, না, কারও সঙ্গে?

গাঙ্গুলী মশায় গলা ঝাড়িয়া কহিলেন, একা নয়, মানে—মানে—

রাধানাথ গাঙ্গুলী মশায়ের মুখের দিকে তাকাইল।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, মানে, মনু চক্রবর্তী ছিল সঙ্গে। হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, কেউ কি কিছু জানতে পারত? ভাগ্যে আমাদের রাধানাথ দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

গাঙ্গুলী মশায় আসল অপরাধীর নাম চাপিয়া গেলেন কেন? আশাভঙ্গজনিত ক্ষোভ দুই বিরুদ্ধ পক্ষকে যুক্ত করিয়া দিয়াছে বোধ হয়।

পদ্ম এতক্ষণ অদূরে কোমরের দুই পাশে দুই হাত দিয়া দাঁড়াইয়া গাঙ্গুলী মশায়ের বক্তব্য শুনিতেছিল, এক্ষণে আগাইয়া আসিয়া কহিল, এর তোমরা ভাল ক'রে একটা বিহিত কর দাদামশায়। না হ'লে তোমাদের ঘরের মেয়েদের মানমর্যাদা আর থাকবে না, আমি ব'লে দিচ্ছি।—বলিয়া ডান হাতটা নাড়িয়া দিল।

রাধানাথ কড়া গলায় কহিল, বিহিত হচ্ছে, তুই বোস্‌গে দেখি। তোকে আর পুরুষদের মাঝে ফড়ফড়ানি করতে হবে না।

পদ্ম ধারালো কণ্ঠে কহিল, আমি না হয় বসছি, কিন্তু তোমরা কি পুরুষ? মেয়েমানুষের অধম। একটা এক-ফোঁটা ছুঁড়ীকে—

হারাণ হাঁকিয়া কহিল, পদ্ম, চুপ কর্, আর চুপ না করবি তো বাড়ি চ'লে যা।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ শিরোধার্য করিয়া পদ্ম রসনা সংযত করিয়া মেয়েদের মধ্যে গিয়া বসিল।

দোলগোবিন্দ কহিল, তা হ'লে কি ব্যবস্থা করা যাবে, তোমরা ভেবে বল দেখি?

সকলেই ভাবিতে শুরু করিল। ছোকরাদের মধ্যে তিনকড়ি হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া আস্তিন গুটাইতে লাগিল। তিনকড়ি আমার স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র; একটু উত্তেজিত হইলেই আস্তিন গুটানো তাহার অভ্যাস, জামা না পরিলেও শুধু হাত নাড়িয়া আস্তিন গুটাইবার ভঙ্গী করে। তিনকড়ি দুই পা আগাইয়া আসিয়া কহিল, প্রবোধ গাঙ্গুলীর স্ত্রীর অপরাধটা কি?

উত্তর দিল দোলগোবিন্দ, তোমাদের মত চ্যাংড়া ছোঁড়াদের তা বোধগম্যি হবার কথা নয়।

রাধানাথ কহিল, সামাজিক বিষয়ে তোমরা কথা কইতে এস না, দেশোদ্ধার করছ, তাই করগে।

তিনকড়ি ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়া পয়সার অভাবে আর পড়িতে পারে নাই, চাকুরিও পায় নাই। কাজেই বিধবা দিদির স্কন্ধে চড়িয়া গ্রামের উন্নতি-সাধনের জন্য তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামের ছোকরাদের লইয়া দল বাঁধিয়া কখনও রাস্তার ধারের ঝোপ-ঝাপ কাটিতে শুরু করে, কখনও বা পরের পুকুরের পানা পরিষ্কার করিতে গিয়া গণ্ডগোল সৃষ্টি করে; সদ্য-প্রতিষ্ঠিত নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্র সংগ্রহ করিবার জন্য মাঝে মাঝে বাউরী-পাড়ায় হানা দিয়া সারাদিনের হাড়-ভাঙা পরিশ্রমে ক্লান্ত ও হাঁড়িয়া-সেবনে মত্ত লোকগুলাকে টানা-হেঁচড়া

করিয়া উত্যক্ত করে; লোকের বিপদে আপদে সাহায্য করিবার জন্য ছুটাছুটি করে; জাতিনির্বিশেষে রোগীর সেবা করে ও রোগী মরিলে তাহার শব কাঁধে করিয়া শ্মশানে লইয়া গিয়া সৎকারের ব্যবস্থা করে।

তিনকড়ি কহিল, সব বিষয়ই আমাদের দেখতে হবে। আপনারা যা ইচ্ছে তাই করবেন, তা আমরা সহ্য করব না।—বলিয়া বার দুই আস্তিন গুটাইল।

দোলগোবিন্দ গাঙ্গুলী মশায়কে কহিল, শুনছ ভায়া? আমরা যা ইচ্ছে তাই করছি! তিনকড়ির উদ্দেশ্যে কহিল, ভদ্রঘরের বউ হয়ে থানায় যাওয়া তোমাদের মতে হয়তো খুব ভাল কাজ। দু পাতা ইংরিজী প'ড়ে তোমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি ওরকম হতে পারে, কিন্তু আমরা কজন যতদিন বেচে আছি—। হারাণকে ধাক্কা দিয়া কহিল, বল না।—বলিয়া কাশিতে শুরু করিল। হারাণ চুপ করিয়া রহিল। দোল-গোবিন্দের পো ধরিবার মত নগণ্য সে নয়, সে যাহা বলিবে স্বাধীনভাবেই বলিবে।

তিনকড়ি কহিল, তা উনি কি করবেন? আপনারা, যাঁরা সমাজের মাথা, তাঁরা বিরুদ্ধতা করলে তাঁকে বাইরের লোকের সাহায্য নিতেই হবে।

গাঙ্গুলী মশায় ও হারাণ একযোগে কহিল, মানে?

তিনকড়ি বেপরোয়াভাবে কহিল, মানে আপনারাই জানেন।

হারাণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া শ্লেষের সহিত কহিল, বামুনের বিধবা হয়ে যদি থানায় যাওয়া দোষ না হয় তো তুমিই তোমার বোনকে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে এস হে।

তিনকড়ি রাগে আগুন হইয়া কয়েক পা আগাইয়া আসিয়া আস্তিন গুটাইতে গুটাইতে কহিল, মুখ সামলে কথা বলবেন বলছি।

হারাণও আগাইয়া গিয়া কহিল, ভারি যে তেজ দেখছি! বিধবা বোনের পয়সায় খেয়ে ভারি তেল হয়েছে, না? চীৎকার করিয়া কহিল, হারামজাদা! চ'লে আয় দেখি একবার!—বলিয়া কোমরের কাপড় সাঁটিতে লাগিল। কর কি? কর কি?—বলিতে বলিতে গাঙ্গুলী মশায় দুই প্রতিপক্ষের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া দুই বাহু প্রসারিত করিলেন। ওদিকে মেয়েদের দল হইতে লাফাইয়া সামনে আগাইয়া আসিয়া পদ্ম চীৎকার করিয়া উঠিল, আ মর্! পোড়ামুখোর বাড় দেখ! আমার দাদার গায়ে হাত দিতে যাওয়া! ঐ হাতে যে কুষ্ঠ হবে রে হারামজাদা। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি তীক্ষ্ণ রমণীকণ্ঠ শোনা গেল, মুখ সামলে থাক পদ্মদিদি। ভাল হবে না বলছি। এবং মুহূর্তমধ্যে কণ্ঠের মালিক—আর একটি বিধবা, লাফাইয়া আসিয়া পদ্মর মুখোমুখি দাঁড়াইল। বয়স ত্রিশের বেশি, তামাটে রঙ, মাথার চুল পুরুষ-মানুষের মত করিয়া ছাঁটা, মুখের গঠনও অনেকটা পুরুষমানুষের মত। বিধবাটি তিনকড়ির দিদি, নাম গোবিন্দমোহিনী।

পদ্ম তিড়িং করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, আ মর্ ছুঁড়ী! কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে এসেছে ঐ ভাইয়ের জন্যে! লজ্জা করে না?

গোবিন্দ কোমরের দুই পাশে দুই হাত রাখিয়া সামনে ঝুঁকিয়া, মুখ নাড়িয়া কহিল, তোর লজ্জা করে না?

বোমার মত ফাটিয়া গিয়া পদ্ম চীৎকার করিয়া কহিল, চুপ ক'রে থাক্ বলছি। আমাকে 'তোর' বলা! হরু চক্রবর্তীর পয়সায় ভারি বাড় হয়েছে তোর। গোবিন্দ যৌবনে হরু চক্রবর্তীর বাড়িতে রাঁধুনীর কাজ করিত। হরু চক্রবর্তী বিপত্নীক ছিল, মেয়ের বয়সী গোবিন্দকে স্নেহের চক্ষেও দেখিত। কাজেই গ্রামের লোক তাহার ও গোবিন্দের মধ্যে কুৎসিত সম্পর্কের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া লইয়া নানা কথা প্রচার

করিত। এখন অবশ্য হরু ইহলোকে নাই, গোবিন্দও আর চাকুরি করে না, তথাপি পদ্ম মেয়েমানুষ হইয়া আর একজন মেয়েমানুষকে অপমান করিবার সুযোগ ছাড়িবে কেন? গোবিন্দও ছাড়িল না; সেও ডান হাত নাড়িয়া পদ্মর পর্দায় গলা উঠাইয়া কহিল, চাকরি ক'রে পয়সা নিয়েছি, তাতে আর লজ্জা কি লো! তোর মত ভাই-ভাজের লাথি-ঝাঁটা তো আর খাই নি।—বলিয়া পদ্মর ঠিক মুখের সামনে হাতটা নাড়িয়া দিল। পদ্ম গর্জন করিয়া উঠিল, কি? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন!—বলিয়া কোমরে আঁচলটা বাঁধিতে লাগিল, গোবিন্দও কোমর বাঁধিতে বাঁধিতে বলিতে লাগিল, বেশ তো। আয় না, তোর কটাসের মত চোখ দুটো নখ দিয়ে ছিঁড়ে বার ক'রে দিই।

দোলগোবিন্দ হাঁক দিয়া কহিল, ও সদু! সামলা না ওদের। তোরা সব কাজেই বড় গোলমাল করিস!

উদ্দিষ্টা বিধবাটি উঠিয়া আসিল; বয়স ষাটের কাছাকাছি, ইহারও চুলগুলি পুরুষমানুষের মত করিয়া ছাঁটা। আসিয়া ধমকাইয়া কহিল, কি হচ্ছে তোদের? পদ্ম, চ'লে আয়। গোবিন্দ, বোস্‌গে যা।—বলিয়া বিধবাটি ওস্তাদ বেদেনীর মত ক্রুদ্ধা সর্পিনী দুইটিকে হুড়পি-গত করিল।

এদিকে হারাণ, তিনকড়ি ও তাহাদের মধ্যবর্তী গাঙুলী মশায় এতক্ষণ পূর্ববৎ পোজে দাঁড়াইয়া ছিল। মহিলা-পক্ষ শান্ত হইতেই তাহারা শুরু করিয়া দিল। হারাণ হুঙ্কার ছাড়িয়া কহিল, ছেড়ে দিন, ছোঁড়ার তেলটা একটু নিংড়ে বার ক'রে দিই।

তিনকড়ি ঘুষি বাগাইয়া রোষরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, বীস্ট! স্কাউণ্ড্রেল!

হারাণ হাঁক দিয়া কহিল, খবরদার, ইংরিজী বলবি না বলছি, মেরে ছাতু ক'রে দোব।

উঠিয়া কাছে গিয়া কহিলাম, হারাণ, বোসগে যাও, বুড়ো বয়সে যথেষ্ট কেলেঙ্কারি করেছ।

হারাণকে 'বুড়ো' বলিলে বেসামাল হইয়া যায়, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কিনা। সে এক মুহূর্তে নিবিয়া গিয়া কহিল, আমার কি দোষ? এক পুঁটকে ছোঁড়া যা-তা বলবে, তাই সহ্য করতে হবে? কহিলাম, ছেলে-মানুষ ছেলেমানুষি করবে বইকি। তা ব'লে বুড়োমানুষের খোকাগিরি সাজে না। হারাণ নেতাইয়া পড়িয়া কহিল, বাঃ রে! শুধু আমারই দোষ? আমিই বুড়ো? ও বুঝি খোকা?

তোমার তুলনায় তো বটে।—বলিয়া তাহাকে বসাইয়া দিয়া তিনকড়িকে কহিলাম, তোমার ব্যবহারের জন্য দুঃখিত তিনু; দেশের উন্নতি করবার আগে তোমার নিজের চরিত্রের উন্নতি করা উচিত। তিনকড়ি লজ্জিত মুখে আস্তিন ঠিক করিতে লাগিল। আমি কহিতে লাগিলাম, তোমরা দেশের পঙ্কোদ্ধার করতে চাও, আর নিজেদের মনের মধ্যে এত পাঁক! বিনয় নেই, শ্রদ্ধা নেই, ধৈর্য নেই, তোমরা করবে দেশের কাজ! ওসব ছেড়ে দিয়ে যাত্রার দল করগে যাও।

দোলগোবিন্দ বলিয়া উঠিল, বলেছিলাম অনেক দিন, ভাল কথা শুনবে কেন? আজকালকার ছেলে যে!

তিনু গম্ভীর মুখে কহিল, মা-বোনকে গালাগালি করলে রাগ হওয়াই স্বাভাবিক। তবু এই ধৈর্যচ্যুতির জন্যে আমি সত্যই দুঃখিত। যে দেশের অধিকাংশ লোক কুকুর-বেরালেরও অধম, সেখানে আমাদের (মানে দেশ-সেবকদের) অপমানই তো পাওনা।

হারাণ হাঁকিয়া উঠিল, কুকুর-বেরাল বলিস না বলছি তিনে। ভাল হবে না।

তিনু ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কহিল, নমস্কার। আমরা চ'লে যাচ্ছি।—বলিয়া দলবল লইয়া চলিয়া গেল।

সভায় স্থির হইল, সরোজিনী ও মণীন্দ্রকে সমাজচ্যুত করা হইল, তবে তাহারা যদি প্রায়শ্চিত্ত করে এবং দারোগাবাবুর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে, তবেই তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া পুনরায় সমাজে গ্রহণ করা হইবে। সভার সিদ্ধান্ত মণীন্দ্রকে জানাইবার ভার হারাণের উপর ও সরোজিনীকে জানাইবার ভার পদ্মর উপর পড়িল।

বাড়ি ফিরিতেই পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হ'ল গো? গম্ভীর-ভাবে কহিলাম, সরোজিনীর ফাঁসি, আর মনু চক্রবর্তীর দ্বীপান্তর।

ভ্রূ কুঁচকাইয়া পত্নী কহিলেন, তার মানে?

মানে, দুজনকেই একঘরে করা হ'ল, ধোপা নাপিত বন্ধ। তবে সরোজিনী যদি ওর জমি-জায়গা গাঙুলী মশায়কে আর নগদ টাকা-কড়ি রাধানাথকে সব দিয়ে দেয় তো ওদের দুজনকেই আবার সমাজে নেওয়া হবে।

পত্নী গালে হাত দিয়া কহিলেন, ওমা! কি কাণ্ড! মুখ ফুটে বললে এই সব?

মুখ ফুটে ঠিক নয়, তবে—

গৃহিণী তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, রাধানাথের শাস্তি হ'ল না? ওই তো সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছল বলছিলে।

ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, গেছল তো। তবে রাধানাথ সে কথা অস্বীকার করেছে। তা ছাড়া গাঙুলী মশায়ের সঙ্গে ওর ভাব হয়ে গেছে কিনা—

গৃহিণী সবিস্ময়ে কহিলেন, তাই নাকি!

৭

স্কুল হইতে ফিরিয়া খাইবার সময়ে পত্নী কহিলেন, আজ আবার এক মজা হয়েছে।

সপ্রশ্ন মুখে তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই কহিলেন, তোমাদের পত্র-দূতী সরোজিনীকে খবর দিতে গিয়েছিল।

কহিলাম, বেশ তো। সেই রকমই তো কথা ছিল।

আমার কথায় কান না দিয়া পত্নী কহিলেন, সঙ্গে গিয়েছিল বীরু আচায্যির মেয়ে মিণ্টা।

বীরু আচায্যির ভাল নাম বীরেন্দ্র আচার্য, রাধানাথের ভগ্নীপতি, অবস্থা আগে বেশ ভাল ছিল, মামলা-মকদ্দমার ফলে এখন খুব খারাপ হইয়াছে। মিণ্টা তাহার বড় মেয়ে। বীরু ভাল ঘর-বর দেখিয়া মিণ্টার বিবাহ দিয়াছিল। দ্বিরাগমনে শ্বশুর-বাড়ি যাওয়ার মাস ছয় পরে মিণ্টা বিধবা হইল। বীরু গহনা কাপড় সমেত মেয়েকে আনিয়া আর শ্বশুর-বাড়ি পাঠায় নাই। বীরু আচায্যি প্রবোধ গাঙুলীর প্রতিবেশী।

কহিলাম, পদ্ম আবার মিণ্টাকে নিয়ে গেল কেন?

সরোজিনীর বাড়িতে মিণ্টাদের খুব যাওয়া-আসা যে! সরোজিনীর সঙ্গে মিণ্টার নাকি খুব ভাব, পদ্ম বলছিল। তারপর শোন, মিণ্টাকে নিয়ে তো গেল—

কখন?

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে। গিয়ে দেখলে, নীচের তলায় সরোজিনীর শাশুড়ী মাদুর পেতে শুয়ে আছে, আর কাছে ব'সে মনু

চক্রবর্তীর একপাল ছেলেমেয়ে খেলা করছে। তাদের জিজ্ঞাসা ক'রে জানলে, ওরা দোতলায়।

ওরা কে কে ?

সরোজিনী আর ফুটি। ফুটি তো ওখানেই থাকে, রান্না-বান্না কাজ-কর্ম করে। তারপর শোন, দোতলায় গিয়ে দেখলে, ঘরের মধ্যে পালঙের ওপর ধবধবে বিছানায় তাকিয়া হেলান দিয়ে সরোজিনী বই প'ড়ছে, আর মেঝেতে শতরঞ্চির ওপর ব'সে ফুটি পড়ছে।

সরোজিনী ফুটিকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে বুঝি ?

পদ্ম তো তাই বললে। তারপর শোন, সেদিন তো সরোজিনী খুব সভ্যা ভব্যা বিধবাটি সেজে এসেছিল, বাড়িতে কি প'রে থাকে জান ? চওড়া কালাপাড় ধোপদস্ত ফরাসডাঙার শাড়ি, শেমিজ, ব্লাউজ। গায়ে এক-গা গয়না, সিঁথিতে সিঁদুরই শুধু নেই।

বলিতে ইচ্ছা হইল, সরোজিনী তো শুধু 'স্বামীলাভে'র জন্য প্রবোধকে বিবাহ করে নাই যে, স্বামী হারাইয়া, সব সজ্জা ও আভরণ বর্জন করিয়া যৌবনে যোগিনী সাজিবে ! কিন্তু চুপ করিয়া রহিলাম।

স্ত্রী কহিলেন, মিণ্টাকে দেখে উঠে ব'সে সরোজিনী বললে, এস ভাই। আজ এত দেরি হ'ল যে ? মানে, মিণ্টা যে রোজ ওর কাছে যায়, পদ্মকে তা জানিয়ে দিলে আর কি। পদ্ম ওদের আসা-যাওয়া বন্ধ করবার জন্যে গাঙ্গুলী-বুড়োকে বলবে বলছে।

বাধা দিয়া কহিলাম, বলুকগে, তারপর কি হ'ল বল ?

সরোজিনী পদ্মর দিকে তাকিয়ে বললে, ওটি কে ভাই ? মিণ্টা আর ফুটি একসঙ্গে ব'লে উঠল, আমাদের পদ্মপিসী। সরোজিনী দুই চোখ ডাগর ক'রে বললে, বামুন ? ওরা দুজনেই ঘাড় নাড়লে, নেড়ে জানালে, তাই বটে। সরোজিনী গালে হাত দিয়ে বললে, আমি

ভেবেছিলাম, ডোম। বামুনের বাড়ির মেয়ের ঐ চেহারা! রাগে পদ্মর কালো মুখ আরও কালো হয়ে উঠল।—

বাধা দিয়া কহিলাম, ওটা জানতে পারলে কি ক'রে?

পত্নী হাসিয়া কহিলেন, পদ্ম-ঠাকুরঝি যাবার পরেই মিণ্টা আর ফুন্টি এসেছিল যে। পদ্ম যা বাদ দিয়েছিল, ওরা তা ব'লে গেল। তারপর শোন, আর মুখটা হ'ল যেন ভীমরুলের চাক, রাস্তায় ঘাটে হ'লে ও বোধ হয় সরোজিনীকে আঁচড়ে কামড়ে দিত। নেহাত বাড়ির ভেতর তাই। তবে বলা মুখ তো, চুপ ক'রে থাকতে পারলে না, বললে, দেখ বউ, রূপ-যৌবন সবাকার থাকে না, থাকলেও চিরকাল থাকে না, ওর গরব অত ক'রো না। সরোজিনী হেসে উঠে বললে, বাঃ রে! যতদিন থাকবে, ততদিন গরব করব না? শোন ভাই মিণ্টা, ওর কথা। পদ্ম গর্জে উঠে বললে, দেখ প্রবোধ গাঙুলীর বউ, আমি তোমার বাড়িতে পাত পাততেও আসি নি, রাঁধুনীগিরি করতেও আসি নি, বড়লোক আছ, বাড়িতেই থাক, মুখ সামলে কথা বলবে বলছি। সরোজিনী ফুন্টিকে বললে, তুই ও ঘরে যা ফুন্টি। গেলে পর মিণ্টাকে বললে, দেখ ভাই, পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের কাণ্ড! কি বললাম আমি—? পদ্ম বাধা দিয়ে বললে, তুমিই বা কি শহরের মেয়ে শুনি? ওসব চাল আর আমাদের কাছে মেরো না, কোন্ বিত্তান্ত আমাদের না-জানা? সরোজিনী গম্ভীর হয়ে বললে, যার-তার সঙ্গে ঝগড়া করতে আমার ঘেন্না করে, কি দরকার আপনার বলুন দেখি? পদ্ম বললে, তোমার আচার-ব্যাভারের জন্যে গাঁয়ের লোক তোমাকে পতিত করেছে। সরোজিনী বললে, বেশ তো, তাতে আমার কি ব'য়ে যাবে? গাঁয়ের সঙ্গে তো আমার ভারি সম্পর্ক!

পদ্ম বললে, ক্রিয়াকর্ম্মে নেমন্তন্ন হবে না।

সরোজিনী বললে, পরের বাড়িতে শাক-চচ্চড়ি আর কলায়ের ডাল খাবার জন্যে তো আপনাদের মত হা-পিত্যেশ ক'রে ব'সে আছি!

পদ্ম বললে, ধোপা-নাপিত বন্ধ।

সরোজিনী বললে, ধোপা! একটা আলমারি দেখিয়ে বললে, দেখতে পাচ্ছেন, এক আলমারি ঠাসা কাপড়, যতদিন এ গাঁয়ে থাকব, কাপড় ধোয়াবার দরকার হবে না। আর নাপিত! আপনার মত তো গোঁফ-দাড়ি আমার নেই যে, রোজ নাপিত দরকার হবে। পদ্মর মুখে তো কি রকম লোম দেখেছ? কাজেই সে আরও রেগে উঠে বললে, মড়া মরলে কেউ পোড়াতে আসবে না।

সরোজিনী বললে, এই রূপ-যৌবন যতদিন আছে, ততদিন মরবার ইচ্ছে নেই; তবু যদি মরি, তা হ'লে কে পোড়াতে আসবে, কে আসবে না, দেখতে আসব না। আর ভগবানের ইচ্ছেয় যদি শাশুড়ী মরেন তো দারোগাবাবু ব্যবস্থা করবেন। জানেন তো কত খাতির আমার সঙ্গে? পদ্ম মুখ কুঁচকে বললে, জানি বইকি। দারোগাবাবু যে তোমার—

সরোজিনী বললে, ভালবাসার লোক! এই তো? বেশ, তাই। কিন্তু এইজন্যেই দারোগাবাবু যদি ডাক দেন তো আপনার বাবা, ভাই, এমন কি নাগররা পর্যন্ত ছুটে আসবে। পদ্ম চীৎকার ক'রে বললে, কি বললি? আমার নাগর? হারামজাদীর যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! সরোজিনী মিণ্টার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, হ্যাঁ ভাই মিণ্টা, আমি অন্যায় বলছি? ঐ বয়েস, অত রূপ, ওঁর নাগর থাকবে না তো থাকবে আমাদের? পদ্মকে বললে, তোমার শুধু এক-আধটি নয়, গাঁসুদ্ধু লোক। পদ্ম কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে রইল। এমন ক'রে কেউ কখনও ওকে মুখের সামনে অপমান করে নি। তারপর হঠাৎ ব'লে উঠল, তুই মর্। মোছলমানের হাতে জাত দিয়েছিস, তোর লজ্জা করে না, গলায় দড়ি দিগে যা।

মিণ্টাকে ডেকে বললে, মিণ্টা, চ'লে আয়, চ'লে আয় বলছি। সরোজিনী মিণ্টাকে জড়িয়ে ধ'রে বললে. বাঃ রে! ও কেন যাবে? না ভাই মিণ্টা, যেও না, দেখছ না কি রকম ক্ষেপেছে, কামড়ে দেবে এখনই। পদ্ম ছুটে নীচে নেমে গেল।

সরোজিনী হেঁকে বললে, রুন্টি, সঙ্গে যা, দেখিস, কিছু নিয়ে না পালায়।

পদ্ম শুনতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠে বললে. তুই মর্। মরণ নেই তোর? যম তোকে ভুলেছে কেন লো হারামজাদী? তারপর নীচে যেখানে সরোজিনীর শাশুড়ী ঘুমোচ্ছিল, সেখানে গিয়ে পদ্ম চীৎকার ক'রে বললে, চোখ বুজে যে নিশ্চিন্তি প'ড়ে আছ, ওদিকে হতভাগী যে কুলে কালি দিচ্ছে! জাত-জন্ম যে গেল তোমার! সে বেচারী ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল।

সরোজিনী দোতলা থেকে বললে, ওঁকে আবার বিরক্ত করছ কেন? চ'লে যাও।

পদ্ম গালাগালি দিতে দিতে বেরিয়ে এল।

কহিলাম, তারপর?

তারপর আর কি? পদ্ম সারা পাড়া নেচে বেড়াচ্ছে আর সরোজিনীর পিণ্ডি চটকাচ্ছে। মিণ্টাকেও বাদ দেয় নি। মিণ্টার বাবাকেও বিপদে পড়তে হবে, দেখো।

সন্ধ্যার সময় গাঙুলী মশায়ের বাড়ি গিয়া দেখিলাম, হারাণ ও গাঙুলী মশায় বৈঠকখানায় বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছেন। আমি যাইতেই গাঙুলী মশায় কহিলেন, এস ভায়া। বসিতেই কহিলেন, সব শুনেছ?

অজ্ঞতার ভান করিয়া কহিলাম, কি?

পদ্মকে প্রবোধ গাঙুলীর পরিবার অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে।

সবিস্ময়ে কহিলাম, তাই নাকি ?

হারাণ বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিল, হ্যাঁ, তাই। আর মন্টু চক্রবর্তী অপমান করেছে আমাকে, আমরা তো ইচ্ছে ক'রে যাই নি, সমাজের প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিলাম।

গাঙুলী মশায় ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, সত্যিই তো। এ অপমান তোমাদের নয়, সমস্ত সমাজের অপমান। রাগত স্বরে কহিলেন, কিন্তু কিছু ভেবো না তোমরা, এই বুড়ো যদি বেঁচে থাকে আর রাধানাথ বদ চাল না দেয় তো দেখো, কি করি আমি, ঐ মন্টু চক্রবর্তী আর তার বোনকে দিয়ে যদি তোমাদের ভাই-বোনের পায়ে না ধরাই তো আমার নাম মিথ্যে।

হারাণ কহিল, মন্টু চক্রবর্তী বললে, দারোগাবাবুকে ব'লে আমাদের দেখে নেবে।

গাঙুলী মশায় আমার দিকে কটমট করিয়া তাকাইয়া বলিলেন, শুনছ কথা ? দারোগাবাবু যেন ওর হয়ে কিনা।

হারাণ কহিল, বলেছি আমি। মুখের ওপর ব'লে দিয়েছি, দারোগাবাবু তোর ভগ্নীপতি যে, তোর ভাবনা কি ?

গাঙুলী মশায় পুলকিত হইয়া কহিলেন, বেশ করেছ। তা কি বললে ?

হারাণ কহিল, একেবারে মুখ্যু কিনা। ভাল কথা বোঝবার সাধ্যি আছে ? উল্টে গালাগালি দিতে লাগল।

আমি কহিলাম, দারোগাবাবুকে নিয়ে যে আপনারা টানাটানি করছেন, তাতে কিছু ক্ষতি হবে না তো ?

গাঙুলী মশায় ভ্রূ কুঁচকাইয়া কহিলেন, ক্ষতি কিসের ? দারোগাবাবুর

সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? সার্কল-অফিসার যদি হাতে থাকে তো দারোগা আমার এইটি করবে।—বলিয়া দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আমার নাকের সম্মুখে বাড়াইয়া দিলেন। তারপর স্বাভাবিক ভাব ধারণ করিয়া কহিলেন, তোমাদের কোন ভয় নেই। বুড়ো সাত চাল ভেবে তবে কাজ করে। সার্কল-অফিসার লোক ভাল; দারোগার সঙ্গে বেশ ভাব নেই। তা ছাড়া দারোগাবাবু যে গাঁয়ে সব বিষয়ে মোড়লি করে, এটা পছন্দ করেন না। ওঁকে দিয়েই সব শায়েস্তা করব আমি।

একাই বাড়ি ফিরিলাম। হারাণ থাকিয়া গেল। হারাণের সঙ্গে গাঙ্গুলী মশায়ের কি গোপন পরামর্শ আছে। আমাকেও গাঙ্গুলী মশায় সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন দেখিতেছি। রাস্তায় মনু চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা হইল। এই কয়দিনেই মনুর হাল-চাল বদলাইয়া গিয়াছে, গায়ে হাত-কাটা লংক্লথের ফতুয়া, পায়ে বাটা কোম্পানির ক্যাম্বিসের জুতা, হাতে ঝকঝকে নূতন লণ্ঠন। আমাকে দেখিয়া কহিল, কি ভায়া, বুড়োর আড্ডাতে গিয়েছিলে বুঝি? কি পরামর্শ হ'ল আজ?

জবাব না দিয়া কহিলাম, মনুদাদা যে পুরোদস্তুর ম্যানেজার ব'নে গেছ দেখছি।

মনু একগাল হাসিয়া কহিল, সত্যি। নিজের ফতুয়া ও জুতার দিকে চাহিয়া কহিল, আনকোরা নতুন, পরশু কিনে নিয়ে এসেছি। বেশ দেখাচ্ছে, না?

ঘাড় নাড়িয়া তাহাকে সমর্থন করিলাম। মনু কহিল, সরোজ বললে যে, হাকিম-হকিমের কাছে যেতে হবে, ন্যাংটা ফকির সেজে থাকা ভাল নয়। খুব বুদ্ধি!

কহিলাম, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

এক মুহূর্তে গরম হইয়া উঠিয়া মণীন্দ্র কহিল, যাচ্ছি দারোগাবাবুর

কাছে, ওই হেরো হারামজাদা'র আর ওর শাঁকচুন্নী বোনটার শ্রাদ্ধ বাঁটতে। সাহস দেখ দেখি! আমাকে অপমান! কাঁটাবাদের মুসলমানরা, যারা কাউকে তোয়াক্কা করে না, তারা পর্যন্ত আজকাল আমাকে খাতির করছে। মুসলমান দিয়ে কানে ধরিয়ে ওকে ওঠ্-বোস্ করাব আমি, তুমি দেখে নিও। আর ওই ডাইনীটাকে দিয়ে সরোজের পা চাটাব।—বলিয়া লণ্ঠনসুদ্ধ হাতটা নাড়িতে লাগিল। তারপর আমাকে কহিল, আর তোমাকেও সাবধান ক'রে দিচ্ছি, যেমন ভালমানুষটি আছ, তেমনিটিই থেকো, কোন দলে যোগ দিও না, তা হ'লে আখেরে বিপদে প'ড়ে যাবে।—বলিয়া গজগজ করিয়া চলিয়া গেল।

৮

দুই পক্ষেই প্যাচ-কষাকষি চলিতে লাগিল। গাঙুলী মশায় একদিন গাঁসুদ্ধ সকলকে খাওয়াইলেন এবং সেই উপলক্ষ্যে সরোজিনী ও মণীন্দ্রকে বাদ দিয়া, তাহাদের সমাজ-চ্যুতি ব্যাপারটাকে সকলের কাছে চালু করিয়া দিলেন। সরোজিনীর শাশুড়ীকে হাত করিয়া তাহাকে দিয়া সরোজিনীর নামে খোরপোষের মামলা রুজু করানো চলিতে পারে কি না, সেই সম্বন্ধে শহরের উকিলদের সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য রাধানাথ জেলায় আনাগোনা করিতে লাগিল। প্রবোধ গাঙুলীর ভাগিনেয় বর্ধমান জেলার কোন্ এক গ্রামে অনেক দিন ধরিয়া নানা প্রকার রোগে ভুগিতেছিল, অদ্যাবধি বাঁচিয়া থাকিলে তাহাকে এবং প্রবোধের মামাকে আনিবার ব্যবস্থা করা হইল। ওদিকে মণীন্দ্র, আজিজ সাহেব ও দারোগাবাবুর সঙ্গে ঘন ঘন জেলায় গিয়া হাকিমদের সঙ্গে দেখা করিয়া কি যেন সব করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

একদিন সকালে তিনকড়ি আসিয়া নমস্কার করিয়া কহিল, আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এসেছি।

আপ্যায়ন করিয়া বসাইয়া কহিলাম, কি ব্যাপার ?

আমরা গাঁয়ে একটা লাইব্রেরি করব ভাবছি।

বেশ কথা। কিন্তু টাকা ?

তিনু মৃদুহাস্যসহকারে কহিল, টাকার যোগাড় হয়েছে। শ্রীমতী সরোজিনী দেবী দুশো টাকা দেবেন আপাতত, পরে দরকার হ'লে আরও দেবেন।

সবিস্ময়ে কহিলাম, তাই নাকি !

ঘাড় নাড়িয়া তিনু কহিল, আজ্ঞে হঁ্যা, তা ছাড়া ওঁর বাড়িতে দুটো পুরনো আলমারি আছে, সেইগুলো দিয়ে ওঁর বৈঠকখানায় কাজ আরম্ভ হবে, তারপর নতুন আলমারি করিয়ে দেবেন, এমন কি পরে লাইব্রেরির জন্যে একটা ঘরও তৈরি করিয়ে দেবেন।

বুঝিলাম, সরোজিনী গ্রামের যুবকদের হাত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

তিনু কহিল, উনি বললেন, কি কি বই কিনতে হবে সে সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে।

কহিলাম, এ সম্বন্ধে আবার পরামর্শ কি করতে হবে ? বাংলা দেশের বড় বড় লেখকদের নাম তো তোমরা জান, তাঁদেরই বই আনিও।

তিনু বলিল, তা হবে না, একদিন আপনাকে উনি নিয়ে যেতে বলেছেন। আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে উনি কথাবার্তা বলবেন, আর টাকাও আপনার হাতে দেবেন।

সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া কহিলাম, আরে না না, আমাকে আবার এ ব্যাপারে টানা কেন ? গ্রামের আবহাওয়া জান তো ?

তিনু অনুযোগের স্বরে কহিল, এসব দলাদলি-ব্যাপারে আপনার থাকা উচিত নয়। আর ওঁর বিশ্বাস, আপনি এসবের বাইরে।

চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু কেন জানি না, মনে ভারি আনন্দ হইল। এই মেয়েটির সম্বন্ধে নানা রকমের খবর শুনিয়া ইহার বিরুদ্ধে মনের মধ্যে যে বিরক্তি ও বিরোধের ভাব এ কয়দিন ধরিয়া জমিয়া উঠিয়াছিল, তাহা এক মুহূর্তে পরিষ্কার হইয়া গেল। আপনারা বলিবেন, হইবে না কেন? রূপসী যুবতী যে! কেহ যদি বলে, পদ্ম তোমাকে খুব সাধুপুরুষ বলিয়া তারিফ করিয়াছে, মনের মধ্যে শিহরণ জাগিবে কি? যতই সাধুগিরি কর আর মাস্টারি ফলাও, সরোজিনীর প্রতি তোমার মনে দুর্বলতা জন্মিয়াছে। উত্তরে আমি বলিব, চুপ করুন, ওসব কথা বলিবেন না। সরোজিনী আমার বোন। তথাপি কোন কথা বলিতে হইলে, দয়া করিয়া কানে কানে বলুন। কারণ দেওয়ালেরও কান আছে। তাহা শুনিয়া আপনারা মুখ টিপিয়া হাসিবেন, কেহ কেহ হয়তো রাগিয়া চোখ পাকাইবেন।

তিনু কহিল, আপনাকে ছাড়া কাউকে বিশ্বাস ক'রে টাকা উনি দেবেন না। তা ছাড়া সব বন্দোবস্ত আপনাকেই করতে হবে। ওঁর ইচ্ছে, জেলা থেকে এস. ডি. ও. সাহেবকে এনে লাইব্রেরির উদ্বোধন করানো। তারও ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে।

এ আর এক চাল। শুধু তরুণ-শক্তি নয়, রাজ-শক্তিকেও সরোজিনী আয়ত্ত করিতে চাহিতেছে।

তিনু কহিল, বেশি দেরি ক'রে লাভ নেই। গ্রামের লোক কিছু জানতে পারবার আগেই সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলতে হবে। আজ রাত্রিতে তা হ'লে আপনাকে আমি নিয়ে যাব।—বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই কহিলাম, তুমি কি ওঁর সঙ্গে নিজে দেখা করেছিলে?

তিনু কহিল, আজ্ঞে না, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ফুটিকে পড়াবার জন্যে।

কহিলাম, তাই নাকি?

আজ কদিনই তো পড়াচ্ছি।

মাসে কিছু—

তিনু ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, মাসে কুড়ি টাকা ক'রে দেবেন। তা ছাড়া গ্রামের উন্নতির জন্যে সাহায্য করবেন বলেছেন। ওঁর মত এতবড় মহৎ-হৃদয় নারী আমি দেখি নি।—বলিতে বলিতে তিনু ভাবাবিষ্ট হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, যদি গাঁয়ের ক্ষ্যাপা কুকুরগুলোর তাড়ায় অস্থির হয়ে উনি গাঁ থেকে না পালান তো গাঁয়ের চেহারা বদলে যাবে, আমি ব'লে দিচ্ছি। তারপর দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, আমরা পালাতে দোব না ওঁকে। একমুহূর্তে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া আস্তিন গুটাইতে গুটাইতে কহিল, এ ক্ষ্যাপা কুকুরগুলোকেই বরং ঢিট ক'রে ছেড়ে দোব।

সন্ধ্যার সময়ে তিনুর সঙ্গে যাইতেই হইল। একে তরুণ, তাহার উপর: সম্প্রতি তাতিয়া উঠিয়াছে, কাজেই ইহাদের চটাইলে শেষে বাড়িতে ইট-পাটকেল পড়িতে শুরু করিবে।

সরোজিনীর বাড়ির দরজায় আসিয়া কহিলাম, কাউকে ডাক দাও।

তিনু কহিল, কি দরকার? আসুন না আমার সঙ্গে।

তিনু ইহার মধ্যেই সরোজিনীর সংসারে স্বচ্ছন্দগতি হইয়া উঠিয়াছে। তিনুর বয়স চব্বিশের কাছাকাছি, লম্বা-চওড়া পেশীবহুল দেহ, গায়ের রঙটা ফরসা না হউক, আমাদের মত কালো নয়। লেখাপড়া কিছু শিখিয়াছে, নভেল-নাটকও দুই-চারিখানা পড়িয়াছে, কাজেই হৃদয়টাও হৃদয়সঙ্গিনীর জন্য হাহাকার করিতে শুরু করিয়াছে বোধ হয়। অতএব

এই অবস্থায় সরোজিনীর মত একজন সুন্দরী, নিঃসম্পর্কীয়া, বেওয়ারিস তরুণীর সঙ্গচর্চা তাহার পক্ষে ভাল কি? অবশ্য ফুণ্টি মাঝে রহিয়াছে। তবু দুইটি হৃদয় বিপরীতধর্মী তড়িতের তাড়নায় যখন পরস্পরের দিকে বিপুলবেগে ছুটিতে থাকিবে, তখন ঐ এককোঁটা মেয়ে তাহার প্রথম-ভাগ-পড়া বিদ্যা ও দীপশিখার মত দ্যুতিহীন রূপ লইয়া তাহাদের ঠেকাইয়া রাখিবে কি করিয়া? তাহার উপর তাহারও একটি নিজস্ব হৃদয় আছে; ইতিমধ্যে সেখানেও যদি কোন বৈকল্য ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে এই পাড়াগাঁয়ের প'ড়ো বাড়িতে একটি রোমাঞ্চকর ত্রৈভূজিক রোমান্স গড়িয়া উঠিবে দেখিতেছি।

উঠানে আসিয়া পৌছিতেই তিনু হাঁকিল, ফুণ্টি!

ফুণ্টি রান্নাঘরে ছিল, ডাক শুনিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

তিনু প্রশ্ন করিল, দিদি কোথায়?

ফুণ্টি জবাব দিল, পূজোর ঘরে আছেন।

তিনু আদেশ দিল, ডেকে দাও।

বারান্দায় বোধ করি আমার আগমন উপলক্ষ্যেই একটি টেবিল ও তাহার চারিদিকে চারিখানি চেয়ার পাতা হইয়াছে। তাহারই একটাতে বসিলাম।

তিনু আর একটাতে বসিয়া কহিল, খুব ধর্মশীলা। এই বয়সেই সব দিক দিয়ে এত সাধু-প্রকৃতির মহিলা বড় দেখা যায় না।—বলিয়া তিনু আবার ভাবাবিষ্ট হইয়া উঠিল।

মনে মনে কহিলাম, সকাল সন্ধ্যা দুই বেলা পূজার ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া ঘণ্টাখানেক করিয়া কাটাইলেই, কোন মেয়েকে সরাসরি ধর্মশীলা বলিয়া সার্টিফিকেট দেওয়া যায় না। আমার একজন নিদ্রানিপুণা আত্মীয়া প্রথম প্রথম শ্বশুর-বাড়ি গিয়া সকাল সন্ধ্যা পূজার ঘরে ঢুকিয়া

রাত্রির অসম্পূর্ণ নিদ্রা সুদে আসলে পোষাইয়া লইতেন। আমার স্ত্রীর এক প্রৌঢ়া দিদিমা পূজার ঘরে ঢুকিয়া দুই বেলা অঙ্গ-প্রসাধন করেন; আমি একজন বিধবাকে জানি, যিনি বৈধব্যের প্রথম অবস্থায় পূজার ঘরে ঢুকিয়া নিরিবিলিতে চৌর্যলব্ধ, বিধবার পক্ষে নিষিদ্ধ আহার্যদ্রব্য উদরসাৎ করিতেন। অবশ্য সরোজিনীর পক্ষে এসব উদাহরণ প্রয়োজ্য নয়। নিজের সংসারে সে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনা; কাজেই পূজার ঘরকে অন্য কোন প্রয়োজনে ব্যবহার করার তাহার আবশ্যক না হইতে পারে।

সরোজিনী আসিয়া হাজির হইল। পরিধানে গরদের থান-কাপড়, গায়ে গরদেরই ব্লাউজ; হাতে সেই সেদিনের মত দুইগাছি করিয়া প্লেন চুড়ি; ব্লাউজের অবকাশে অংশত-দৃশ্যমান বিছাহার; মাথায় এলো খোঁপার উপর স্বল্প অবগুণ্ঠন; মুখে সদ্যসমাপ্তপূজা পূজারিণীসুলভ শান্ত-সমাহিত ভাব।

সরোজিনী কাছে আসিয়া (আজও সেই এসেন্সের মিষ্ট গন্ধ) মৃদু ও মাদক হাসি হাসিয়া কহিল, দাদা, বোনকে একেবারে ভুলে গেছেন, বোন কিন্তু ভুলতে পারে নি।—বলিয়া গলায় অঞ্চল দিয়া সত্য সত্যই পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল। ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কহিলাম, থাক্ থাক্, কাজের ভিড়ে আসতে পারি নি, খবর সব পাচ্ছি।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহাস্য মুখে কহিল, খুব কুৎসা শুনছেন বুঝি?

আমিও হাসিয়া কহিলাম, কুৎসা প্রশংসা দুই-ই।

আচ্ছা, একটু বসুন, আমি আসছি এখনই। তারপরে ব'সে ব'সে একে একে সব শুনব।—বলিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

বুঝিলাম, খাবারের আয়োজন হইতেছে। অন্য কেহ হইলে, এই সুযোগে লাফাইয়া উঠিয়া কহিত, আহা থাক্ থাক্, ওসব আবার কেন?

এইমাত্র খেয়ে আসছি।—বলিয়া সরোজিনীকে প্রায় টানিয়া সামনে বসাইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু আমি নির্বাক ও নির্বিকার ভাবে বসিয়া রহিলাম। মাস্টারি করিতে করিতে সামাজিক কায়দা-কানুন আয়ত্ত করিতে পারি নাই; যাহা করা উচিত যথাকালে তাহা মনে পড়ে না, এবং যখন মনে পড়ে তখন করিবার উপায় থাকে না।

সরোজিনী এবং তাহার পাছু পাছু ফুন্টি আসিয়া হাজির হইল। দুইজনের হাতে দুই থালা খাবার। ফুন্টি নীল রঙের শাড়ি (বোধ করি সরোজিনীর) কোমর বাঁধিয়া পরিয়াছে, গায়ে ঐ রঙের ব্লাউজ, মাথার চুল আজকালকার কলেজে-পড়া মেয়েদের মত আঁট-সাঁট করিয়া বাঁধা, কানে দুইটি সোনার দুল। ফুন্টি বোধ হয় রান্না করিতেছিল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়াছে। ফুন্টি মেয়েটি ভারি ভাল, খুব নম্র ও ধীর (অন্তত আমাদের কাছে); ফরসা রঙ নয়, তবু তাহার স্বাস্থ্যময় দেহে একটি উজ্জ্বল শ্যাম-শ্রী টলমল করিতেছে।

খাবারের থালা নামাইয়া সরোজিনী পাশের চেয়ারে বসিয়া ফুন্টিকে হুকুম করিল, জল নিয়ে আয়, তারপর খাওয়া হ'লে চা নিয়ে আসবি। ফুন্টি হুকুম তামিল করিতে ছুটিল।

সরোজিনী কহিল, খান।

তিনকড়ি অবিলম্বে আরম্ভ করিয়া দিল। আমি এইবার কোনমতে বলিয়া ফেলিলাম, আবার এত সব কেন, মানে—। সরোজিনী যথারীতি কহিল, বাঃ রে! বোনের বাড়িতে এসেছেন—। কহিলাম, হাতটা একটু—। সরোজিনী ডাক দিয়া কহিল, ফুন্টি, জল নিয়ে আয়। ফুন্টি দুই গ্লাস জল আনিয়া হাজির করিল। হাত ধুইয়া খাইতে বসিলাম।

সরোজিনী কহিল, কি কি নিন্দে শুনেছেন বলুন তো?

গম্ভীর মুখে কহিলাম, আমাদের পদ্মকে অপমান করেছ কেন?

সরোজিনী দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিল, ও কি আপনার নিজের লোক নাকি?

ত্রস্তভাবে কহিলাম, না না, আমার নিজের লোক নয়, তবু গাঁয়ের মেয়ে তো, হারাণের বোন।

সরোজিনী আশ্বস্ত হওয়ার স্বরে কহিল, ও। তা ও বাড়ি ব'য়ে ঝগড়া করতে এসেছিল কেন? তা ছাড়া অপমান তো কিছু করি নি।

গম্ভীর মুখে কহিলাম, অপমান করা আর কাকে বলে? ডোম বলেছ, গোঁফ-দাড়ি আছে বলেছ, চোর বলেছ, আর আর—

তিনু ভরাট মুখে কহিল, ঠিকই তো বলেছেন, সবগুলি গুণই তো ওর আছে।

সরোজিনী লজ্জার ভান করিয়া কহিল, সত্যি, রাগের মাথায় যা-তা ব'লে ফেলেছি, দেখা হয় তো মাপ চেয়ে নোব।

ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, উঁহু, ও কাজটি ক'রো না।

সরোজিনী উৎসুক কণ্ঠে কহিল, কেন?

তোমার নাক কামড়ে দেবে, যা রেগেছে।

তিনু কহিল, ঠিক বলেছেন। ও কাজ করবেন না, কামড়ে দেয় ও, আমার দিদিকে একদিন কামড়ে দিয়েছিল।

সরোজিনী সভয়ে কহিল, তাই নাকি! তবে থাক্ ওসব, তা ছাড়া ওসব মেয়েকে একটু-আধটু আঘাত দেওয়া ভাল।

তিনু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

ফুল্টি আসিয়া হাজির হইল, দুই হাতে দুই কাপ চা; মুখটি মুছিয়াছে; কেশে ও বেশে কিঞ্চিৎ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে বলিয়া মনে হইল।

টেবিলে চা নামাইয়া দিয়া, ফুল্টি চেয়ারটা টানিয়া সরোজিনীর

আড়ালে গিয়া বসিল। আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম, মাঝে মাঝে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কুন্টি তিনকড়িকে দেখিয়া লইতেছে।

কুন্টির এত আড়ালে-আবডালে তিমুকে দেখিবার কি প্রয়োজন? তিমুর কাছেই পড়ে শুনিয়াছি। পড়িবার সময়ে সাধ মিটাইয়া তাহাকে দেখিয়া লইলেই হয়।

কিন্তু বলিতে কি, তিমুর উপর একটু ঈর্ষা হইল। কুমারী তরুণীর কোমল কটাক্ষ-লাভ ইহলোকে আমাদের ভাগ্যে জুটে নাই।

আমাদের যৌবনকালে অনাত্মীয়া তরুণীরা নিঃসঙ্কোচে পথে-ঘাটে বাহির হইত না, পুরুষদের সহিত মিশিত না, স্কুল-কলেজে একসঙ্গে পড়া দূরে থাক, উঁকি পর্যন্ত মারিত না। দূর হইতে তাহাদের দর্শন-লাভের জন্য হয় গির্জায় বা সমাজে, থিয়েটারে বা বায়স্কোপে যাইতে হইত; অথবা ফুটপাথের উপর বেলা দশটায় বা চারটায় পায়চারি করিতে হইত। কিন্তু তাহাতে আমাদের তৃষ্ণার্ত হৃদয় তৃপ্তি মানিত না।

তিমু প্লেটে চা ঢালিয়া, ফুঁ দিয়া দিয়া খাইতে খাইতে সরোজিনীকে কহিল, ওঁকে তা হ'লে সেই কথাটা—

সরোজিনী নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া কহিল, আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে।

জিজ্ঞাসু মুখে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। সে কহিল, তিনকড়ি-বাবু গ্রামে একটা লাইব্রেরি করবার জন্যে আমাকে ধরেছেন। এখানের ওপর অবশ্য আমার বিন্দুমাত্র মমতা নেই, তবু আমি রাজি হয়েছি। শ দুই টাকা আমি দোব, কিন্তু আপনার হাতে, আপনি যেমন ইচ্ছে লাইব্রেরি গ'ড়ে তুলুন।

কহিলাম, ঘর কোথায়?

আমার বৈঠকখানায় সম্প্রতি হোক ; পরে যদি দেখি, গ্রামের লোক লাইব্রেরি ব্যবহার করছে আর তাতে তাদের মনের কিছু উন্নতি হচ্ছে, তা হ'লে ঘর করবার টাকাও আমি দোব।

সরোজিনী বেশ কথাবার্তা বলে তো! ঠিক শিক্ষিতা মেয়েদের মত!

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলাম, আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

সরোজিনী উৎসুক কণ্ঠে কহিল, কি?

একটু ইতস্তত করিয়া কহিলাম, তুমি কি লেখাপড়া শিখেছ?

সরোজিনী মৃদু হাসিয়া কহিল, কেন বলুন দেখি?

তোমার কথাবার্তার ধরন দেখে মনে হয় ; তা ছাড়া এসব বিষয়ে উৎসাহ আমাদের পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে কোন দিন দেখি নি।

সরোজিনী গম্ভীর হইয়া কহিল, হ্যাঁ।

বিয়ের আগেই?

ঘাড় নাড়িয়া সরোজিনী কহিল, না, বিয়ের পর। ওঁর সঙ্গে ওখানে গিয়ে। উনি সারাদিন বাইরে বাইরে থাকতেন ; বাড়িতে হিন্দুস্থানী চাকর-চাকরানী ছাড়া আর কোন সঙ্গী ছিল না। ভারি একা একা মনে হ'ত। ওঁকে একদিন বললাম, আমাকে একটু লেখাপড়া শেখবার ব্যবস্থা ক'রে দাও ; দু-চারখানা বই, খবরের কাগজ পড়তে পারলেও সময়টা এক রকম ক'রে কাটবে। উনি ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। বাড়ির পাশেই এক ভদ্রলোক থাকতেন, আগে কোন্ এক স্কুলে হেডমাস্টারি করতেন, বয়স হওয়াতে কাজ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন ; তিনিই আমার মাস্টার নিযুক্ত হলেন। তাঁর কাছে ইংরেজী বাংলা কিছু কিছু পড়েছিলাম।

সরোজিনীর হইয়া প্রবোধকে ধন্যবাদ দিলাম। ইহার জীবন ও যৌবনকে সে নষ্ট করিয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু ক্ষতিপূরণ করিতেও কসুর করে নাই। দিয়া গিয়াছে—বিত্ত ও বিদ্যা। হয়তো সরোজিনী প্রতিদিন গভীর রাত্রে নিঃসঙ্গ শয্যায় ছটফট করিতে করিতে নিজের ব্যর্থ ও বঞ্চিত নারীত্বের জন্য ক্ষোভে ও দুঃখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে; কিন্তু বাংলা দেশের শত-করা নব্বই জন বিধবার মত সাধু ও স্বাধীন ভাবে জীবনযাত্রার পাথেয়ের জন্য তাহাকে কোন দিন ভাবিয়া দিশাহারা হইতে হইবে না।

সরোজিনী স্বাভাবিক কোমল কণ্ঠ কোমলতর করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিল, আমার কোন সাধ মেটাতে উনি কোন দিন কসুর করেন নি। তা ছাড়া কত দিয়ে গেছেন! এখানের এই ছোট জমিদারি শুধু নয়, ওখানেও অনেক সম্পত্তি, চারখানা বাড়ি—যেখানে থাকতাম সেখানে দুখানা, কাশীতে একখানা, এলাহাবাদে একখানা। তা ছাড়া, ব্যাঙ্কে আমার নামে অনেক টাকা। যেখানে থাকতাম, সেখানে ওঁর কত বন্ধুবান্ধব, কত গুরুভাই; বিপদের সময়ে কত সাহায্য করেছেন তাঁরা; আমাকে আসতেও দিতে চান নি। তবু কারও কথা না শুনে আমি চ'লে এলাম। ভাবলাম, পাড়াগাঁ হোক, নিজের দেশ, নিজের আত্মীয়-স্বজন সব এখানে রয়েছে; এরা যত স্নেহ-দরদ করবে, তা কি বিদেশের বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে কখনও পাব? কিন্তু এসে দেখলাম, কোথায় স্নেহ, কোথায় সহানুভূতি! সবাই অনাথা অবলা দেখে ভুলিয়ে নিতে চায়। সত্যি বলছি দাদা, যদি আপনারা আমাকে 'আপনার জন' ক'রে নিতেন, তা হ'লে আমার যা কিছু আছে, সব দিয়ে আমি এই গাঁয়ের চেহারা বদলে দিতাম। (তিনুর মুখেও এই কথা শুনিয়াছিলাম।) আপনার স্কুলের উন্নতি ক'রে

দিতাম, মেয়েদের জন্তে স্কুল করতাম, হাসপাতাল করতাম, রাস্তাঘাট মেরামত করিয়ে দিতাম, এই সব আমি একদিন কল্পনাও করেছিলাম। কিন্তু এমনই সব ক'রে তুলেছে, একদণ্ডও তিষ্ঠুতে ইচ্ছে করছে না।

বক্তৃতায় বাধা দিয়া কহিলাম, এতে তুমি অস্থির হয়ে উঠো না। এটা আমাদের পাড়াগাঁয়ের নিয়ম ; কেউ নতুন এলে তাকে প্রথমে সহ্য করতে পারে না ; তাকে ঘা মেরে মেরে ঘাতসহ ক'রে নিয়ে তারপর নিজেদের সঙ্গে মিলিয়ে নেয়। এ বিষয়ে দিশী কুকুরদের সঙ্গে আমাদের অনেকটা মিল আছে।

তিমু আস্তিন গুটাইতে গুটাইতে কহিল, ঠিক তাই। আপনি কিছু ঘাবড়াবেন না। আমার টর্চ-লাইট-সমিতি (তিমুর দলের নাম) যখন আপনার পেছনে দাঁড়িয়েছে, তখন কেউ আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করতে আসবে না। এলে তাকে দন্তহীন কিংবা নাসিকাহীন হতে হবে। আপনি মনের সাধে আপনার কল্পনাকে কাজে ফুটিয়ে তুলুন আমাদের কর্মশক্তির ভেতর দিয়ে।

সরোজিনী চুপ করিয়া রহিল। আমি কহিলাম, লাইব্রেরির সম্বন্ধে তোমার কোন চিন্তা নেই, আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দোব।

তিমু কহিল, আর উদ্বোধনটা সম্বন্ধে—

তারও ব্যবস্থা হবে। এস. ডি. ও. সাহেব তো আমাদের স্কুলের প্রেসিডেণ্ট, আমার সঙ্গে আলাপ আছে। তাঁকে অনুরোধ করলেই আসতে রাজি হবেন বোধ হয়।

সরোজিনী কহিল, সেদিনও বলেছি, আজও বলছি, আপনি যদি আমার মুখের দিকে একটু তাকান দাদা, তা হ'লে হয়তো আমি এখানে টিকে থাকতে পারব।

কহিলাম, আমি তো তোমার কথা ভাবি দিদি। আমার স্নেহসূচক

কথা শুনিয়া আজও সরোজিনীর চক্ষে জল আসিল ; অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, আর ভাবেন ! এখান থেকে পা বাড়ালেই ভুলে যাবেন আমার কথা। আমার যে কি ক'রে দিন কাটছে !—বলিয়া সরোজিনী চক্ষে অঞ্চল দিতেই ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। একবার ইচ্ছা হইল, সরোজিনীর অশ্রুসিক্ত মুখখানি বুকের উপর টানিয়া লইয়া সস্নেহে মুছাইয়া দিয়া বলি, বোন ! আমি স্কুল-মাস্টার ; আমার ব্যাঙ্কে টাকা নাই, দেহে শক্তি নাই, সমাজে প্রতিপত্তি ও পদ-মর্যাদা নাই, তবু আমি তোমার সম্মুখে রহিলাম। আঘাতের বদলে আঘাত করিতে পারিব না বটে, তবু আঘাত হইতে তোমাকে যথাসাধ্য আড়াল করিয়া রাখিব।—কিন্তু ইচ্ছা দমন করিলাম। কারণ তিমু এখনই প্যাটপ্যাট করিয়া তাকাইয়া আছে ; তাহার উপর এই কাণ্ড করিলে, ইহার কদর্থ করিবে, মারমুখী হইয়াও উঠিতে পারে। তাহা ছাড়া সরোজিনীও এই স্নেহোচ্ছ্বাসের তাৎপর্য না বুঝিয়া হয়তো হকচকাইয়া যাইবে, কারণ চল্লিশ পার হইলেও একজন নিঃসম্পর্কীয়া চব্বিশ বৎসর বয়সের যুবতীকে পাতানো ভাই-বোন সম্পর্কের জোরে বুকে টানিবার বয়স এখনও আমার হয় নাই।

সরোজিনী মুখ হইতে অঞ্চল সরাইতে দেখিলাম, দুই চোখের কোল হইতে দুইটি অশ্রুধারা ইহার মধ্যেই বহাইতে পারিয়াছে। এ সম্বন্ধে পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের ক্ষমতা অনেক বেশি। এক ফোঁটা অশ্রু বাহির করিবার জন্য পুরুষদের মাথা ঠুকিতে হয়, কিন্তু মেয়েরা ইচ্ছা করিলেই অবলীলাক্রমে চোখের কোলে বন্যা বহাইয়া দিতে পারে। রমণী-নয়নের অশ্রু তিমুর পৌরুষকে খোঁচা দিয়া চাগাইয়া তুলিল বোধ হয়, সে লাফাইয়া উঠিয়া সরোজিনীর চোখের দিকে আঙুল বাড়াইয়া কহিল, আপনি সত্যিই কাঁদছেন ! দাদা নাই বা থাকল, ভাই তো আছে। আমি তো বলেছি আপনাকে, আমি আপনার ছোট ভাই, তা ছাড়া—

ডান হাতের আঙুল গনিতে গনিতে কহিল, প্যানা, ভোঁদা, গদা, হিকে, ডিকে—

হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ফুটি কহিল, পিসীমা! দিদিমার খাবার সময় হ'ল।

দিদিমা অর্থাৎ সরোজিনীর শাশুড়ী। সরোজিনী ব্যস্ত হইয়া কহিল, হ্যাঁ মা। যাই চল্। তিনু প্রসারিত দক্ষিণ করতলের অঙ্গুলির উপর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিয়া নির্বাকভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

কহিলাম, রাত হয়েছে, চল হে তিনু, বাড়ি যাই।

বাড়ি যাইতে যাইতে তিনু কহিল, এখানে আবার ফিরতে হবে।

সবিস্ময়ে কহিলাম, কেন?

রাত্রে পাহারা দিচ্ছি যে আমরা পালা ক'রে, গাঁয়ের লোককে তো বিশ্বাস নেই, হয়তো ডাকাতি করিয়ে দেবে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, তা ছাড়া একটা কুস্তির আখড়া করেছি আমরা। ওই যে পেছনের জায়গাটা প'ড়ে আছে, ওটা তো ওঁদের জায়গা, ওইখানটায়। উনি সেদিন বলছিলেন, এ গাঁয়ের ছেলেরা বয়সেই যুবক, শক্তিতে নয়; সব যেন ধুঁকছে; বাইরে থেকে ডাকাতের দল এসে গাঁয়ের কারও বাড়িতে হানা দিলে, তাদের ঠেকাবার ক্ষমতা কারও নেই। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, এমন চমৎকার আইডিয়া ওঁর, তা ছাড়া দিলও তেমনই। আখড়ার সমস্ত খরচ উনি দেবেন বলেছেন।

৯

পরের দিন সন্ধ্যার পরে মনু চক্রবর্তী আসিয়া হাজির হইল। হাঁকিয়া কহিল, মাস্টার আছ নাকি ?

তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া কহিলাম, কি ব্যাপার, এত হাঁকাহাঁকি করছ কেন ?

মণীন্দ্র কপাল কুঁচকাইয়া কহিল, কেন ? কাউকে ভয় করি নাকি ?

কহিলাম, তুমি হয়তো কর না, আমাকে তো করতে হয়। ঘরে এসে ব'স, যা বলবার বল এখানে।

কঠোর কণ্ঠে মণীন্দ্র কহিল, দেখ মাস্টার, তুগড়ের চ্যাং-লোকগুলোকে আমি দু চক্ষে দেখতে পারি না ; এত ভয় তো কাল রাতদুপুরে সলা-পরামর্শ করতে গিয়েছিলে কেন ?

শুনুন দেখি কথা ! যেন আমি আমার নিজের গরজে সাধিয়া যাচিয়া গিয়াছিলাম !

কড়া গলায় কহিলাম, দেখ মনুদা ! বোকার মত যা-তা ব'লো না।

মনু দমিয়া গিয়া আহত স্বরে কহিল, আমি বোকা ! এতবড় জমিদারি চালাচ্ছি—

খুব চালাচ্ছ তুমি ! ভাগ্যে দারোগাবাবু আর আজিজ সাহেব ব'লে-ক'য়ে দিচ্ছে।—বলিতে বলিতে ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম। মনু পিছু পিছু আসিয়া কাঁধে হাত দিয়া কহিল, মা কালীর দিব্যি বলছি, দারোগাবাবুদের কিছু করতে হয় না, সব আমি একাই করি।

বসিয়া কহিলাম, ভাল কথা। দারোগাবাবুকে তাই বলব।

মনু ভয় পাইয়া কহিল, দারোগাবাবুকে কি আবার বলতে যাবে ?

বলব, তুমি বলেছ, দারোগাবাবু কিছু করে নি, তুমি একাই সব করেছ।

মনু ঢোক গিলিয়া কহিল, হ্যাঁ, তাই তো। দারোগাবাবুরা প্রথমে সবাইকে ডেকে ব'লে দিয়েছিলেন, তারপর তো যাবামাত্র সব বাকি-বকেয়া মিটিয়ে দিচ্ছে, ওঁদের তো আর কিছু বলতে হয় নি।

তা হ'লে দারোগাবাবু কিছু করে নি বলছ কেন?

মনু ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, বাঃ রে! তা আবার কখন বললাম? আর যদি মনের ভুলে কিছু ব'লেই ফেলেছি, তা দারোগাবাবুকে বলতে যাবার কি দরকার? তুমিও দেখছি, হেরো-রেধোর জুড়ি হচ্ছ দিন দিন। চুপ করিয়া রহিলাম। আমার হাঁটুর উপর হাত দিয়া কহিল, দেখ ভায়া, গাঁয়ের মধ্যে তোমাকেই আপনার লোক ব'লে জানি; তাই মনের কথা সব খুলে বলি তোমাকে। তুমি যদি আবার ওই ঢাক পেটাতে থাক, তা হ'লে তো কথাবার্তা বন্ধ ক'রে পেট ফেঁপে মরা ছাড়া উপায় থাকে না। ঢোক গিলিয়া কহিল, তার ওপর দারোগাবাবু সম্প্রতি যেন একটু খিঁচড়ে যাচ্ছে ব'লে মনে হয়।

প্রশ্ন করিলাম, কারণ?

মণীন্দ্র কহিল, কারণ একটু আছে।

প্রশ্ন করিলে মণীন্দ্রের দর বাড়িয়া যাইবে, সহজে বলিতে চাহিবে না। কাজেই অন্যমনস্কের মত বসিয়া রহিলাম। মণীন্দ্র একটু ঘেঁষিয়া আসিয়া নীচু গলায় কহিল, কারণ শুনবে তবে? আর একটু কাছে এস, কাউকে ব'লো না, মায় বউমাকে পর্যন্ত না। মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। মণীন্দ্র ফিসফিস করিয়া বলিতে লাগিল, যা যেখানে পাওনা ছিল, প্রায় সব আদায় হয়ে গেছে; তাই সরোজিনী বললে,

দারোগাবাবুকে পান খাবার জন্তে কিছু দেওয়া দরকার। তাই সেদিন একটা একশো টাকার নম্বরী নোট নিয়ে দারোগাবাবুকে দিতে গেলাম। দারোগাবাবু নিতে চাইলে না, বললে—পাগল হয়েছন নাকি! কি এমন করেছি যে, এসব হাঙ্গামা করছেন! আপনার বোনের হাতে একদিন খাইয়ে দেবেন, তা হ'লেই হবে।

কহিলাম, বেশ ভাল কথাই তো বলেছেন।

মণীন্দ্র গরম হইয়া উঠিয়া কহিল, বেশ ভাল কথা বলেছেন?—বলিয়া ঘাড়টা কাত করিয়া আমার দিকে কিছুক্ষণ কটমট করিয়া তাকাইয়া রহিল; তারপর ঘাড়টা সোজা করিয়া বার দুই লম্বভাবে নাড়িয়া কহিল, মাস্টারি বুদ্ধি কিনা! বামুনের বিধবা হয়ে একটা মেলেচ্ছকে বাড়িতে বসিয়ে খাওয়াবে? জাত-জন্ম রসাতলে যাবে না!

কহিলাম, এখন আর তাতে দোষ কি? শুভদৃষ্টি—

মণীন্দ্র খ্যাঁক করিয়া উঠিল, কি?

মানে, চোখোচোখি তো হয়ে গেছে।

মণীন্দ্র কহিল, মানে?

সরোজিনী দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে থানায় গিয়েছিল না?

মণীন্দ্র ঠাণ্ডা হইয়া কহিল, গিয়েছিল তো।

তবে তাঁকে বাড়িতে এনে খাওয়াবার দোষ কি? তাতে তিনি সন্তুষ্ট হবেন, একশোটা টাকাও বেঁচে যাবে।

মণীন্দ্র কহিল, সত্যি বলছ, দোষ নেই?

ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, দোষ নাই।

মণীন্দ্র অনেকক্ষণ কপাল কুঁচকাইয়া, চোখ দুইটা ছোট করিয়া, নাক চুলকাইতে চুলকাইতে ভাবিয়া কহিল, সরোজিনীকে একটু ব'লে দিতে পার?

কহিলাম, পাগল নাকি! আমি আবার কি বলতে যাব! তুমি বল গিয়ে।

মণীন্দ্র বিরক্ত হইয়া কহিল, তুমি বল গিয়ে! আমি বললে শুনবে? তা ছাড়া—। বলিয়া চুপ করিয়া গেল।

তা ছাড়া কি?

মণীন্দ্র মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল, টাকাটা তো আর ফেরত দেওয়া হয় নি, সব খরচ হয়ে গেছে।

বিস্ময়ের স্বরে কহিলাম, দারোগাবাবু যে টাকা নেন নি, তা বলেছ ওকে?

মণীন্দ্র মুদ্রিত চক্ষে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না। তারপর চোখ খুলিয়া কহিল, ওদিকে দারোগাবাবু তাগাদা দিচ্ছে দেখা হ'লেই। কাল মনে হ'ল, একটু চটেছে।

কহিলাম, চটবে বইকি

মণীন্দ্র রাগিয়া উঠিয়া কহিল, চটবে কেন? কেউ যদি তার বোনকে যার তার সামনে বার না করে, তাতে চটবার কি আছে? চুপ করিয়া রহিলাম। মণীন্দ্র কহিল, চুপ ক'রে রইলে যে, জবাব দাও?

কহিলাম, জবাব কি দোব? বরাবর সাচ্চা থাকলে তো তোমার কথাই সত্যি। তবে তখন এক রকম, এখন আর এক রকম করলেই তো গোলমাল কিনা। তা ছাড়া তোমার নিজের গলদ রয়েছে।

মণীন্দ্র অনুযোগের স্বরে কহিল, গলদ তো আমার সবটাই, তোমরা আর কখন আমার ভালটা দেখ! কিন্তু কি করা যায়, একটা পরামর্শ দিতে পার?

কহিলাম, আমার কথায় কাজ হবে না, তিনকড়িকে ধর গিয়ে।

মণীন্দ্র কহিল, ঠিক বলেছ, তিনকড়িকেই ধরিগে, ওর সঙ্গেই

আজকাল খুব দহরম-মহরম, রাতদিন গুজগাজ। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, কি পরামর্শ হ'ল কাল—অ্যাঁ?

কহিলাম, তুমি জান না?

ঘাড় নাড়িয়া মণীন্দ্র কহিল, জানি, জানি, সব জানি। আমার কি কিছু অজানা থাকে? একটু বেয়াড়া রকমের নিশ্বাস ফেললেও আমার কাছে খবর আসে।

কহিলাম, বল কি? গোয়েন্দা রেখেছ নাকি?

মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে মণীন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হুঁ।

প্রশ্ন করিলাম, কে?

মণীন্দ্র নাক উঁচাইয়া কহিল, বলব কেন?

চুপ করিয়া রহিলাম।

মণীন্দ্র কহিল, ফুটি সব বলেছে আমাকে। পয়সা সস্তা হয়েছে কিনা! তা বই কেনবার টাকাটা কাকে দেওয়া হচ্ছে শুনি?

কহিলাম, তিনকড়ির হাতে। ও-ই বই কিনে নিয়ে আসবে। আঁতকাইয়া উঠিয়া মণীন্দ্র কহিল, পাগল হয়েছ নাকি! একসঙ্গে দশটা টাকা যে চোখে দেখে নি, তার হাতে অতগুলো টাকা! একেবারে হজম ক'রে দেবে।—বলিয়া মুখ হাঁ করিয়া হাত দিয়া খাইবার ভঙ্গী করিয়া, চোখ ও মুখ বুজিয়া গিলিবার ভঙ্গী করিল। কহিলাম, তা ছাড়া কে আর কিনতে যাবে, আমার সময় নেই।

দুই চোখ চাড়াইয়া মণীন্দ্র কহিল, কেন, আমি?

কহিলাম, বেশ, তুমিও যেও। বই কি কি কিনতে হবে, আমি লিস্ট্ ক'রে দোব। দারোগাবাবুর টাকার মত যে গাফ ক'রে দেবে, তা হবে না।

মণীন্দ্র মর্মাহত হইয়া কহিল, তুমিও ঐ কথা বলছ! মেলেচ্ছের

নামে টাকা বামুনের বাক্সে তুলতে নেই, তাই নিয়েছি। না হ'লে সাধারণের টাকা আমি নিতে পারি? হাতে যে কুষ্ঠ হবে।—বলিয়া দুই হাতের আঙুল প্রসারিত করিয়া দুমড়াইয়া দিল।

হাসিয়া কহিলাম, তুমি কি বামুন নও নাকি, তুমি তুললে কি ক'রে?

পাগল! আমি তুলতে পারি? মেলেচ্ছের টাকা মেলেচ্ছকেই দিয়েছি—

বিস্ময়ের স্বরে কহিলাম, সে কি!

ঐ যে বুড়ো কাবলীওয়ালা, ওর কাছে ধার করেছিলাম আর বছর, তা বেটার চোখের চামড়া মোটেই নেই কিনা, তাগাদার চোটে একেবারে অস্থির ক'রে দিয়েছিল। সেই একশোটা টাকা বেটা কাবলী-ওয়ালার কবলেই দিলাম। কিন্তু দেখো, এসব কথা যেন সরোজিনীকে বলতে যেও না। তা হ'লে তোমার সঙ্গে মুখ-দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ ক'রে দোব বলছি।

যেন তাহার মুখদর্শন করিবার জন্য দিবারাত্র ছটফট করিয়া মরিয়া যাইতেছি! কহিলাম, পাগল হয়েছ নাকি!

ঘাড় নাড়িয়া কড়া গলায় মণীন্দ্র কহিল, ঠাট্টা নয়, সত্যি। সাবধান ক'রে দিচ্ছি। মন্নু চক্রবর্তীকে জান তো—এক কথা, পাহাড় টলে, তবু মন্নুর কথা টলে না।—বলিয়া ঘাড়টি ঘন ঘন নাড়িতে লাগিল।

১০

দিন চার পরে সন্ধ্যাবেলায় গাঙুলী মশায়ের বৈঠকখানায় গিয়া দেখিলাম, মস্তবড় এক মজলিস বসিয়া গিয়াছে। গাঙুলী মশায়, হারাণ, রাধানাথ, দোলগোবিন্দ, আরও জনকয়েক পাড়ার লোক, এবং সকলের মাঝখানে বসিয়া আর একজন, যাহাকে ইহার পূর্বে আমি সজ্ঞানে কোন

দিন আমাদের গ্রামে দেখি নাই। ইহার বয়স পঞ্চাশ পার হইয়া গিয়াছে, দেহ শীর্ণ ও লম্বা, মুখে মাংস বলিতে কিছুই নাই, হাড়ের উপর কোনমতে চামড়া দিয়া ঢাকা ; গাল দুইটিতে গভীর গর্ত, চোখ দুইটি কোটরস্থ ; নাকটি খাঁড়ার মত উঁচু ও চিলের ঠোঁটের মত বাঁকা ; মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া চারিদিকে সমানভাবে ছাঁটা ; মাথার ঠিক মধ্যস্থলে কুকুরের অর্ধকর্তিত লেজের মত খাটো ও খাড়া টিকি। পরিধানে পাড়হীন ধুতি ও কেটের গলাবন্ধ কোট, এই ভ্যাপসা গরমেও গায়ে চাপাইয়া রাখিয়াছে। দরজার বাহিরে কর্দমভারাক্রান্ত দেশী জুতা জোড়াটি যে ইহারই, তাহা বুঝিলাম ; কারণ অন্য কেহ জুতা পরিয়া আসে নাই। ভদ্রলোক চাপিয়া বসিয়া আছে, হাতে হুঁকা। রাধানাথ পাশে বসিয়া একটি কলিকায় ফুঁ দিতেছে।

আমাকে দেখিয়া গাঙুলী মশায় অভ্যাসমত কহিলেন, এস ভায়া।—বলিয়া তাঁহার পাশে বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।

হারাণ মুচকি হাসিয়া কহিল, মাস্টার যে! এদিকের রাস্তাটা ভুলেই গেলে দেখছি।

রাধানাথ কলিকাটি হুঁকার মাথায় চাপাইয়া দিয়া কহিল, রাত দিন পরামর্শ দিতে দিতে সময় পায় না বেচারা।

অপরিচিত ভদ্রলোক দুই ভ্রূ নাচাইয়া প্রশ্ন করিল, কে?

গাঙুলী মশায় কহিলেন, আমাদের গাঁয়ের এম. এ. পাস, গাঁয়ের স্কুলের হেডমাস্টার।

অপরিচিত ব্যক্তি হুঁকায় প্রাণপণে টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে কহিল, এম. এ. পাসের কথা আর বলবেন না, রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে আজকাল, আমাদের গাঁয়েই পাঁচ-পাঁচ জন।—বলিয়া বাঁ হাতের পাঁচটি আঙুল প্রসারিত করিল।

চুপ করিয়া রহিলাম, আমার দিকে তাকাইয়া ভদ্রলোকটি স্বাভাবিক কর্কশ স্বরে কহিল, পাড়াগাঁয়ে প'ড়ে পচছ কেন? চাকরি-বাকরি আর জোটে নি?

বিনীতভাবে কহিলাম, আজ্ঞে না। হাত কচলাইতে কচলাইতে কহিলাম, একটা জুটিয়ে দিতে পারেন?

ভদ্রলোক কহিল, কি? চাকরি? ঘাড়টি কাত করিয়া ও সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুইটি বুজিয়া কহিল, পারি।

হারাণ কহিল, ওঁকে যে-সে লোক মনে ক'রো না। ঝাকড়দা স্কুলের ফিফ্‌থ মাস্টার। কত জজ-ম্যাজিস্ট্রেট ওঁর হাত দিয়ে পেরিয়ে গেছে।

ভদ্রলোক প্রসন্ন হাসি হাসিয়া কহিল, সত্যি। বিদেশে বেরোবার জো নেই, হুপাশাড়ি সব লটলট মাথা নামাচ্ছে। কেউ কেউ আবার পায়ের নীচে গড়াগড়ি। সেবার দেখুন না, কোথায় যাচ্ছিলাম, কি কাজে পানাগড় ইষ্টিশানে যেমনই নেমেছি, দেখি কোট-প্যাণ্ট-টুপি-পরা একজন বাঙালী সাহেব এসে পায়ের কাছে প্ল্যাটফর্মের কাঁকরের ওপরেই লুটিয়ে পড়ল। শশব্যস্ত হয়ে বললাম, কে, কে? উঠে দাঁড়াতেই দেখি, আমার ছাত্র গদাধর, ঐ ইষ্টিশানের মাস্টার। তারপর কি টানাটানি! একটু পায়ের ধুলো দিতেই হবে? বললাম, আরে, তা কি হয়! মোটে দু মিনিট গাড়ি দাঁড়ায়। গদাই বললে, তার জন্যে আপনার চিন্তা নেই। আমি না হুকুম দিলে গাড়ি ছাড়বার সাধ্য কি? তারপর ইষ্টিশানের ভেতর নিয়ে গিয়ে, বসিয়ে খাবার-দাবার খাইয়ে যখন ছাড়লে, তখন প্রায় আধ ঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে। ভ্রূ দুইটি যুক্ত করিয়া রাধানাথের দিকে চাহিয়া, ঘাড় নাড়িয়া কহিল, মনে কর, শুধু আমারই জন্যে গাড়ি আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইল। গাড়িসুদ্ধ লোক অবাক, এ লাট-সাহেবের খাতির তো!

গাঙুলী মশায় কহিলেন, সত্যি। স্কুল-মাস্টারদের মত খাতির কারও নেই। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত মাথা নোয়ায়। আমাদের মাস্টারেরই দেখুন না; ও জুরি না হ'লে জজ-সাহেবের পছন্দই হয় না।

রাধানাথ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া কহিল, কার সঙ্গে কি! বদন গঞ্জ, আর ঝাকড়দা! কতবড় স্কুল ঝাকড়দার! নিজের চোখে তে দেখে এলাম।

ভদ্রলোক ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সত্যি। অতবড় স্কুল প্রায় দেখা যায় না। আমার হাতে গড়া স্কুল তো। হেডমাস্টার পর্যন্ত মুখের সামনে কথা কইতে পারে না।

দোলগোবিন্দ আমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, ভায়া বোধ হয় ওঁকে চিনতে পারছ না? উনি প্রবোধ গাঙুলীর মামা। ওঁকে তোমরা দেখ নি। আজকাল তো আসা-যাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন; আগে প্রায়ই আসতেন।

ভদ্রলোক কহিল, কতবার! দোলগোবিন্দর দিকে চোখের ইঙ্গিত করিয়া কহিল, কত ফুর্তি করা গেছে তখন! কি সব দিনই গেছে!

সত্যি।—বলিয়া দোলগোবিন্দ সেই টানেই কাশিতে শুরু করিল।

গাঙুলী মশায় কহিলেন, প্রবোধের স্ত্রী ম্লেচ্ছ নিয়ে যা কাণ্ড-কারখানা করছে, তাতে তো তার সঙ্গে জাত-জন্ম বাঁচিয়ে কোন বামুনের বিধবার বাস করা চলে না। তাই উনি ওঁর দিদিকে নিয়ে যেতে এসেছেন।

প্রশ্ন করিলাম, উনি খবর পেলেন কি ক'রে?

রাধানাথ ধমক দিয়া কহিল, তা তোমার জানবার কি দরকার?

তাহাকে উপেক্ষা করিয়া গাঙুলী মশায়ের দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

গাঙুলী মশায় কহিলেন, রাধানাথ নিজে গিয়ে নিয়ে এসেছে।

রাধানাথ কহিল, কে খবর দিয়েছে, কে নিয়ে এসেছে, ওসব আলোচনার দরকার কি? প্রবোধ গাঙুলীর স্ত্রী যে দারোগার সঙ্গে মাখামাখি করছে, তা কি কেউ জানে না, না, দেখে নি? পেটে খাবার লোভে অনেকের তা মনে পড়তে না পারে, কিন্তু যাদের সমাজের ওপর সত্যিকার দরদ আছে, দুপাতা ইংরিজী প'ড়ে যারা মেলেচ্ছ ব'নে যায় নি, তারা তা সহ্য করতে পারবে না।—বলিয়া ড্যাবডেবে চোখ দুইটার জ্বলন্ত দৃষ্টি, কলিকাতার রাস্তায় হোস-পাইপ হইতে যেমন করিয়া জল ছড়ায়, ঠিক তেমনই ভাবে সারা মজলিসের লোকগুলার উপরে বুলাইয়া দিল।

হারাণ উচ্চকণ্ঠে কহিল, নিশ্চয়। বিষবৃক্ষ তো কেটে ফেলতেই হবে। তা ছাড়া আশেপাশে যারা আছে, তাদেরও বাদ দিলে চলবে না।—বলিয়া আমার দিকে কটাক্ষ করিল।

ইহা যে আমাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইল, তাহা বুঝিলাম। তবু না বুঝিবার ভান করিয়া কহিলাম, নিশ্চয়, তাই তো করা উচিত। কিন্তু যারা কাটতে যাবে, তারাও যেন নিজেরা একটু সাবধান থাকে, কারণ—

রাধানাথ ও হারাণ একসঙ্গে ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, কি কারণ?

গাঙুলী মশায় আমাকে থামাইয়া দিয়া কহিলেন, থাম ভায়া। হারাণকে কহিলেন, তুমি থাম দেখি। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি ক'রো না। শুভকার্যের গোড়াতেই যদি এই গোলমাল হয় তো কোন কাজই হবে না। এখন সবাই মিলে পরামর্শ কর দেখি, কি ক'রে বুড়ীকে ঘর থেকে আনা যায়!

প্রবোধ গাঙুলীর মামা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, ঠিক কথাই বলেছেন,

বাজে কথায় সময় নষ্ট ক'রে লাভ কি ? একটা সংসারে সব লোক সমান হয় না, তা এ তো একটা সমাজ,—কেউ ভাল, কেউ মন্দ। যারা সমাজের মাথা, তাদের সব সামলে, সকলকে ভাল পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে।—বলিয়া হুঁকায় মুখ দিয়া মৃদু মৃদু টানিতে লাগিল।

রাধানাথ কহিল, সত্যিই তো। কার সঙ্গে কার তুলনা! শুনছ সব, কেমন দামী দামী কথা! একেই বলে—মাস্টার। না হ'লে যত সব—। বলিয়া আমার দিকে একটা দৃষ্টিশেল নিক্ষেপ করিল।

মাতুল মৃদু হাসিয়া কহিল, এ তো সাধারণ কথা। মাঝে মাঝে এক-একটা এমন কথা বলি, শুনে বড় বড় হাকিম পর্যন্ত হাঁ ক'রে থাকে, থই পায় না।

হারাণ কহিল, সত্যি, এই যা বলেছেন, তাই কি সবাই বুঝতে পেরেছে ? ঐ মাথার চামড়া পর্যন্ত, ভেতরে আর ঢোকে নি।

গাঙুলী মশায় কথাটা চাপা দিবার জন্য কহিলেন, তা হ'লে কি করা যাবে ? মাতুলকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, আপনি নিজে গিয়ে দেখা করবেন ?

মাতুল ঘন ঘন ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কহিল, পাগল! ও ম্লেচ্ছানীর বাড়িতে আমি পা দিই! আপনারা আমার কছে দিদিকে পৌঁছে দিন, তারপর যা করার আমি করব।

রাধানাথ সায় দিয়া কহিল, ঠিক তাই। আমাদের হাতে একবার পেলে, তার পরের ব্যবস্থা করার জন্যে কাউকে ভাবতে হবে না।

গাঙুলী মশায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাধানাথের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, হাতে এনে দেবে কে ? তুমিই যাও না।

রাধানাথ কহিল, আমার দ্বারা হবে না, এমনই তো আমার ওপর হাড়ে চ'টে আছে।

হারাণ কহিল, তা হ'লে মাস্টার চল, আমি বরং সঙ্গে যাচ্ছি।

সকলেই চীৎকার করিয়া উঠিল, সেই ভাল।

রাধানাথ ভ্রূ নাচাইয়া কহিল, তাই যাও হে। খুব তো ভাব দুজনে, বুঝিয়ে-শুঝিয়ে আনতে পারবে। তা ছাড়া একবার দেখাও হয়ে যাবে।

কহিলাম, না না। এসবের মধ্যে আমাকে টানবেন না।

রাধানাথ খ্যাঁক করিয়া উঠিল, মানে? সমাজে বাস কর না তুমি? এম. এ. পাস ক'রে হেড-মাস্টারি কর ব'লে কেউ তোমাকে রেয়াত করবে না; না যাও তো সামাজিক শাস্তি হবে।

গাঙুলী মশায়ের দিকে তাকাইলাম, তিনি কোন প্রতিবাদ না করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। বুঝিলাম, সরোজিনীর সহিত আমার ঘনিষ্ঠতার জন্য ইঁহার মনেও আমার প্রতি বিরুদ্ধ ভাব জমিয়া উঠিতেছে; সকলে যদি আমাকে সামাজিক শাস্তি দিবার সিদ্ধান্ত করে, তাহা হইলে ইনিও সায় দিতে ইতস্তত করিবেন না। ইহাই সমাজ। সমাজের সাধারণ ব্যক্তিদের কোন নিজস্ব মত ও পথ নাই; জনকয়েক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি জোট বাঁধিয়া যে পথ স্থির করে, বাকি সকলে ভেড়ার মত দল বাঁধিয়া সেই পথে তাহাদের পাছু পাছু চলিতে থাকে। কেহ যদি নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনা মত ভিন্ন পথে চলিবার চেষ্টা করে, সকলে টানাটানি করিয়া, তাড়না করিয়া, নিজেদের পথে আনিতে চেষ্টা করে; আনিতে না পারিলে তাহাকে একেবারে সমাজ-দেহ হইতে ছাঁটিয়া বাদ দেয়।

যাইতেই হইল। কিন্তু হারাণের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম। আর তো কেহ এ প্রস্তাব করে নাই! তাহারই মাথায় এই দুর্বুদ্ধি জাগিয়াছে। কাজেই তাহাকে পিছনে ফেলিয়া, লম্বা চালে চলিতে লাগিলাম। হারাণ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া, সঙ্গ লইয়া,

হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, মাস্টারের যে আর তর সইছে না দেখছি! চুপ করিয়া চলিতে লাগিলাম। হারাণ কহিল, চন্দ্রবদন দেখবার জন্যে যে একেবারে ঘোড়দৌড় শুরু করেছ! থমকিয়া দাঁড়াইলাম। হারাণ আঁতকাইয়া উঠিয়া কহিল, কি হে, সাপ নাকি?

কহিলাম, না। কিন্তু কোন ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে যা-তা বলতে তোমার লজ্জা হয় না? তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া হারাণ কহিল, ভদ্রমহিলা! দারোগা, কনেস্টবল থেকে আরম্ভ ক'রে গাঁয়ের ছেলে-ছোকরাগুলোর সঙ্গে পর্যন্ত—। বাধা দিয়া কহিলাম, দেখ হারাণ, তুমি একটি আস্ত পশু। আমি যাব না।—বলিয়া ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই হারাণ খপ করিয়া আমার হাত ধরিয়া কহিল, মাইরি আর কি! কেবল পালিয়ে যাবার মতলব! তোমাকে না নিয়ে আমি যাচ্ছি না।

রাগতস্বরে কহিলাম, ছেড়ে দাও আমাকে। তোমার সঙ্গে আমি তার কাছে যেতে পারব না। তোমার মুখের ঠিক নেই; হয়তো যা-তা ব'লে তাকে অপমান ক'রে বসবে। আর সে ভাববে, আমি তাকে অপমান করাবার জন্যে তোমাকে নিয়ে গেছি।

হারাণ মুচকি হাসিয়া কহিল, ভাবলেই বা হে। একটানা প্রেম কি ভাল? মাঝে-মাঝে রাগ-অভিমান না থাকলে প্রেমের কোন স্বাদ থাকে না। দুই বার বিবাহ করিয়া হারাণ প্রেমশাস্ত্রবিশারদ হইয়া উঠিয়াছে দেখিতেছি। কঠোরকণ্ঠে কহিলাম, আবার ঐসব কথা! ছেড়ে দাও আমার হাত, ছেড়ে দাও। হারাণ আমাকে জাপটাইয়া ধরিয়া কহিল, আরে, পাগল নাকি! কি আর বলেছি যে, এত রাগ! মাস্টার মানুষ কিনা, তাতেই। আমাকে বললে তো আমি সন্দেশ খাওয়াতাম।

হঠাৎ হাত কয়েক দূর হইতে টর্চের আলো গায়ে পড়িল এবং সঙ্গে

সঙ্গে কর্কশ হিন্দুস্থানী গলায় প্রশ্ন হইল, কে মারামারি করছ? হারাণ ঙুমাকে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। হিন্দুস্থানী লোকটা ডবল মার্চ করিয়া কাছে আসিয়া টর্চের আলো আমার মুখে ফেলিয়া বিস্মিতস্বরে কহিল, মাস্টারবাবু! আপনাকে মারছে এই লোকটা?—বলিয়া তাড়িয়া যাইতেই হারাণ কহিল, কনেস্টবল-সাহেব, আমি হারাণ। অনতিবিলম্বে যিনি আসিয়া হাজির হইলেন, তিনি স্বয়ং দারোগাবাবু। লজ্জিত হইয়া উঠিলাম, হারাণও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। দারোগাবাবু কহিলেন, আরে! মাস্টারমশায় যে! কন্‌স্টেব্‌লটা তখন হারাণের সামনে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে; দারোগাবাবু তাহাকে সামলাইবার জন্য কহিলেন, এই লছমন সিং, থাম। হারাণকে কহিলেন, হারাণবাবু কি মাস্টারমশায়ের সঙ্গে মারামারি করছিলেন নাকি? কি ব্যাপার? আপনারা গাঁয়ে দেখি যা-তা করতে আরম্ভ করেছেন!

হারাণ শঙ্কিতভাবে কহিল, আজ্ঞে না হুজুর। আমি মাস্টারকে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছিলাম।

কোথায়?

আজ্ঞে, ওর বাড়িতে।

তা, এত জাপটা-জাপটি করছিলেন কেন? মাস্টারমশায় তো আর কচি খোকা নন যে, কোলে তুলে নিয়ে যেতে হবে!

হারাণ কহিল, যেতে চাচ্ছিল না যে।

আমার দিকে তাকাইয়া দারোগাবাবু বিস্ময়ের স্বরে কহিলেন, বাড়ি যাবেন না কেন?

কহিলাম, আজ্ঞে, তা নয়, তা নয়। ওর সমস্ত—

হারাণ বাধা দিয়া কহিল, বাড়িতে ঝগড়া করেছে।

কহিলাম, মিথ্যে কথা।

হারাণ আমার কথা চাপা দিয়া কহিল ওর বউ আমাকে ডেকে পাঠিয়ে এখনই বললে, যেমন ক'রে হোক ওঁকে ধ'রে নিয়ে এস।

দারোগাবাবু সহাস্যে করিলেন, মাস্টারমশায়ের তো কপাল ভাল। দেখছি, রাগ করলে এখনও ডাকায়। আমাদের তো ফিরেই তাকায় না।

কন্‌স্টেব্‌লটা হাসিতে হাসিতে বলিল, আমাদের তো হুজুর বাপের বাড়ি চ'লে যায়। উল্টে রাগ ভাঙাতে জান হয়রান।

দারোগাবাবু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, চলুন।

চলিতে চলিতে বিনীতভাবে প্রশ্ন করিলাম, কোথায় চলেছেন?

দারোগাবাবু কহিলেন, মণীন্দ্রবাবু নিমন্ত্রণ করেছেন। অনেকদিন থেকেই বলছিলেন, আজকাল শরীরে এসব সহ্য হয় না ব'লে রাজি হই নি। আজ তাঁর বোন নিজের হাতে চিঠি লিখে নিমন্ত্রণ করলেন; ভদ্রমহিলার অনুরোধ না রাখা তো অত্যন্ত অভদ্রতা, কি বলুন?

হারাণ কনুই দিয়া গুঁতা মারিল; সামলাইয়া লইয়া কহিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ। তা ছাড়া আপনি তাদের যা উপকার করেছেন, তাতে নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়ানো শুধু নয়,—আপনার পায়ের কাছে প'ড়ে থাকা উচিত। আপনি না থাকলে—

দারোগাবাবু বিনয়সহকারে কহিলেন, ছিঃ, ওসব কথা বলবেন না। কি আর আমি বেশি করেছি? গ্রামের লোকের বিপদে-আপদে সাহায্য করা আমার কর্তব্য যে।

চলিতে লাগিলাম। দারোগাবাবু হঠাৎ কহিলেন, আপনাদের গ্রামটা কিন্তু ভাল নয়। আমি সাহায্য করেছি ব'লে গাঁয়ের লোক নাকি মণীন্দ্রবাবু আর তাঁর বোনকে বয়কট করেছে!

কহিলাম, আমি তো এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানি না, হারাণকে জিজ্ঞাসা করুন।

হারাণ সন্ত্রস্তভাবে কহিল, আজ্ঞে, আমিও কিছুই জানি না, আমাদের রাধানাথ—

দারোগাবাবু বাধা দিয়া কহিলেন, জানেন বইকি হারাণবাবু। মীটিং করেছেন, বোনকে বাড়ি পাঠিয়ে অপমান করিয়েছেন, সম্পত্তি নেবার জন্যে এক মামা আমদানি করেছেন।

হারাণ আর্তকণ্ঠে কহিল, আজ্ঞে, আমি কিছুই জানি না, মা কালীর দিব্যি বলছি।

লছমন সিং কড়া গলায় হাসিয়া উঠিয়া কহিল, হারাণবাবু সব জানেন।

প্রবোধ গাঙুলীর বাড়ির কাছে আসিয়া দেখিতে পাইলাম, বাড়ির সামনে মণীন্দ্র লণ্ঠন হাতে দাঁড়াইয়া আছে, পাশে তিনকড়ি। মণীন্দ্র কতকটা আগাইয়া আসিয়া কৃতার্থম্মন্যতার হাসি হাসিয়া কহিল, আসুন আসুন। সরোজিনী অস্থির হয়ে গেছে—। হঠাৎ আমাকে দেখিতে পাইয়া কহিল, কে, মাস্টার নাকি? কোত্থেকে জুটলে হে?

কহিলাম, জুটি নি, এমনই বাড়ি চলেছি।

দারোগাবাবু কহিলেন, উনি রাগ ক'রে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছেন, হারাণবাবু ধ'রে নিয়ে যাচ্ছেন।

হারাণের নাম শুনিয়া মণীন্দ্র গম্ভীর হইয়া কহিল, আসুন, আসুন। তিনুকে কহিল, তিনু, সরোজকে খবর দাওগে। আমাকে কহিল, মাস্টার, তুমিও এস হে।—বলিয়া আগাইয়া চলিল। বাড়ির সামনে আসিতেই দারোগাবাবুকে কহিলাম, নমস্কার, আমরা আসি তা হ'লে।

দারোগাবাবু খপ করিয়া আমার হাত ধরিয়া কহিলেন, বিলক্ষণ! যাবেন কোথায়?

হাঁকিয়া কহিলেন, মণীন্দ্রবাবু, মাস্টারমশায় পালিয়ে যাচ্ছেন।

মণীন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, মাস্টার, খবরদার বলছি। সরোজ জানতে পারলে ঘাড়ে ধ'রে টেনে নিয়ে আসবে।

হারাণের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, অপমানে ও বোধ করি হিংসায় মুখটা কালো হইয়া উঠিয়াছে। হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, দারোগা-বাবু, আমি তা হ'লে আসি, নমস্কার।

দারোগাবাবু কহিলেন, ও মণীন্দ্রবাবু, হারাণবাবু অভিমান করছেন যে, ওঁকেও ডাকুন।

মণীন্দ্র কহিল, ডাকলেও ওর কি আসা চলবে ? জাত যাবে যে।

সরোজিনী আসিয়া হাজির হইল। পাউডারের প্রলেপে মুখখানি অতিরিক্তভাবে সাদা দেখাইতেছে ; কেশে সদ্যপ্রসাধনের চিহ্ন পরিস্ফুট, পরিধানে আজ আর গরদের থান নয়. এক ইঞ্চি কালাপাড় শান্তিপুরে ধুতি। হাতে চার গাছি করিয়া চুড়ি, আসিতেই এসেন্সের সুমিষ্ট গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়া উঠিল। সরোজিনী যুক্তকরে নমস্কার করিবা-মাত্র দারোগাবাবু বিগলিতপ্রায় হইয়া উঠিয়া কহিলেন, ভাল আছেন ?

সরোজিনী মারাত্মক মুচকি হাসি হাসিয়া কহিল, আসুন।

হারাণ পিছনে দাঁড়াইয়া সরোজিনীর দিকে, হঠাৎ সামনে কিছু একটা দেখিলে যেমন করিয়া লোকে তাকায়, ঠিক তেমনই করিয়া তাকাইয়া রহিল। কিন্তু হারাণের দোষ কি ? গাঙ্গুলী মশায়ের বাড়িতে যেদিন প্রথম সরোজিনীকে দেখিয়াছিলাম, হয়তো অমনই করিয়া তাকাইয়া ছিলাম। যাহাকে এতটুকু কুঁড়ি অবস্থায় দেখিয়াছেন, তাহাকে যদি হঠাৎ রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ-প্রাচুর্যে সহস্রদল-মেলা বিকশিত অবস্থায় চোখের সামনে হাজির হইতে দেখেন, তাহা হইলে আপনারাও আমাদের মত এমনই করিয়াই তাকাইয়া থাকিবেন। তবে হারাণের মত বেহুঁশ হইয়া তাকাইবেন না। একটুখানি হুঁশ রাখিবেন।

মণীন্দ্র কহিল, তোমার মাস্টার এসেছে যে।

সরোজিনী পরম আত্মীয়তার সুরে কহিল, তাই নাকি! কই? আগাইয়া আসিতেই আমাকে দেখিতে পাইয়া একেবারে আমার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া ঠিক নিজের ছোট বোনের মত আবদারের সুরে কহিল, দাদা, অন্ধকারে সকলের পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন যে? কহিলাম, বাড়ি যাচ্ছিলাম, দারোগাবাবু ধ'রে নিয়ে এলেন।

সরোজিনী দুই চোখ ডাগর করিয়া কহিল, ওঃ! তাই নাকি! না হ'লে আসতেন না!—বলিয়া কৃত্রিম অভিমানে অধর স্ফুরিত করিল। মণীন্দ্র দারোগাবাবুকে কহিল, আসুন আসুন, ওরা আসছে পরে। দারোগাবাবু এতক্ষণ সরোজিনীর দিকে তাকাইয়া থাকিয়া তাহার রূপ-সুধা পান করিতেছিলেন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্থান ত্যাগ করিলেন। রহিলাম আমি, হারাণ আর সরোজিনী।

মণীন্দ্র বাড়ির ভিতর হইতে হাঁক দিয়া কহিল, মাস্টারকে ধ'রে নিয়ে এস।

সরোজিনী আমার ডান হাতটা ধরিয়া কহিল, চলুন। কহিলাম, একজন ভদ্রলোককে নেমন্তন্ন করেছ, তার মধ্যে আমার যাওয়াটা—

সরোজিনী বাধা দিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, আপনাকে আবার নেমন্তন্ন করতে হবে নাকি? কহিলাম, তাই বলছি নাকি! কতদিন খেয়ে গেছি যে! তবে আজ শরীরটা খারাপ, রাত্রে কিছু খাব না ভাবছি, আজকের দিনটা আমাকে রেহাই দাও।

সরোজিনী শান্তকণ্ঠে কহিল, বেশ, না খান তো ওখানে গিয়ে বসবেন চলুন।

হারাণকে দেখাইয়া কহিলাম, একে চেন না?

সরোজিনী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না তো।

কহিলাম, আমাদের হারাণ, ওই যে পদ্ম, তার দাদা।

সরোজিনী এক মুহূর্তে মুখ আঁধার করিয়া কহিল, চিনতে পেরেছি। উনি আমার আপনার লোক, কিন্তু কোন দিন তো খবর নেন না। বরং বোনকে পাঠিয়ে অপমান করান।

হারাণ প্রতিবাদ করিয়া কহিল, কই, না।

সরোজিনী তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিতে লাগিল, ওঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী আমার সম্পর্কে দিদি; তাঁর মা আমার খুড়ীমার সাক্ষাৎ খুড়তুতো বোন। তাঁকে নিজের চোখে কোন দিন দেখি নি, বিয়ের সময়ে মার কাছে তাঁর কথা শুনেছিলাম। কিন্তু আর দেরি করবেন না, ওঁরা সব ব'সে রয়েছেন, আসুন। আপনিও আসুন হারাণবাবু।

হারাণ টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, আমাকে আর কেন? মানে, আমার আবার একটুখানি কাজ—

সরোজিনী কহিল, কাজ থাক্; আপনাকে আসতেই হবে। না হ'লে, ছোট শালী, জানেন তো! এমন ক'রে টেনে নিয়ে যাব যে—। বলিয়া হাত বাড়াইবার উপক্রম করিতেই হারাণ শশব্যস্ত হইয়া কয়েক পা পিছাইয়া কহিল, না না, যাচ্ছি।

উঠানে চেয়ার ও টেবিল পাতিয়া, বসিবার ও বোধ হয় খাইবারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। টেবিলটি একটি ধবধবে সাদা টেবিল-ক্লথ দিয়া ঢাকা। তাহা ছাড়া একটি টুল ও একটি বেঞ্চি রহিয়াছে। ইতিমধ্যে দারোগাবাবু একটি চেয়ার দখল করিয়াছেন; মণীন্দ্র লণ্ঠনটি টেবিলের উপরেই রাখিয়া পাশে দাঁড়াইয়া আছে; লছমন সিং অদূরে টুলে উপবিষ্ট। আমাদিগকে দেখিয়া দারোগাবাবু কহিলেন, বসুন আপনারা। হারাণবাবু, আসুন, বসুন এখানে।—বলিয়া নিজের পাশের চেয়ারটা

দেখাইলেন। হারাণ আসিয়া চেয়ারে বসিল, আমিও আর একটা চেয়ারে বসিলাম। দারোগাবাবু মণীন্দ্রকে কহিল, আপনি দাঁড়িয়ে থাকলেন কেন ?

মণীন্দ্র সবিনয়ে কহিল, আজ্ঞে, আজ্ঞে, আমার কি বসলে চলে ? এত বড় অতিথি আমার বাড়িতে !—বলিয়া সরোজিনী ও তিনকড়ির পাছু-পাছু রান্নাঘরের দিকে চলিল। চেয়ার হইতে উঠিয়া ডাক দিয়া কহিলাম, মনুদা, শোন।

মণীন্দ্র থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কি ?

উঠিয়া কাছে গিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলাম, আমাকে খেতে-টেতে দিও না।

মণীন্দ্র প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, পাগল নাকি !

ত্রস্তকণ্ঠে কহিলাম, চুপ কর, আস্তে কথা বলতে জান না নাকি ?

মণীন্দ্র মৃদুকণ্ঠেই কহিল, কি, বল ?

কহিলাম, আমি কিছু খাব না, শরীর খারাপ, সরোজিনীকে বলেছি। হারাণকেই শুধু খেতে দাও দারোগাবাবুর সঙ্গে।—বলিয়া চক্ষের ইঙ্গিতে উদ্দেশ্যটা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম।

মণীন্দ্র বুঝিয়া, পুলকিত হইয়া কহিল, ঠিক, হেরোকে জব্দ করতে হবে ; কিন্তু তুমি কিছুই খাবে না ? দুখানা লুচি আর মিষ্টি—

কহিলাম, না না, থাক্, পরে একদিন খাব এখন।

কাছে আসিতেই দারোগাবাবু বলিলেন, কি কথা হচ্ছিল ?

কহিলাম, শরীরটা খারাপ কিনা, তাই আমার জন্যে খাবার আনতে মানা ক'রে দিলাম। শুধু হারাণের জন্যে—

হারাণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া কহিল, বাঃ রে ! আমারও পেটের অসুখ, কদিন কিছু খাচ্ছি না।

কহিলাম, তোমার আবার পেটের অসুখ হ'ল কখন? এই তো সকালে তেলে-ভাজা খাচ্ছিলে দোকানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এটি হারাণের অনেকদিনের অভ্যাস, আজ অবশ্য চোখে দেখি নাই, আন্দাজে ঢিল ছুঁড়িলাম।

হারাণ বলিয়া উঠিল, তেলে-ভাজা তো সকালে খাই, রাত্রে কিছু খাই না।

দারোগাবাবু হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, হারাণবাবুর জাতটা নেহাত গেল দেখছি আজ, ম্লেচ্ছের পাশে ব'সে—

হারাণ শশব্যস্ত হইয়া কহিল, সে কি হুজুর? আপনার থানায় ব'সে কতদিন খেয়েছি যে!

দারোগাবাবু গম্ভীর মুখে কহিলেন, সে ক'বে কি খেয়েছেন মনে নেই।—বলিয়া কৃত্রিম অভিমানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

হারাণ কহিল, বেশ, আজও খাব তা হ'লে। মাস্টার, ব'লে দাও।

হাঁকিয়া মণীন্দ্রকে জানাইয়া দিলাম।

তিনকড়ি ও মণীন্দ্র দুইজনে খাদ্যদ্রব্য আনিয়া হাজির করিল। হরেক রকমের খাবার—লুচি, তরকারি, মাংসের কালিয়া, চপ, কাট্‌লেট, ক্ষীর, সন্দেশ, দই ইত্যাদি। বুঝিলাম, সরোজিনী সব নিজহস্তে তৈয়ারি করিয়াছে। না হইলে ফুটি—অনেক খাবার জীবনে দেখে নাই, তৈয়ারি করিবে কি!

হারাণ করুণ চক্ষে আমার দিকে তাকাইয়া কহিল, মাস্টার, তা হ'লে খাই? অসুখ-বিসুখ হ'লে খবর নিও।

মনু কহিল, কিছু ভয় নেই, অসুখ কেন, ম'লেও খবর নেবার লোকের অভাব হবে না। তিনকড়ি সব ভার নেবে বলেছে।

হারাণ তাহার দিকে কটমট করিয়া তাকাইল।

দারোগাবাবুও আশ্বাস দিয়া কহিলেন, কিছু ভয় নেই হারাণবাবু। সরোজিনী দেবীর নিজের হাতে তৈরি খাবার খেয়ে ম'লেও স্বর্গে যাবেন। সরোজিনী আসিয়া কাছে দাঁড়াইল।

দারোগাবাবু সসম্মানে কহিলেন, বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

মণীন্দ্র শশব্যস্ত হইয়া কহিল, ব'স তুমি, দারোগাবাবু এত ক'রে বলছেন। আমাকে কহিল, তুমিও ব'স না মাস্টার। দুইজনে বসিলাম।

মণীন্দ্র কহিল, সব সরোজ নিজের হাতে রেঁধেছে।

দারোগাবাবু ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, তা আর বলতে হবে না, জিবে টের পাচ্ছি, তাই তো হারাণবাবুকে বলছিলাম।

সরোজিনী মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কি?

দারোগাবাবু কহিলেন, উনি খেতে ভয় করছিলেন।

সরোজিনী শ্লেষের সহিত কহিল, ভয় কিসের হারাণবাবু? দারোগা-বাবু খাচ্ছেন। তবে জাত যাবার ভয় হতে পারে বটে, আমরা তো জাতে পতিত কিনা।

হারাণ ভরাট মুখে কহিল, না না। পেটে হাত দিয়া জানাইল, অসুখ।

কহিলাম, অসুখ তো বটে, সাঁটছ তো মন্দ নয়। তিনকড়ি হাসিয়া উঠিল। হারাণ তাহার দিকে কটমট করিয়া তাকাইতেই তিনকড়ি হাসি বন্ধ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

দারোগাবাবু কহিলেন, মাস্টারমশায়ের কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে, ওঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। সরোজিনী আমার মুখের দিকে সপ্রশ্ন মুখে তাকাইতেই দারোগাবাবু কহিলেন, উনি বাড়ি থেকে রাগ ক'রে এসেছেন, হারাণবাবু ধ'রে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

সরোজিনী কহিল, তাই নাকি! বউদিদির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?

তা হ'লে আজ বোনের বাড়িতেই রাতটা কাটিয়ে যান দাদা। বউদিদি একটু জব্দ হোক।

দারোগাবাবু বিস্ময়ের সহিত কহিলেন, মাস্টারমশায় আপনার দাদা নাকি?

ঘাড় নাড়িয়া ছেলেমানুষির স্বরে সরোজিনী কহিল, হুঁ, নিজের দাদার চেয়েও ঢের বেশি। হারাণ খাওয়া বন্ধ করিয়া সরোজিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। সরোজিনী তাহার দিকে তাকাইতেই মুখ নামাইয়া আবার খাইতে শুরু করিল।

সরোজিনী তাহার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, হারাণবাবুও আমার দাদা, আমার জামাই-দাদা।

দারোগাবাবু অধিকতর বিস্মিত হইয়া কহিলেন, সত্যি! তবে যে হারাণবাবু আপনার বিপক্ষদলে দাঁড়িয়েছেন!

হারাণ কহিল, আজ্ঞে, আমি তো কোন দলে নেই। লছমন সিং এতক্ষণ নির্বাকভাবে সব শুনিতেছিল; সে এখানে বসিয়া কিছু খাইতে রাজি হয় নাই, বাড়ি যাইবার সময় কিছু লুচি ও মিষ্টি সঙ্গে লইয়া যাইবে; হারাণের কথা শুনিয়া স্বাভাবিক কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, হারাণবাবু সব দলেই আছেন।

হারাণ কাঁচুমাচু মুখে চুপ করিয়া রহিল। সরোজিনী কথাটা চাপা দিয়া কহিল, ওঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী আমার দিদি, আমার খুব আপনার লোক উনি।

দারোগাবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, সবাই আপনার নিজের লোক দেখছি, আমিই শুধু পর।

মণীন্দ্র কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। সরোজিনী কি কথা বলিতে যাইতেছিল, তাহার কথা লুফিয়া লইয়া কহিল, আপনি আমাদের

সকলের চেয়ে আপনার। যা করেছেন আপনি! আপনি না থাকলে সব এতদিন ভূত-ভোজন হয়ে যেত।

সরোজিনী কহিল, সত্যি, আপনি না থাকলে, কি যে হ'ত আমার! হয়তো—। বলিতে বলিতে কণ্ঠ অশ্রুজড়িত হইয়া উঠায় বক্তব্য শেষ করিতে না পারিয়া, বোধ করি, অশ্রু গোপন করিবার জন্য মাথা নত করিল।

দারোগাবাবু তাহার দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বীরবিক্রমে বলিয়া উঠিলেন, আপনি কিছু ভাববেন না, আমি সব এমনই টিট ক'রে দিয়ে যাব যে, আপনি এখানে না থাকলেও আপনার জমিদারি ঠিকমত চ'লে যাবে।

সরোজিনী নত-মস্তকে থাকিয়াই কোনমতে কহিল, আপনার দয়া।

মণীন্দ্র আগাইয়া আসিয়া যুক্তহস্তে কহিল, তাই ক'রে দিন দারোগা-বাবু। সরোজিনী যদি কখনও তীর্থে-টীর্থে গিয়েও থাকে, তা হ'লে যেন আমি একাই জমিদারি চালিয়ে দিতে পারি।

খাওয়া-দাওয়ার পর দারোগাবাবুর সঙ্গেই আমরা বাহির হইয়া আসিলাম। সরোজিনীও বিদায় দিবার জন্য রাস্তা পর্যন্ত আসিতে উদ্যত হইয়াছিল।

দারোগাবাবু তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, থাক্ থাক্, আপনাকে আর যেতে হবে না। এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি। আপনার হাতের খাবার খাইয়ে লোভ বাড়িয়ে দিলেন আজ। হয়তো মাঝে মাঝে বিরক্ত করতে আসব।

মণীন্দ্র কহিল, বিরক্ত! বলেন কি? আপনার পায়ের ধুলো পড়লে কৃতার্থ হয়ে যাব আমরা।

কায়দামত বিদায় লইয়া দারোগাবাবু কহিলেন, মাস্টারমশায়,

আর দেরি করবেন না। হাসিয়া কহিলেন, হারাণবাবু আজ ম্লেচ্ছের সঙ্গে ব'সে খেয়েছেন, খবরটা গাঙ্গুলী মশায়কে দিয়ে দেবেন।—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

মণীন্দ্রর কাছে বিদায় লইয়া চলিতে উদ্যত হইয়াছি, এমন সময় তিনকড়ি আসিয়া খবর দিল, দিদি ডাকছেন। প্রশ্ন করিলাম, কাকে? তিনকড়ি হারাণের উদ্দেশে চক্ষের ইঙ্গিত করিল।

হারাণ সবিস্ময়ে কহিল, আমাকে?

তিনকড়ি চলিয়া যাইতে যাইতে কহিল, হুঁ।

হারাণ পুলকিত হইয়া উঠিয়া কহিল, দাঁড়াও হে মাস্টার, কি বলছে শুনে আসি, যাই হোক শালী তো!—বলিয়া চলিয়া গেল।

অন্ধকারে একা দাঁড়াইয়া রহিলাম, কিন্তু মনের কোণে একটি ছোট ঈর্ষার কাঁটা খচখচ করিতে লাগিল। আমি যে অছিলা করিয়া খাইলাম না, তাহা বুঝিয়াও সরোজিনী আমাকে আর একবারও খাইতে অনুরোধ করিল না, আর ওদিকে হারাণকে পেট পুরিয়া খাওয়াইয়াও আবার ডাকাডাকি! আজ আমার চেয়েও হারাণ হইল তাহার আপনার! অথবা ইহা হয়তো সরোজিনীর চাল। স্নেহ-শ্রদ্ধা কিছুই সে কাহাকেও করে না, যাহা করে তাহা স্বীয় কার্যোদ্ধারের জন্যই করে। দারোগার সামনে অভাগিনী অসহায়া বিধবাসুলভ অশ্রুছলছল ভাব, আমার বুকের কাছে ঘেঁষিয়া ছোট বোনের মত আদুরে আবদার, এবং হারাণের সঙ্গে শ্যালিকাসুলভ সরস আত্মীয়তা, সবই তাহার পোজ। দ্রুতপদে হারাণ আসিয়া হাজির হইল। মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল, যেন রাজ্য-জয় করিয়া ফিরিতেছে। কহিলাম, কি বললে হে?

হারাণ গম্ভীর মুখে কহিল, ওসব গোপন কথা। কাউকে বলতে মানা করলে।

চুপ করিয়া গিয়া চলিতে শুরু করিলাম ; কিছুক্ষণ পরে কহিলাম, সরোজিনীকে ওর শাশুড়ীর কথা কিছু বললে ? হারাণ চিন্তা-সাগরে বোধ করি ডুব-সাঁতার দিতেছিল ; হঠাৎ মাথা তুলিয়া কহিল, কি ? বক্তব্য পুনরাবৃত্তি করিলাম।

হারাণ কহিল, পাগল নাকি ! আমি তোমাদের ওসবের মধ্যে আর নেই।—বলিয়া আবার ডুব দিল। আবার ডাক দিয়া কহিলাম, গাঙুলী মশায়কে কি বলবে ? হারাণ জবাব দিল না। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, ইঃ, সমস্ত শরীরটা এখনও সিরসির করছে মাইরি ! থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, কি হ'ল হে ?

হারাণও থমকিয়া কহিল, সে এক ব্যাপার ! কাউকে না বল তো বলি।

ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, পাগল ! আমি তোমার কোন কথা কাউকে কখনও বলেছি ?

হারাণ আমার হাত ধরিয়া রাস্তার এক পাশে টানিয়া লইয়া গিয়া কহিল, তবে শোন, তিনকড়ির পিছু পিছু তো গেলাম, গিয়ে দেখি মণীন্দ্র খেতে বসেছে, কিন্তু সরোজিনী নেই। তিনু বললে, বোধ হয় ওপরে আছেন। মনুও বললে, ওপরে আছে, যাও। আমি দোতলায় গেলাম, প্রথম ঘরটা তালাবন্ধ, মাঝের ঘরটা দেখি খোলা, কিন্তু অন্ধকার, ভেতরে ঢুকতেই কে বললে, কে ? আমি বললাম, আমি হারাণ। সরোজিনী বললে, আপনি জামাইবাবু ! তারপর—ওঃ, এখনও গাটা কেমন করছে ! সরোজিনী আমার গায়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে, জড়িয়ে ধ'রে, বুকে মাথা রেখে চাপা গলায় কেঁদে উঠল, জামাইবাবু, আপনি দিদিকে একেবারে ভুলে গেছেন ? অভাগিনী ছোট শালীটার দিকে একবারও তাকাচ্ছেন না ? আমার যে আপনি ছাড়া এখানে

সত্যিকার আপনার বলতে কেউ নেই জামাইবাবু! কি ব্যাপার দেখ দেখি ভাই! আমি তো কোনমতে ছাড়িয়ে—

হারাণের উপর কেন যেন রাগ হইয়া গেল, কড়া গলায় কহিলাম, মিথ্যে কথা। তুমি ছাড়াবার চেষ্টা কর নি।

হারাণ টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, তা করি নি, ও-ই নিজে ছেড়ে দিয়ে, সামনে দাঁড়িয়ে মুখে আঁচল দিয়ে কাঁদতে লাগল। কি করি ভাই! মুখ থেকে আঁচল ছাড়িয়ে কান্না বন্ধ করবার জন্যে বললাম, কেঁদো না, তোমার কোন ভাবনা নেই। গাঁয়ের যে যাই করুক, আমি তোমার ধারেই থাকব। বলতেই সে কান্না থামিয়ে বললে, আপনি কিন্তু দিনে একবার ক'রে খবর নিয়ে যাবেন। বললে, ভগ্নীপতি আপনি, স্বামীর পরেই তো আপনার স্থান। কি কথা শোন দেখি ভাই! বুকটা আমার এখনও ধড়ফড় করছে, দেখ।—বলিয়া আমার হাতটা টানিয়া বুকে চাপিয়া ধরিল।

হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিলাম, তবে আর কি! এ পক্ষের বউকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে প্রবোধ গাঙ্গুলীর গদিতে ব'সে যাও এবার।

হারাণ কহিল, দূর! তোমার যেমন কথা! ছোট বোনের মত। কিন্তু তুমি ভাই কাউকে এ কথা ব'লো না। তা ছাড়া আমি যে খেলাম, তাও কাউকে ব'লো না।

কহিলাম, সেজন্যে তোমার চিন্তা নেই, ও খবর যাতে গাঁয়ের সবাই জানতে পারে, মন্টু চক্রবর্তী তার ব্যবস্থা করবে।

হারাণ চিন্তিত হইয়া উঠিয়া কহিল, সত্যি। একটু পরেই একটা কিছু সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়া কহিল, করুকগে। আমি কাউকে ভয় করি না। আমি আর তোমাদের দলাদলিতে নেই তো আর কাকে ভয়?

কহিলাম তা হ'লে গাঙ্গুলী মশায়কে ব'লে এস, তুমি আর এসবে নেই।

হারাণ বেপরোয়াভাবে কহিলাম, দায় পড়েছে। তুমি ব'লে দিও। আরও ব'লে দিও, আমি সরোজিনীর দলে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমি সরোজিনীকে ব'লে দিয়ে এসেছি, তাকে ভুলিয়ে তার শাশুড়ীকে নিয়ে যেতে গাঙ্গুলী মশায় তোমাকে পাঠিয়েছিল, আমাকে তুমি ধ'রে নিয়ে এসেছিলে। আমি থমকিয়া দাঁড়াইয়া বিরক্ত স্বরে কহিলাম, তুমি তো আচ্ছা মিথ্যেবাদী! এ কথা তুমি বললে কি ক'রে?

হারাণ হাসিতে হাসিতে কহিল, তা আর কি করব? নিজের ঘাড়ে দোষ নোব নাকি?

রাগিয়া উঠিয়া কহিলাম, বেশ। আমিও এর শোধ নোব। কনে-বউকে সব ব'লে দোব।

হারাণ থমকিয়া দাঁড়াইয়া ডান হাতের তর্জনীটি আমার মুখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া বীরদর্পে কহিল, সাবধান মাস্টার, এসব কর তো ভাল হবে না বলছি।

কহিলাম, তুমি আমার সম্বন্ধে এ কথা বললে কেন?

হারাণ হাসিয়া উঠিয়া কহিল, মিথ্যে কথা। তুমি কি কর দেখছিলাম। কিছুই বলি নি। তুমিও যেন কাউকে বলতে যেও না। ডুবে ডুবে দুজনে জল খাব আমরা, কাউকে জানাবার দরকার কি?

১১

পরদিন সকালে বৈঠকখানার দাওয়ায় দাঁড়াইয়া ছিলাম। শেষ-রাত্রি হইতে প্রবল বৃষ্টি নামিয়াছিল; অবিশ্রান্ত কয়েক ঘণ্টা বর্ষণের পর এখন ঝিরঝির করিয়া পড়িতেছিল। আকাশে কিন্তু এখনও মেঘ থমথম করিতেছিল, কাজেই আশা করিতেছিলাম, যদি নয়টা-দশটার সময়ে আবার বর্ষণ শুরু হয় এবং ঘণ্টাখানেক ধরিয়া চলে তো আজ রেনি-ডের জন্য স্কুল বন্ধ করিয়া দিব। হঠাৎ দেখিলাম, ছাতা-মাথায় হারাণ হনহন করিয়া আসিতেছে। হারাণ তো এত সকালে কোন দিন উঠে না! হঠাৎ ব্যাপার কি! বাড়িতে কনে-বউয়ের কোন অসুখ-বিসুখ নয় তো! কাছে আসিতেই উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করিলাম, কি হে, এত সকালেই?

হারাণ ছাতাটা সশব্দে বন্ধ করিয়া সিঁড়িতে পা ঝাড়িতে ঝাড়িতে কহিল, মন্টুদার কাছে গিয়েছিলাম, কাউকে কিছু বলতে মানা করলাম।

রাজি হ'ল মন্টুদা? আর রাজি হ'লেও—

হারাণ কহিল, না, কাউকে আর বলবে না। আমি যে ওদের দলে, তা আমি ওকে বিশ্বেস করিয়ে এসেছি।

কহিলাম, কি ক'রে?

এদের দলের দু-চারটে গোপন কথা ফাঁস ক'রে দিয়ে। সরোজিনীর শাশুড়ীকে যে ওরা বার ক'রে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, তাও ব'লে দিয়ে এসেছি।

আমার নামে মিথ্যে ক'রে কিছু লাগাও নি তো?

পাগল! তা আবার লাগাতে পারি! কিন্তু যাক ওসব কথা, একটু চা খাওয়াও দেখি।—বলিয়া ঘরে আসিয়া চেয়ারে বসিল। আমি

বাড়ির ভিতরে গিয়া চায়ের জন্য বলিয়া ফিরিতেই হারাণ কহিল, কাল সারারাত চোখে-পাতায় করি নি।

চেয়ারে বসিয়া কহিলাম, কেন হে?

বিরক্তিতে সারামুখ কুঞ্চিত করিয়া হারাণ কহিল, কনে-বউয়ের ঘ্যানঘ্যানানি। রাত্রেতে বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হ'লই, তার ওপর কিছু খেতেও পারলাম না। তা কনে-বউ এমনই যা করুক, বোঝালে বোঝে, আর বুঝিয়েও এনেছিলাম খানিক।

কি ক'রে?

বললাম, গাঙ্গুলী মশায়ের বাড়িতে মজলিস ছিল, রাত হয়ে গেল ব'লে না খাইয়ে ছাড়লেন না।

তারপর?

তারপর, আমাদের সেই ফেউটি আছেন তো—পদ্ম পোড়ামুখী! সেই ধরিয়ে দিলে সব—

ও জানলে কি ক'রে?

জানবে না কেন? গাঙ্গুলী মশায়ের বাড়িতে কাল গিয়েছিল যে। আমি আর তুমি যে প্রবোধ গাঙ্গুলীর বাড়ি গিয়েছিলাম, তা ও দেখে এসেছিল।

তা হ'লে বউ সব জানতে পেরেছে বল।

অত্যন্ত করুণ মুখে উপরে ও নীচে ঘাড় নাড়িয়া হারাণ কহিল, হ্যাঁ, সে এক রকম জানাই। তবে আমি বলেছি, দারোগার ওখানে খেয়ে এসেছি, তুমিও সঙ্গে ছিলে। বউ বিশ্বেস করে নি বোধ হয়।

কি বললে বউ?

যৎপরোনাস্তি গালাগালি করলে—হাড়ী, ডোম, ম্লেচ্ছ, মায় কুকুর পর্যন্ত। তারপর বিছানায় শুতে দিলে না; মেঝেতে মাদুর পেতে

শুলাম তো বিছানায় ব'সে ফোঁস-ফোঁস ক'রে কাঁদতে লাগল ; ভুলোবার জন্যে বিছানায় উঠতে গেলাম তো তড়াক ক'রে নেমে বাইরে বেরিয়ে গেল ; বাইরে গেলাম তো ভেতরে ঢুকে দড়াম ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। তারপর সারারাত্রি ধ'রে দরজা-ঠেলাঠেলি। বিশ্বেস তো নেই ! যা রাগ ! হয়তো গলায় দড়ি দেবে। কিছুতেই খুললে না। শেষ-রাত্রে বৃষ্টি নামল ; তার সঙ্গে সঙ্গে ঝড় ; বৃষ্টির ছাটে ভিজে সপসপে হয়ে সারারাত্রি দরজা-গোড়ায় ব'সে কাটালাম।

পদ্ম কি করলে ?

রাগে দাঁত কিড়মিড় করিয়া কহিল, ওদের মা-বেটাকে আমি ঘর থেকে বার করব। রাতদিন বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া কচকচি, চালে কাক বসতে দেয় না। ও-ই তো বউয়ের মেজাজ খারাপ ক'রে দেয়। না হ'লে বউ খারাপ লোক নয়।

শিকল ঝনঝন করিয়া উঠিল। বুঝিলাম, সিগ্‌ন্যাল পড়িল, পত্নী চা-হস্তে দ্বারান্তরালে সমুপস্থিত। ত্বরিতপদে কাছে গিয়া দুই হাতে দুই পেয়ালা ধূমায়মান চা লইয়া আসিতেই হারাণ আগ্রহের সহিত হাত বাড়াইয়া কহিল, দাও। পেয়ালাটা লইয়াই গরম চায়ে এক চুমুক দিয়া মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, গরম। তারপর সতর্কভাবে দুই-চারিবার চুমুক দিয়া কহিল, ভারি আরাম হ'ল ভাই। বউদিদির হাতের চা চমৎকার ! যেমন রঙ, তেমনই স্বাদ ! আমার বাড়ির চা যেন আলকাতরা, খেতে গেলে কান্না পায়।

কহিলাম, পদ্মর ছেলে তো এখন চাকরি করছে ?

ঘাড় নাড়িয়া হারাণ কহিল, করছে তো। সরকারী ডাক্তারখানায় কম্পাউণ্ডারি করে। পনরো টাকা ক'রে মাইনে পায়। তবে আজ পর্যন্ত একটি পয়সাও ঠেকায় নি, মা-ই সব জমাচ্ছেন। ডাইনীটার

কুচুটে বুদ্ধি তো কম নয়। তাই তো কনে-বউ বলে, অনেক দিন তো করলাম আমরা ; এর পর ছেলে মানুষ হয়েছে, স'রে পড়লেই হয়, ঘরও তো দিচ্ছি, আমাদের বামুন-ডোবার পাশে প'ড়ো বাড়িটা, একটু সারিয়ে-সুরিয়ে নিলেই চলবে ; তা ডাইনী কিছুতে নড়তে চাইছে না। বলতে গেলেই ঝগড়া।

ভায়া আছ নাকি ?—বলিয়া মণীন্দ্র হাজির হইল। হাতের সপসপে ভিজা ছাতাটা সুদ্ধ ঘরে ঢুকিতেই কহিলাম, ছাতাটা বাইরে রেখে এস মনুদা! মণীন্দ্র থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, দেখ মাস্টার, কার সঙ্গে কেমন ক'রে কথা বলতে হয় শিখে রেখো, যাকে বলে—

বাধা দিয়া ধমকের সুরে কহিলাম, শিখব এখন, তুমি ছাতাটা রেখে এস তো।

মণীন্দ্র এক মুহূর্তে নরম হইয়া কহিল, রাখছি, রাখছি, রাগ কিসের ? —বলিয়া ছাতাটা বাহিরে রাখিয়া, ঘরে আসিয়া কহিল, চা খাচ্ছ নাকি ? আমার জন্যে এক কাপ ব'লে দাও দেখি। হারাণকে লক্ষ্য করিয়া মুরুব্বিয়ানার সহিত কহিল, দেখ হারু, সমঝে চলাফেরা ক'রো। যার-তার সঙ্গে মিশো না। কতবড় একটা ঘরের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক, সব সময়ে খেয়াল রেখো।

হারাণ চুপ করিয়া রহিল। মণীন্দ্র গম্ভীরভাবে কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া পা দুইটি দোলাইতে লাগিল।

এক পেয়ালা চা লইয়া ফিরিয়া আসিয়া মণীন্দ্রর সামনে নামাইয়া দিয়া কহিলাম, কি হ'ল ? মণীন্দ্র চায়ে চুমুক দিয়া কহিল, কিছু না, হারাণকে সাবধান ক'রে দিচ্ছিলাম, গাঙ্গুলী, রাধানাথ—ঐসব ছোট-লোকগুলোর সঙ্গে যেন না মেশে। ওতে আমাদের মাথা হেঁট হবে।

কৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত কহিলাম, তোমাদের মাথা হেঁট হবে কেন? মণীন্দ্র ভ্রূ দুইটা বার দুই তোলা-নামা করিয়া কহিল, বাঃ রে! জান না নাকি? ও যে আমাদের ভগ্নীপতি। আমি জানতাম না, সরোজ জানত বরাবরই

হারাণের দিকে কটাক্ষ করিয়া কহিলাম, তবে আর কি হে! তোমার তো পোয়া বারো। মণীন্দ্র খ্যাক করিয়া উঠিল, মানে?

এমন একটি শালী—মানে, বড়লোক শালী পাওয়া কম ভাগ্যের কথা নাকি?

মণীন্দ্র সন্দিগ্ধ স্বরে কহিল, ওতে আর ওর কি সুবিধে হবে? আমি ভাই, আমারই ব'লে কিছু হচ্ছে না। মুখে রক্ত উঠিয়ে মাসে পনরো টাকা। রুটি-ভিপ্টের—। বলিয়াই মণীন্দ্র চুপ করিয়া গেল।

হারাণ কহিল, রুটি-ভিপ্টের কি?

কিছু নয়, কিছু নয়। দেখ হেরো, না না, দেখ ভাই হারু, সকালের কথাটা সত্যি তো? তা হ'লে বুড়ীটাকে একটু সাবধানে রাখতে হবে। তা ছাড়া থানায় একটি ডাইরি করিয়ে দিয়ে আসি, কি বল?

বাইরে সজোরে বৃষ্টি নামিল। মণীন্দ্র কহিল, বর্ষাটা নেমে গেল বোধ হয়। বাস-চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। তা হ'লে জেলায় যাবার কি হবে বল দেখি?

কহিলাম, জেলায় গিয়ে কি হবে?

মণীন্দ্র বিস্ময়ের সুরে কহিল, আরে, মনে নেই? অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত কহিল, মাস্টারি ছেড়ে দাও মাস্টার। তোমার স্মরণশক্তি একেবারে গোল্লায় গেছে। ছেলেগুলোকে ভুল শিখিয়ে মাথা খেও না আর। তারপর দুই চক্ষের দৃষ্টি বাঁকা করিয়া, চোখের তারা দুইটা

চোখের ডান পাশে ঠেলিয়া দিয়া কহিল, মনে নেই? সেই যে, লা—ব—কে—ছা—

বুঝিলাম—লাইব্রেরির বই কেনা ও হাকিমের সঙ্গে দেখা করা। বলিলাম, বুঝেছি, পরে ভেবে বলব এখন।

ভাবাভাবি আর করতে হবে না, যত শিগগির হয় ততই ভাল। তুমি আর আমি, বুঝলে?

দরজায় গোষ্ঠ ডোমের ডাক শোনা গেল, মাস্টারবাবু রইছেন গো?

সাড়া দিয়া কহিলাম, কে, গোষ্ঠ? কি খবর?

খবর কিছু লয়, কর্তাবাবু বললেক উস্কুলের চাবিটা দিতে। হুজুর সাহেব আইছেন। আর আপনকাকেও যেতে বললেক। হঠাৎ হারাণকে দেখিতে পাইয়া বলিল, ও ঘোষাল মশয়! আপনার কাছে যাচ্ছিলাম যে। আপুনিও চল।

হারাণ অসহ্য বেদনায় নাক-মুখ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, আবার পেটটা মোচড়াতে শুরু করল মাস্টার। আমি উঠি।

গোষ্ঠকে কহিল, বাবা গোষ্ঠ! ভারি পেটের অসুখ, গাঙুলী মশায়কে ব'লো, সারারাত ভেদবমি হয়েছে; অনেক কষ্টে ক পা হেঁটে মাস্টারের কাছে হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেতে এসেছিলাম। ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, চলি হে মাস্টার। তুমিও ব'লে দিও। হারাণ ছাতা লইয়া ধুঁকিতে ধুঁকিতে বাহির হইয়া গেল।

মণীন্দ্র কহিল, আমিও উঠি তা হ'লে। আমার কথাটা বুঝতে পেরেছ তো? আর দেরি নয়। দু আনা চার আনা দামের বিশ-ত্রিশ টাকার বই কিনিলেই এক গাদা বই হবে, তাই দিয়ে এক রকম ক'রে একটা আলমারি ভর্তি ক'রে, হাকিমকে এনে হাজির করা চাই, তা হ'লেই সব ঢিট হয়ে যাবে।

গোষ্ঠ মুখ বাড়াইয়া কহিল, কে কথা কইছেন গো? চক্রবর্তী মশয় নাকি? আপনকাকেও যে একবার ডাকছিলেন গাঙ্গুলী মশয়, বললেক—

মণীন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া কহিল, তোর গাঙ্গুলী বুড়োকে বল্‌গে যা, মন্টু চক্রবর্তী কারও তাঁবেদারের নফর নয় যে, তু করলেই ছুটে যাবে, তার দরকার থাকে এসে আমার সঙ্গে দেখা করুক।— বলিয়া ছাতাটি লইয়া হনহন করিয়া চলিয়া গেল।

গোষ্ঠর হাতে চাবি পাঠাইয়া দিয়া আমিও স্কুলের দিকে চলিলাম।

স্কুলে পৌঁছিতেই দেখিলাম, গাঙ্গুলী মশায়, রাধানাথ, আরও পাড়ার দুই-চারিজন লোক স্কুলের উঠানে জড়ো হইয়াছে। গ্রামের চৌকিদাররা সরকারী নীল জামা ও পাগড়ি পরিয়া, হন্তদন্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। আমাকে দেখিয়াই গাঙ্গুলী মশায় শশব্যস্তভাবে কহিলেন, হুজুর অফিস-ঘরে রয়েছেন, আজ আর স্কুল থাক্, বাদলার জন্যে বন্ধের নোটিস দিয়ে দাও।

পাড়াগাঁয়ে দারোগা ও সার্কল-অফিসার বাস্তু-দেবতারই সামিল। নিত্য তাঁহাদের সেবা যোগাইতে হয় এবং সকাল-সন্ধ্যা ভক্তি নিবেদন করিতে হয়। ম্যাজিস্ট্রেট, এস. ডি. ও. প্রভৃতি উপরওয়ালা হাকিমরা দুর্গা-কালীর মত বৎসরে দুই-একবার আসেন, এবং যখন আসেন, তখন সারাগ্রামে হৈ-চৈয়ের অন্ত থাকে না।

অফিস-ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, সার্কল-অফিসার একটি চেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া আছেন, সবুট পা দুইটি টেবিলের উপর রক্ষিত; আরামে দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সিগারেট টানিতেছেন। আমার জুতার শব্দে একবার চোখ মেলিয়া চাহিয়া আমাকে দেখিয়া লইয়া আবার চোখ বুজিলেন। একজন শিক্ষককে সাধারণ ভদ্রলোকের

প্রাপ্য সৌজন্যটুকু দেখানোও তাঁহার হাকিমী মর্যাদাজ্ঞানে বোধ করি বাধিল। বসিতে না বলিলেও বসিলাম, চেয়ারে নয়, কারণ চেয়ারটিতে হাকিম বাহাদুর তাঁহার টুপিটি রাখিয়াছেন, কাজেই একটি টুল সংগ্রহ করিয়া সম্মানসূচক দূরে বসিলাম।

এই হাকিমটি কৈবর্ত-সন্তান, নাম অদ্বৈতচরণ ঘোষ। বয়স প্রায় ত্রিশ; এম. এ পাস; ভাল ছেলে ছিলেন নিশ্চয়ই, না হইলে প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় পাস করিয়া চাকুরি পাইতেন না। চেহারাও হাকিমোচিত দশা-সই। ইনি যে পরাক্রান্ত ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের একজন প্রতিনিধি ও গ্রাম্য জনমণ্ডলীর একান্ত ভক্তির পাত্র, তাহা নিজেও কখনও ভুলেন না, কাহাকেও কখনও ভুলিতে দেন না। ইনি আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও উপরওয়ালাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেন জানি না, কিন্তু আমাদের কাছে নিজের চতুর্দিকে সদাসর্বদা এমনই একটি দেবতাসুলভ মহিমাময় পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেন যে, আমরা গ্রামবাসীরা যুক্তহস্তে ইঁহার সামনে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ইঁহার দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকি ও ইঁহার মুখে মনিবসুলভ কথাবার্তা, হাসি ও কাশি দেখিতে ও শুনিতে পাইলে কৃতার্থ হইয়া যাই।

হঠাৎ হাকিম বাহাদুর আমি আগে যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম, সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, আপনাদের গ্রামের ব্যাপার কি? চোখ খুলিয়া আমাকে দেখিতে না পাইয়া পাশে তাকাইতেই আমাকে দেখিতে পাইলেন, এবং ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, ওঃ, বসেছেন দেখছি! তা বেশ করেছেন। এখন গাঁয়ে কি সব ব্যাপার চলছে বলুন দেখি?

কহিলাম, বিশেষ কিছু না। মানে—

হুজুর বাধা দিয়া কহিলেন, সে কি মশায়? এত সব কথা শুনলাম, আর আপনি সব উড়িয়ে দিচ্ছেন?

জবাব দিলাম, আমি সব ব্যাপার ভাল জানি না। গাঙ্গুলী মশায় জানেন।

তবে যে রাধানাথবাবু বললেন, আপনি ভেতরে ভেতরে ও-দলে রয়েছেন।

গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া কহিলাম, আমি কোন দলেই নেই, অথবা দুই দলেই আছি। শিক্ষক হয়ে দলাদলিতে যোগ দেওয়া আমাদের চলে না।

হুঁ-শব্দে হুজুর গর্জন করিলেন। তারপর কিছুক্ষণ চক্ষু মুদিয়া, দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া, মুখে নানা প্রকার ভাব ফুটাইয়া, হুজুর হঠাৎ সোজা হইয়া বসিয়া নূতন আর একটা সিগারেট ধরাইয়া টানিতে লাগিলেন। আমিও একখণ্ড কাগজ সংগ্রহ করিয়া রেনি-ডের নোটিস লিখিয়া, বাহিরের নোটিস-বোর্ডে আঁটিয়া দিতে গেলাম। গাঙ্গুলী মশায় আমাকে দেখিয়াই ছুটিয়া কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হুজুর কিছু জিজ্ঞেসা করলেন নাকি ?

কহিলাম, দলাদলির কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন।

আগ্রহান্বিত স্বরে গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, কি বললে ?

এই সময়ে রাধানাথও আসিয়া হাজির হইল। কহিলাম, বললাম, রাধানাথদাদা সব জানে, ওই তো দলাদলি সৃষ্টি করেছে কিনা।

রাধানাথ চটিয়া উঠিয়া কহিল, তার মানে ?

কহিলাম, মানে বুঝতে পারছ না নাকি ? বাংলা ভুলে গেছ ?

রাধানাথ চোখ পাকাইয়া তর্জনী নাড়িয়া কহিল, দেখ মাস্টার, মিথ্যে চুকলি ক'রো না বলছি।

কহিলাম, তুমি আমার নামে কর নি ? তুমি বল নি, ভেতরে ভেতরে আমি ঐ দলে আছি ?

রাধানাথ কহিল, আছ তো, বলব না ?

তুমি দলাদলি সৃষ্টি করেছ তো, বলব না ?

গাঙ্গুলী মশায় দুই হাত দুইজনের কাঁধে দিয়া কহিলেন, আরে, থাক্ থাক্, ঘরে ঘরে ঝগড়া করতে হবে না। হুজুর শুনতে পেলে কি ভাববেন বল দেখি ? মাস্টার, হুজুরের কাছে ব'সগে যাও। আর রাধানাথ ভাই, মাছ-ধরার কতদূর কি হ'ল একবার দেখগে যাও। বেশি দরকার নেই, একটা সের পাঁচেক রুই কি মিরগেল হ'লেই হবে। ও-বেলায় তো আবার পাঁঠার হাঙ্গামা আছে। আর দেখ, ফেরবার সময়ে অনুকূলমামাকে (প্রবোধ গাঙ্গুলীর মামা) ডেকে নিয়ে আসবে।

রাধানাথ চলিয়া গেল। গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, হুজুরকে সব বলেছি। দারোগার ওপর তো এমনিই চটা, আরও চ'টে গেছেন আজ। হাকিম হোক, হিন্দুর ছেলে তো। হিন্দুর বিধবার সঙ্গে মোছলমানের নটখটি শুনলে চটবারই কথা। যাও, কাছে ব'সে আরও একটু উসকে দাওগে যাও। হুজুরকে দিয়েই আজ রাত্রে কার্যোদ্ধার করতে হবে।

ভিতরে গিয়া বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে গাঙ্গুলী মশায় ভিতরে ঢুকিয়াই একেবারে আঁতকাইয়া উঠিয়া কহিলেন, হুজুর ঘামছেন, আর মাস্টার ব'সে ব'সে দেখছ ? পাখা ! পাখা ! ঐ যে পাখা।—বলিয়া পিছনে বেঞ্চির উপর পাখাটার দিকে ছুটিলেন এবং পাখাটা তুলিয়া লইয়া হুজুরের পিছনে দাঁড়াইয়া সজোরে পাখা চালাইতে লাগিলেন।

হুজুর একবার ক্ষীণ প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, থাক্ না, দরকার নেই।

কিন্তু গাঙ্গুলী মশায় প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া পাখা করিতেই লাগিলেন। হুজুর চেয়ারের নীচে পা দুইটা চালাইয়া দিয়া, চেয়ারে ঠেস দিয়া, মুদ্রিত চক্ষে প্রশ্ন করিলেন, সে মেয়েটির বয়স কত ?

গাঙুলী মশায় জবাব দিলেন, আজ্ঞে, ভরা যৌবন, তার ওপরে—সুন্দরী।

হুজুর চোখ খুলিয়া কহিলেন, আমি গাঁয়ে প্রায়ই আসা-যাওয়া করছি জেনেও দারোগার কাছে গেল কেন?

আজ্ঞে, স্বভাব। তা ছাড়া মন্নু চক্রবর্তীর কারসাজি, বোনকে মোছলমানের হাতে তুলে দিয়ে সব মেরে দেবার চেষ্টা।

হুজুর হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, চাবকাতে পারেন না? ডেকে পাঠান তাকে, আমি ঠিক ক'রে দিয়ে যাচ্ছি। নচ্ছার! হারামজাদা!

গাঙুলী মশায় নিবেদন করিলেন, ডেকে পাঠিয়েছিলাম তাকে হুজুরের নাম ক'রে, তো বলেছে, আমার গরজ পড়ে নি, যার ইচ্ছে এসে দেখা করুক আমার সঙ্গে।

হুজুর রক্তচক্ষু হইয়া কহিলেন, তাই নাকি?

গাঙুলী মশায় পাথা-সুদ্ধ দুই হাত যুক্ত করিয়া কহিলেন, হুজুর, ভারি বেড়েছে কিনা! বোনের পয়সায় নবাব ব'নে গেছে, লঘুগুরু জ্ঞান-গম্যি কিছু আর বাকি নেই।

হুজুর রোষে ফুলিয়া উঠিয়া কহিলেন, আচ্ছা, আমিই যাব। আমার সামনে কি রকম মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে দেখব।

গাঙুলী মশায় কহিলেন, আপনার সামনে দাঁড়াবার সাধ্য কি? দেখলেই পায়ের নীচে প'ড়ে পা চাটবে দেখবেন। তাই তো বলছিলাম সবাইকে, মামলা-মকদ্দমা, আইন-আদালত কিছুর দরকার নেই। আমাদের হুজুর আসুন। উনি যদি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে একবার ব'লে দেন তো ঐ মন্নু চক্রবর্তী আর তার বোন বুড়ীকে হাতে তুলে দিতে পথ পাবে না।

বাধা দিয়া হুজুর কহিলেন, বুড়ীকে নিয়ে কি করবেন আপনারা?

গাঙুলী মশায় জবাব দিলেন, হুজুর, বুড়ীর কি কম দুর্দশা হচ্ছে! চোখে দেখতে পায় না, কানে শুনতে পায় না, একেবারে অথর্ব। তা বউটা তাকে একবারও চোখ চেয়ে দেখে না, নিজের সাজগোজ, আমোদ-আহ্লাদ নিয়েই মেতে থাকে। তা ছাড়া যে বাড়িতে দিনরাত ঐ কুকুরে কীর্তি, সেখানে হিন্দু বিধবার থাকা চলেও না।

হুজুর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, তা বটে। কিন্তু দারোগার আনাগোনাতে গাঁয়ের ছোকরারা আপত্তি করে না?

জিহ্বা ও তালু সহযোগে ক্ষোভসূচক শব্দ করিয়া গাঙুলী মশায় কহিলেন, ও কথা আর বলবেন না। গাঁয়ের ছোকরাগুলোকে সব ভেড়া বানিয়েছে। রাতদিন মাটি কামড়ে প'ড়ে আছে সব ওর বাড়িতে।

ওদের সঙ্গেও তা হ'লে—। বলিয়া হুজুর চক্ষের ইঙ্গিতে বক্তব্য জ্ঞাপন করিলেন।

গাঙুলী মশায় ঘাড় নাড়িয়া সহাস্যে কহিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা হ'লে তো রেগুলার প্রস্টিটিউট দেখছি।

গাঙুলী মশায় বুঝিতে পারিলেন না, কহিলেন, কি বললেন?

মানে, রীতিমত—বেশ্যা—

গাঙুলী মশায় সোৎসাহে কহিলেন, তারও বেহদ্দ। বলব কি হুজুর, লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা ঠিক করেছি, বুড়ীকে বার ক'রে নিয়ে আসি। ওঁর ভাইও এই বিপদ শুনে এসে হাজির হয়েছেন। তাঁকে দিয়ে একটা খোরপোষের মামলা করিয়ে দিই। ওদিকে শুনছি, প্রবোধ গাঙুলীর একজন ভাগনে আছে। তাকে সব জানিয়ে চিঠি লেখা হয়েছে। সে এসে পড়লে মেয়েটা যদি দারোগার সঙ্গে ভিড়েও যায় তো সম্পত্তিটা সব বেহাত হবে না।

হুজুর চিন্তিতমুখে কহিলেন, সম্পত্তি যদি মেয়েটির নামে থাকে, তা হ'লে ?

গাঙুলী মশায় মুদ্রিত চক্ষে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, আজ্ঞে, সব সম্পত্তি নেই। প্রবোধ গাঙুলী যে সম্পত্তি স্বয়ং করেছিল, তা সব স্ত্রীর নামে। কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তি সব তার নিজের নামেই ছিল। সেও বিস্তর সম্পত্তি হুজুর।

হুজুর কহিলেন, সে ভদ্রলোককে খবর দেন নি ?

আজ্ঞে দিয়েছি, এই এলেন ব'লে।

বলিতে বলিতেই ভদ্রলোক অর্থাৎ প্রবোধ গাঙুলীর মাতুল, ঝাকড়দা স্কুলের ফিফ্‌থ মাস্টার অফিস-ঘরে প্রবেশ করিল। আজও পরিধানে থান-ধুতি, কোঁচাটা দু ভাঁজ করিয়া পেটের উপর গোঁজা, গায়ে কেটের কোট। ইহার মধ্যেই স্নানাহ্নিক সারিয়া তিলক-ফোঁটা কাটিয়াছে। রাধানাথ পরম আপ্যায়নের সহিত তাহাকে বেঞ্চির উপর বসাইয়া হুজুরের সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দিল। মাতুল হুজুরকে নমস্কার করিতেই, হুজুর মস্তকে মৃদু ঝাঁকানি দিয়া প্রতি-নমস্কারের ভঙ্গী করিলেন।

গাঙুলী মশায় কহিলেন, আজ তা হ'লে চলুন, হুজুরকে নিয়ে আমরা যাই ওখানে। আপনার ভাগ্নে-বউকে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে দিদিকে নিয়ে আসবেন।

মাতুল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আমি তো বলেছি, ও-বাড়িতে পা দোব না। আপনারা হাতে এনে দিন, তারপর যা করতে হয় করব। রাধানাথের দিকে তাকাইয়া কহিল, কি বল রাধানাথ বাবাজী ?

রাধানাথ সায় দিয়া কহিল, আজ্ঞে, তা বইকি। মামলা-মকদ্দমার সমস্ত ধকল আমরা পোয়াব, আনাআনির হাঙ্গামায় আমরা নেই।

গাঙ্গুলী মশায় রাধানাথের দিকে চাহিয়া কহিলেন, তুমিও যাবে না নাকি? হুজুরের উদ্দেশে কহিলেন, শুনছেন হুজুর, আমাদেরই যেন গরজ!

হুজুর কহিলেন, আপনারা সব না গেলে আমি যাব না। আপনারা নিজেরা বোঝাতে পারছেন না, তাই আমাকে ধরেছেন। আপনাদের অনুরোধ এড়াতে না পেরে, আমি যেতে রাজি হয়েছি, এর পর যদি আপনারা পেছপা হন, তা হ'লে আমি যাব কেন? আপনারা যা পারেন নিজেরাই করবেন। তা ছাড়া, আমার এসব হাঙ্গামায় থাকা উচিত নয়, তবে নেহাত একটা কুৎসিত ব্যাপার হচ্ছে, সেটা বন্ধ করবার জন্যেই রাজি হয়েছিলুম, না হ'লে আমার কি?

গাঙ্গুলী মশায় রাধানাথের দিকে তাকাইয়া চোখের ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। রাধানাথ অবশেষে কহিল, তা হ'লে হুজুর, আমরা সকলেই যাব। ইনি বুড়োমানুষ, ইনি না হয় না গেলেন। আপনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মিটমাট ক'রে দেবেন, তার চেয়ে সুবিধে আর কি আছে! আমার দিকে তাকাইয়া কহিল, তুমিও যেও হে মাস্টার। কাজের বেলায় পালিও না যেন, আর হারাণ—

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, ওর পেটের অসুখ হয়েছে, গোপ্ত বলছিল। আমাকে কহিলেন, ভায়া একবার খবর নিও দেখি। যদি ভাল থাকে, খাওয়া-দাওয়া না করুক, আমাদের সঙ্গে যেন যায়।

সন্ধ্যার পূর্বে বৃষ্টি ছাড়িয়া গেল। পূর্বাকাশে কৃষ্ণাভ ধূসর মেঘ ছড়াইয়া রহিল বটে, কিন্তু পশ্চিমাকাশ একেবারে নির্মেঘ হইয়া গিয়া, অস্তোন্মুখ সূর্য ঝলমল করিয়া উঠিল। কাজেই গাঙ্গুলী মশায়ের আদেশমত হারাণের খবর লইবার জন্য তাহার বাড়ির দরজায় আসিয়া হাঁক দিলাম।

হারাণ সাড়া দিয়া কহিল, এস হে, নির্ভয়ে এস, বাড়িতে কেউ নেই। উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলাম। প্রায় বিঘাখানেক জায়গা চারিদিকে উঁচু মাটির প্রাচীর দিয়া ঘেরা, জায়গাটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা; উত্তর দিক ঘেঁষিয়া খানতিনেক উঁচু-দাওয়াওয়ালা ঘর, দেওয়াল মাটির, ঘরের মেঝে, বারান্দার মেঝে ও সিঁড়ি ইট-সিমেণ্ট দিয়া বাঁধানো। ডান দিকে রান্নাঘর, তাহারও দাওয়া বেশ উঁচু, উঠানের মাঝখানে চার-পাঁচটা বড় বড় ধানের মরাই। উঠানের দক্ষিণ দিকে পূর্ব দিক ঘেঁষিয়া গোটা দুই প্রকাণ্ড খড়ের পালুই, তাহার পাশেই গোয়াল। পশ্চিম দিকে কতকটা জায়গা বাঁশের কঞ্চি দিয়া ঘিরিয়া তরি-তরকারির বাগান। দেখিলেই মনে হয়, হারাণরা বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। হারাণ আমাকে ডাকিয়া কহিল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন হে? এস।—বলিয়া একটা মাদুর পাতিয়া দিয়া নিজে মাটিতে বসিতে যাইতেই কহিলাম, ও কি হচ্ছে? মাটিতে কেন?

হারাণ কহিল, গিন্নীর হুকুম নেই, ম্লেচ্ছের বাড়িতে খেয়ে ম্লেচ্ছ হয়ে গেছি কিনা, তাই কোন জিনিস ছুঁতে দিচ্ছে না আমাকে।

টানিয়া মাদুরে বসাইয়া কহিলাম, ব'স তো এখন। গিন্নী কই?

হারাণ কহিল, ঘাটে গেছে।

তোমার ওপর বাড়ি আগলাবার ভার কেন? পদ্ম কোথায় গেল?

হারাণ সক্ষোভে কহিল, রাগ ক'রে ঘর থেকে সকালে বেরিয়েছে, সারাদিন ঢোকে নি।

সবিস্ময়ে কহিলাম, সে কি?

হারাণ কহিল, সকালে ধুম ঝগড়া, এ মারে তো ও মারে। দুজনের কেউ তো কম যায় না!

কহিলাম, ঝগড়ার হেতু?

হেতু তেমন কিছু না, সকালে বউ আমাকে মরাইতলায় খেতে দিয়েছিল, তো পদ্ম তাই দেখে বললে, বউ, দাদা কি মুনিষ না মান্দের যে, মরাইতলায় খেতে দিয়েছ? বউ প্রথমে জবাব দিলে না। তবে পদ্ম তো চুপ ক'রে থাকবার মেয়ে নয় কিনা, আবার বললে, তোমার ভাইরা এলে যা ইচ্ছে ক'রো, আমার ভাইয়ের এমন হেনস্তা করলে সহ্যি করব না বলছি। এমনই দু-চার কথা। তারপরেই লেগে গেল চুলোচুলি, মারামারি, টেনে ছাড়ানো যায় না, আর ছাড়ানোও বিপদ। এই দেখ না, কামড়ে দিয়েছে বউ।—বলিয়া ডান বাহুতে দুই পাটি দাঁতের কামড়ের দাগ দেখাইল।

কহিলাম, ভাগনে বাড়িতে ছিল না?

কে, পকা? (অর্থাৎ প্রকাশ, হারাণের ভাগিনেয়) বাড়িতে ছিল না। কি কাজে এসে পড়ল তাই, না হ'লে একা সামলাতে পারতাম না।

হঠাৎ ভিজা কাপড়ের সপসপ শব্দ হইতেই হারাণ কহিল, বউ আসছে ভাই।—বলিয়া মাদুর ছাড়িয়া মেঝেতে বসিল। হারাণের বউ উঠানে পা দিয়াই আমাকে দেখিয়া ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া দিল। সে পুকুরে গা ধুইয়া, কাপড় কাচিয়া ফিরিয়াছে, কাঁধে লাল ডুরে গামছা। দ্রুতপদে রান্নাঘরে ঢুকিয়া বউ শিকলের ঝনঝন শব্দ করিতেই হারাণ কহিল, একবার উঠে চল ভাই, বউ কাপড় ছাড়বে। উঠিয়া উভয়েই উঠানের এক প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইলাম। হারাণের বউ শয়নকক্ষে ঢুকিয়া কাপড় ছাড়িয়া, আধময়লা লালপাড় শাড়ি ও শেমিজ পরিয়া আবার রান্নাঘরে চলিয়া গেল। আমি ফিরিয়া আসিয়া মাদুরে বসিলাম ও হারাণ রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া সবিনয়ে আর্জি পেশ করিল, মাস্টারকে এক কাপ চা—

প্রশ্ন হইল, আর তোমাকে?

হারাণ কহিল, আমার থাক্, মাটির ভাঁড়ে যা সোঁদা গন্ধ, চা খাওয়া যায় না।

হারাণের জন্য মাটির ভাঁড়ের ব্যবস্থা হইয়াছে সম্ভবত। জবাব আসিল, যাকে তাকে কাপ-প্লেট দিতে পারব না, নতুন কিনে দিতে পার, দিচ্ছি।

হারাণ বিষণ্ণ-বদনে ফিরিয়া আসিতেই, কনেবউকে শুনাইয়া কহিলাম, ওহে! তুমি তো একা খাও নি, আমিও তো খেয়েছিলাম। জাত গেলে আমারও গেছে। আমাকেও ভাঁড়ে ক'রেই দিতে বল। কোনও জবাব আসিল না।

কিছুক্ষণ পরে চা আসিল, আমার যথারীতি পেয়ালায় ও হারাণের জন্য মাটির ভাঁড়ে। কহিলাম, কতদিন শাস্তি চলবে?

অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে চাপা গলায় কনেবউ কহিল, যতদিন না প্রাচ্চিত্তির করে।

কহিলাম, কিন্তু এ লঘুপাপে গুরুদণ্ড হয়ে যাচ্ছে না? তা ছাড়া সব বাড়িতেই যদি এ রকম শুরু হয়ে যায়, তা হ'লে—

কনেবউ জবাব দিল, সে আমি কি জানি? আমার বাড়িতে অনাচার করলেই প্রাচ্চিত্তির করতে হবে, তাতে কারও না ভাল লাগে তো বাপের বাড়ি রেখে এলেই পারে।

হারাণ চোখের ইঙ্গিত করিয়া কহিল, চেপে যাও ভাই; যা আছে অদৃষ্টে হবে। কনেবউ চলিয়া গেলে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, ও বেলায় কি হ'ল?

কহিলাম, আজ সন্ধ্যেবেলায় সব দল বেঁধে যাবে, স্বয়ং হুজুর দলের নেতা। আমারও যাবার হুকুম হয়েছে, আর তোমারও, অবশ্য পেটের অসুখ ভাল হয়ে থাকলে।

হারাণ কহিল, আমি আর সরজমিনে যাব না ভাই, এমনিই তো চ'টে আছে, তার ওপর আবার গেছি শুনলে আর আস্ত রাখবে না। ফিসফিস করিয়া কহিল, কি ফ্যাসাদ করেছি মাইরি আবার বিয়ে ক'রে! রান্নাঘরের দরজার আড়াল হইতে শাড়ির লালপাড় দেখা যাইতেই কহিলাম, চুপ, বউ শুনছে।

হারাণ মুখ ফ্যাকাশে করিয়া কহিল, তাই নাকি! সব সময়ে আড়ি পাতা অভ্যেস। মনে মনে কহিলাম, আমারটিরও; শুধু আমারটির কেন, বোধ করি মেয়েমানুষ-মাত্রেরই, স্বামীর সম্বন্ধে তাহাদের সন্দেহের সীমা নাই।

অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত মুখ-চোখ কুঁচকাইয়া হারাণ কহিল, এমন একটা শালী আছে জানলে মাইরি কোনও দিন বিয়ের নাম করতাম না।

সন্ধ্যাবেলায় স্কুলে আসিয়া দেখিলাম, সকলে জড়ো হইয়াছে। হুজুর স্কুলের বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া, ও তাঁহাকে ঘিরিয়া সাঙ্গোপাঙ্গ দল—গাঙুলী মশায়, রাধানাথ, দোলগোবিন্দ, পাড়ার আরও কয়েকজন লোক। গোষ্ঠ ডোম হুজুরের পিছনে দাঁড়াইয়া পাখা চালাইতেছে। হুজুর কহিলেন, আপনাদের মাতুল তা হ'লে সত্যি সত্যিই যাবেন না?

রাধানাথ আগাইয়া আসিয়া কহিল, হুজুর, না। তা ছাড়া সময়ও নেই। সন্ধ্যে থেকে তো জপে বসেছেন, রাত্রি নটা পর্যন্ত চলবে। এ রকম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ দেখা যায় না। একেবারে নিরামিষভোজী, মাছ পেঁয়াজ কিছু খান না, খান শুধু পাঁঠা, তাও মা কালীর পেসাদী হওয়া চাই। আজকের পাঁঠাটা, হুজুর, তাই মা কালীর সামনে বলি দিতে হ'ল। তা ছাড়া ওঁর জন্যে এস্‌পেশাল ক'রে, পেঁয়াজ না দিয়ে সাত্ত্বিক মতে রান্না হচ্ছে।

হুজুর মুচকি হাসিয়া কহিলেন, তাই নাকি! ওঁর জন্যে গঙ্গাজল দিয়ে মাংস সেদ্ধ করছেন নাকি?

রাধানাথ রসিকতা না বুঝিয়া কহিল, না হুজুর। গঙ্গাজল এত কোথায় পাওয়া যাবে? তবে খেতে বসেন যখন, ইষ্ট-দেবতাকে নিবেদন করবেন, তখন গঙ্গাজলের ছিটে দেবেন ঠিক।

অন্ধকার একটু গাঢ় হইতেই সকলে বাহির হইল। সর্বপ্রথমে লণ্ঠন হাতে গোষ্ঠ, তাহার পিছনে হুজুর, তারপরে পর-পর গাঙ্গুলী মশায়, রাধানাথ, দোলগোবিন্দ ইত্যাদি, সবশেষে আমি, তারপরে গ্রামের জনকয়েক ডানপিটে ছেলে; তাহাদের পিছনে নারী-বাহিনী অর্থাৎ ত্রিশ হইতে ষাট বৎসর বয়সের গ্রামের যতগুলি বিধবা, তাহাদের নেত্রী সৌদামিনী, সহনেত্রী পদ্ম, সকলের পিছনে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া হারাণ। পাশে পাশে যাইতে লাগিল, রংলাল, বৈকুণ্ঠ, হারু প্রভৃতি চৌকিদারেরা, প্রত্যেকের হাতে একটি করিয়া লণ্ঠন।

এই বিরাট বাহিনীর মস্তকদেশ প্রবোধ গাঙ্গুলীর বাড়ির সামনে পৌঁছিতেই, হুজুরের আদেশে গোষ্ঠ গেটের মধ্যে ঢুকিয়া দরজার কাছে যাইয়া হাঁকিতে লাগিল, চক্রবর্তী মশায় রইছেন গো?

ভিতর হইতে সাড়া আসিল, কে?

আমি গোষ্ঠ, একবার বাইরে আসুন কিপা ক'রে।

অচিরে মণীন্দ্র আসিয়া হাজির হইল; গোষ্ঠ অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে কহিল, হুজুর আইছেন আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে, দাঁড়িয়ে রইছেন বাইরে।

মণীন্দ্র আগ্রহান্বিত স্বরে কহিল, তাই নাকি!—বলিয়া ত্বরিতপদে একেবারে গেটের বাহিরে আসিয়া, হুজুরের সামনে প্রায় ভূলুণ্ঠিত হইয়া নমস্কার করিয়া কহিল, আমাদের কত ভাগ্য! চলুন, বসবেন চলুন।—

বলিয়া মুখের ইঙ্গিতে বৈঠকখানার বারান্দায় খান-দুই বেঞ্চিকে নির্দেশ করিল।

হুজুর বুক চিতাইয়া কড়া গলায় কহিলেন, বসতে আসি নি, আপনাদের সঙ্গে একটু কথা বলবার আছে।

মণীন্দ্র হাতজোড় করিয়া কহিল, হুজুর, বলুন।

হুজুর ফটকের একটা থামের গোড়ায় বুট দিয়া ঠুকিতে ঠুকিতে কহিলেন, আপনারা প্রবোধ গাঙ্গুলীর মাকে আটকে রেখেছেন কেন?

মণীন্দ্র পূর্ববৎ পোজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, হুজুর, সে কি কথা! আটকে রাখবে আবার কে? রাখবার দরকারই বা কি? তাঁর নিজের বাড়িতে তিনি আছেন।

হুজুর বজ্র-গম্ভীর স্বরে কহিলেন, তাঁর এখানে থাকার ইচ্ছে নেই, আপনারা জোর ক'রে তাঁকে আটকে রেখেছেন।

মণীন্দ্র কহিল, হুজুর, আপনি দয়া ক'রে ভেতরে গিয়ে বসবেন চলুন। প্রবোধের মা-ঠাকরুণ এখনও জেগে আছেন। আপনি নিজে তাঁকে সব জিজ্ঞাসা করুন। যদি তিনি বলেন, এখানে কষ্ট হচ্ছে, আর তিনি আপনাদের সঙ্গে যেতে চান তো এখনই তাঁকে আপনাদের সঙ্গেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আর যদি না যেতে চান, তাও নিজের কানে শুনে গাঁয়ের লোকদের মিথ্যে-মিথ্যে বুঝে নেবেন।—বলিয়া মণীন্দ্র গোষ্ঠকে কহিল, তিনুকে বলগে বারান্দায় একটা শতরঞ্জি পেতে দিতে।—বলিয়া আবার যুক্তহস্ত হইয়া কহিল, হুজুর, আসুন তা হ'লে।

হুজুর গাঙ্গুলী মশায় ও রাধানাথের দিকে তাকাইতেই তাহারা কহিল, তাই চলুন হুজুর। নিজের চোখে-কানে সব দেখে-শুনে যাবেন।

হুজুরের পিছু পিছু সকলে ভিড় করিয়া ঢুকিলাম।

ছেলেগুলাকে দেখিয়া রাধানাথ কহিল, হারামজাদা ছেলেগুলো সব জায়গাতেই আছে! সকলে উঠানে গিয়া দাঁড়াইলাম। আমাদের সকলকে দেখিয়া কুন্তি রান্নাঘরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, হাতে একটি লণ্ঠন, চোখে বিস্ময় ও আশঙ্কা। এদিকে লম্বা একটানা বারান্দায় ভিমু ও গোষ্ঠ ধরাধরি করিয়া একটা বড় শতরঞ্জি পাতিতে লাগিল।

মণীন্দ্র কুন্তিকে ডাক দিয়া কহিল, ওই লণ্ঠনটা নিয়ে আয়। তোর পিসীমা কোথায়?

কুন্তি আসিতে আসিতে জবাব দিল, আসন করছেন।

সমবেত জনতার মধ্যে একটা চাপা হাসির তরঙ্গ গড়াইয়া গেল। কেহ কহিল, আসন নয়, আসনাই করছেন। কেহ কহিল, চপ-কাটলেট সাঁটছেন। কেহ প্রশ্ন করিল, চপ-কাটলেটও খায় নাকি?

উত্তর হইল, খুব, খুব। দারোগাবাবুর খানসামা দিন একটা ক'রে মুরগীর ঠ্যাং বাড়িতে দিয়ে যায়।

মণীন্দ্র প্রবোধ গাঙ্গুলীর মাকে হাত ধরিয়া আনিয়া শতরঞ্জিতে বসাইয়া দিয়া যুক্তহস্তে হুজুরকে কহিল, হুজুর, এসে বসুন, যা জিজ্ঞেস করবার করুন।

হুজুর কহিলেন, আমরা বসব না, এমনই এখান থেকেই জিজ্ঞাসা করছি।—বলিয়া গাঙ্গুলী মশায়কে কথা বলিতে আদেশ দিলেন।

গাঙ্গুলী মশায় কতকটা আগাইয়া গিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, খুড়ী, কেমন আছ?

বৃদ্ধা কম্পিত স্বরে টানিয়া টানিয়া কহিল, কে তুমি?

আমি পরাণ।

বৃদ্ধা পুলকিত হইয়া কহিল, ও! পরাণ! আয় বাবা, ব'স। আসিস না কেন আজকাল?

গাঙ্গুলী মশায় প্রশ্নের জবাব না দিয়া কহিলেন, ভাই এসেছে যে তোমার।

বৃদ্ধা আগ্রহের সহিত কহিল, কে, অনুকূল? কই?

আসে নি এখানে; রাধানাথের বাড়িতে উঠেছে।

বৃদ্ধা বিস্ময় ও ক্ষোভের সহিত কহিল সে কি! আমি এখনও বেচে আছি, আর অনুকূল কোথায় রাধানাথের বাড়িতে উঠেছে! কই, অনুকূলকে ডেকে দে দেখি, এত বয়েসেও বুদ্ধি-শুদ্ধি হয় নি ওর।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, এ বাড়িতে পা দেবেন না বলেছেন।

বৃদ্ধা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, প্রবোধ আমার নেই ব'লে বুঝি আসতে চাইছে না? অশ্রুজড়িত কণ্ঠে কহিতে লাগিল, কি করবি বল্? ভগবানের মার, মাথা পেতে নিতেই হবে। না হ'লে এমন ছেলে হারিয়ে মাকে বেঁচে থাকতে হয়? তবু তো হতভাগী আমি বেঁচে রয়েছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি; মরণ হচ্ছে কই বল্? বলিতে বলিতে ভাবলেশ-হীন দৃষ্টিহারা চক্ষু দুইটি হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। আঁচলে মুছিয়া কহিল, অনুকূলকে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে পাঠিয়ে দিগে। আর বাঁচব না বেশিদিন, শেষ-দেখা দেখে যাক।

গাঙ্গুলী মশায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন।

হুজুর কহিলেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওসব কি শুনছেন? যা বলতে এসেছেন, ব'লে দিন না।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, ওজন্যে নয় খুড়ী। তোমার বাড়িতে ম্লেচ্ছকীর্তি হচ্ছে কিনা, তাই আসবে না বলেছে।

সবিস্ময়ে বৃদ্ধা কহিলেন, আমার বাড়িতে ম্লেচ্ছকীর্তি! স্বয়ং জনার্দন

এসে বললে যে বিশ্বাস করব না পরাণ। আমার বউমা থাকতে সে হবার উপায় নেই। দেখেছ তো আমার বউমাকে, যৌবনে যোগিনী সেজেছে, একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাস করে; কত বলি, বউমা, একটু জল খাও, শোনে না।

আবার হাসির তরঙ্গ উঠিল।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, তুমি জান না খুড়ী, দেখতে তো কিছু পাও না। তোমার বউ যা-তা করতে আরম্ভ করেছে। মোছলমান দারোগার বাড়িতে আনাগোনা করে, তাকে এনে বাড়িতে বসিয়ে খাওয়ায়, আরও যা যা করে, তা আর মুখে বলা যায় না।

সহসা পাশের ঘর হইতে সরোজিনী বাহির হইয়া দৃঢ়চরণে ঋজু-ভঙ্গীতে সকলের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। পরনে গরদের থান, গায়ে শুধু শেমিজ, মাথায় এলোচুল হইতে অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়িয়াছে, মুখে বিস্ময় ও বিরক্তি; মণীন্দ্রের দিকে চাহিয়া কহিল, কি ব্যাপার?

মণীন্দ্র কহিল, গাঁয়ের সব মাতব্বররা এসেছেন তোমার কাছে, আর এসেছেন আমাদের হুজুর।

কপাল কুঁচকাইয়া সরোজিনী কহিল, কে?

মণীন্দ্র কহিল, আমাদের এ তল্লাটের ছোট হাকিম।

সরোজিনী তাচ্ছিল্যের সহিত হুজুরের দিকে একবার কটাক্ষক্ষেপ করিয়া কহিল, কি জন্যে এসেছে সব?

হুজুর গরম হইয়া কহিলেন, আপনি যে হিন্দুঘরের বিধবা হয়ে সমাজের বুকে ব'সে যা ইচ্ছে তাই করছেন, তারই কৈফিয়ৎ নিতে এসেছি আমরা।

সরোজিনী মণীন্দ্রের দিকে চাহিয়াই ভারী গলায় কহিল, ব'লে দাও, কারও কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নই আমরা।

অপমানে মুখ কালো করিয়া হুজুর গাঙ্গুলী মশায়ের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, তবে আর কি ! ফিরে চলুন। ভাল কথায়—

বলিতে না বলিতে রাধানাথ আগাইয়া গিয়া কহিল, নিশ্চয় বাধ্য। সমাজে বাস ক'রে যা-তা করতে পার না তুমি।

সরোজিনী রাধানাথের দিকে তাকাইয়া শান্তকণ্ঠে কহিল, কি করেছি আমি ?

রাধানাথ কহিল, দারোগার সঙ্গে থানায় গিয়ে দেখা করেছ।

সরোজিনী দুই চোখ ডাগর করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, দারোগার কাছে গিয়েছিলাম আমি একা ? রাধানাথ ঠাকুরপো ! মিথ্যে কথা ব'লো না, এখনও চন্দ্র-সূর্য উঠছে।

রাধানাথ খাবড়াইয়া গিয়া কহিল, উঠছেই তো। কিসের মিথ্যে !

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, রাধানাথ, তুমি থাম, আমি বলছি। তারপর আগাইয়া গিয়া কহিলেন, দারোগাকে ঘরে বসিয়ে তার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া ফুর্তি-আমোদ কর নি তুমি ?

রাগে সরোজিনীর মুখ আগুনের মত লাল টকটকে হইয়া উঠিল ; কিন্তু কিছু জবাব দিল না।

রাধানাথ কহিল, গাঁয়ের জোয়ান ছেলেগুলোকে বাড়িতে জড়ো ক'রে তাদের মাথা চিবিয়ে খাচ্ছ না তুমি ?

সরোজিনী জলন্ত চোখে দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, তোমরা মিথ্যেবাদী।

রাধানাথ ভড়কাইয়া গিয়া কহিল, মিথ্যেবাদী বইকি ! নিজে যা-তা ক'রে—

পিছন হইতে কে বলিয়া উঠিল, বেশ্যার আবার তেজ !

হঠাৎ সরোজিনী চীৎকার করিয়া উঠিল, কি, আমি বেশ্যা ? আমার বাড়িতে এসে আমাকে অপমান ? আমার স্বামী নেই ব'লে কি এমনই

নেমে গেছি যে, পথের কুকুর এসে আমাকে লাথি মারবে? তীক্ষ্ণকণ্ঠে শাশুড়ীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, মা, শুনছেন কি বলছে? আমি বেশ্যা! হঠাৎ ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া, 'ও মা গো' বলিয়া, ভাল ভাল যাত্রা-থিয়েটারে নায়িকাদের যেমন ভাবে পতন ও মূর্ছা হয়, ঠিক তেমনই কায়দায়, অতি সুনিপুণভাবে সরোজিনী শতরঞ্জির উপর ধড়াস করিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল।

মণীন্দ্র চীৎকার করিয়া উঠিল, ওরে, আমাদের কি হ'ল রে! সবাই মিলে বোনকে আমার মেরে দিলে রে! সঙ্গে সঙ্গে ফটি মিহি গলায় তান ধরিল, পিসীমার কি হ'ল গো!

শাশুড়ী স্খলিতকণ্ঠে 'অ বউমা, কি হ'ল গো' বলিতে বলিতে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া সরোজিনীর দিকে যাইতে শুরু করিলেন। বেগতিক দেখিয়া হুজুর দ্রুতপদে স্থান ত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেই কহিলাম, চ'লে যাচ্ছেন যে?

হুজুর ত্রস্তকণ্ঠে কহিলেন, আরে মশায়, এমন সীন করবে জানলে কে আসত? সাংঘাতিক মেয়েমানুষ! একটা চৌকিদারকে ডেকে দিন দেখি।—বলিয়া ডাকার অপেক্ষা না করিয়াই দরজার দিকে ছুটিলেন। চৌকিদাররা ব্যাপার দেখিয়া আগেই সরিয়া পড়িয়াছিল। শুধু গোষ্ঠ পিছনে পড়িয়া গিয়াছিল এবং এখন সুযোগ বুঝিয়া পালাইতেছিল; তাহাকে ডাকিয়া হুজুরের চার্জ বুঝাইয়া দিলাম। রাধানাথ, গাঙ্গুলী মশায়, দোলগোবিন্দ 'হুজুর চ'লে গেলেন যে, হুজুর চ'লে গেলেন যে' বলিতে বলিতে সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেই তিমুর দল তাহাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিল। রাধানাথ তাহাদের একজনকে একটা চড় কষাইবার চেষ্টা করিতেই সেই ছেলেটি রাধানাথের হাতের পাঞ্জা ধরিয়া এমনই মুচড়াইয়া দিল যে, রাধানাথ 'উহু, ছাড়, ছাড়' বলিয়া

চীৎকার করিয়া উঠিল। দোলগোবিন্দ উত্তেজনায় বুকে হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া কাশিতে শুরু করিল। বিধবারা ও ছেলেগুলা সরোজিনীর মূর্ছিত দেহের কাছে ভিড় করিল। হঠাৎ 'কি হ'ল গো' বলিয়া মিণ্টা এবং 'কি হ'ল হে, অ্যাঁ' বলিয়া তাহার বাপ বীরু আচায্যি ছুটিয়া ঘরে ঢুকিল। মিণ্টা সটান সরোজিনীর কাছে চলিয়া গেল, বীরু আচায্যি ব্যূহ-মধ্যস্থ রথীদের কাছে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিল।

উপরে এতগুলি ব্যাপার বর্ণনা করিতে এত সময় লাগিল বটে, কিন্তু ঘটিতে তাহাদের দুই-তিন মিনিটের বেশি সময় লাগিল না। আমি সমস্ত ব্যাপারটা একবার দেখিয়া লইয়া সরোজিনীর কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। সরোজিনী নিস্পন্দ, অচেতন ভাবে পড়িয়া আছে; পায়ের কাছে বসিয়া কুন্টি হাউহাউ করিয়া কাঁদিতেছে; মাথার কাছে উবু হইয়া বসিয়া মণীন্দ্র মুখের মধ্যে আঙুল চালাইয়া দাঁত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, তিনু মাথায় জল ঢালিতেছে ও তিনুর পাশে দাঁড়াইয়া মিণ্টা পাখা করিতেছে। হঠাৎ হিন্দুস্থানী মোটা গলায় 'কি হয়েছে' বলিয়া বোধ হয় লছমন সিং প্রবেশ করিল। তারপর দারোগাবাবুর গলা শুনিলাম, ঘর চড়াও ক'রে মারধোর করতে এসেছেন সব! বুড়ো বয়সে ৪৪৮ ধারার কেসে পড়লেন শেষে! ওখানে কি ব্যাপার?

মণীন্দ্র দাঁত ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাথায় হাত চাপড়াইতে চাপড়াইতে হেঁড়ে গলায় কাঁদিয়া উঠিল, দারোগাবাবু, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

কি হয়েছে? খুন-জখম কিছু হয়েছে নাকি, অ্যাঁ?—বলিতে বলিতে দারোগাবাবু ছুটিয়া আসিলেন। সকলে পাশ কাটিয়া রাস্তা করিয়া দিল। দারোগাবাবু কাছে আসিয়া উদ্বিগ্নকণ্ঠে কহিলেন, ম'রে গেছেন?

মেয়েদের মধ্যে কে বলিল, মরে নি বাছা, উতলা হ'য়ো না, মূর্চ্ছো গেছে।

দারোগাবাবু আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, ও মূর্চ্ছা! ভাঙে নি? একবার ডাক্তারবাবুকে কেউ ডেকে আনুক। কড়া গলায় ভিড়ের উদ্দেশে কহিলেন, এখানে কেউ ভিড় ক'রো না। ধমক দিয়া কহিলেন, যাও। কেউ এখানে থাকতে পাবে না।—বলিয়া দুই পা আগাইয়া যাইতেই ছেলেগুলা ছুটিয়া পলাইল ও বিধবারা গনগন করিতে করিতে সরিয়া দাঁড়াইল। দারোগাবাবু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কে ডাক্তারবাবুকে ডাকতে গেল?

ফুটি মিহিস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে মিণ্টা ও তিনকড়ির দিকে তাকাইয়া ছিল; তিনুর উদ্দেশে তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, আপনি যান না তিনুদাদা। ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনুনগে, মিণ্টাদিদি জল দিচ্ছে।

দারোগাবাবু কহিলেন, ওঁর মাথাটা মাটিতে গড়াচ্ছে, কেউ কোলে তুলে নিলেই পারেন।

হঠাৎ পাশে গুঁতা খাইয়া দেখিলাম, হারাণ ঠেলাঠেলি করিয়া আগাইয়া যাইতেছে। আমাকে দেখিয়া কহিল, যাব?

সকলকে শুনাইয়া কহিলাম, যাও না হারাণ, কোলে নিয়ে ব'স; তোমার তো ছোট শালী—নিজের বোনের মত।

মণীন্দ্র না বসিতে বসিতেই, হারাণ ঝপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া সরোজিনীর মাথাটা কোলে তুলিয়া লইল এবং লইতেই সরোজিনী সম্বিৎ লাভ করিয়া, দুই কনুইয়ের উপর ভর দিয়া মাথা তুলিয়া, হারাণের মুখের দিকে দুই বিহ্বল চোখ মেলিয়া কহিল, কে, জামাইবাবু? তারপর হারাণের কোলে মাথা গুঁজিয়া দুই বাহু দিয়া হারাণের কোমর

জড়াইয়া ধরিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, কোথায় ছিলেন? সাহেব নিয়ে সব মারতে এসেছিল আমাকে।—বলিয়া আবার মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

মণীন্দ্র হাঁকিয়া কহিল, গোবর-গণেশের মত ব'সে থেকো না হারু, দাঁতটা ছাড়াও।

দারোগাবাবু কহিলেন, তিনকড়িবাবু এত দেরি করছেন! আচ্ছা, আমি ওদিকটা একবার দেখি, যা-তা আরম্ভ করেছে সব। একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার।

ইতিমধ্যে ছেলে ও বিধবারা আবার হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছিল, দারোগাবাবু আমাকে কহিলেন, আমি আসছি, একটু দেখবেন, এরা কেউ যেন না পালায়। থানা থেকে জনকয়েক কন্‌স্টেব্‌ল আনতে পাঠাচ্ছি, সব ধ'রে নিয়ে যাবে। দারোগাবাবুর কথা মন্ত্রবৎ কাজ করিল, দেখিতে দেখিতে ছেলেগুলা কে কোথায় পলাইয়া গেল, তাহা টের পাওয়া গেল না। বিধবাদের মধ্যে যাহাদের বয়স কিছু কাঁচা তাহারাও সরিয়া পড়িল, শুধু সৌদামিনী পদ্ম এবং আরও জনকয়েক নেতৃস্থানীয়া বিধবা, নারীসুলভ লজ্জা ও সঙ্কোচ যাহারা হজম করিয়া ফেলিয়াছে, তাহারাই অটল হইয়া রহিল। অধিকন্তু একজন মন্তব্য করিল, ছোঁড়ার বাড় দেখ, হিন্দুর মেয়েকে হাজতে দেবে বলে! কে একজন বলিল, ও পদ্ম! লক্ষ্মী-নারাণ মূর্তি দেখে নয়ন সাথক কর্ লো, কনে-বউকেও ডেকে নিয়ে এসে দেখা। কনে-বউয়ের নাম শুনিতেই হারাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল বোধ হয়, হয়তো ভাবিল, স্পর্শসুখে আর কাজ নাই; কনে-বউ আসিয়া হাজির হইলে যে গুরুতর স্পর্শসুখের ব্যবস্থা হইবে, তাহার ধকল এ বয়সে শরীরে সহ্য হইবে না। কিন্তু বেচারার উপায় নাই, সরোজিনী এমন সজোরে তাহাকে

কহিল, এই দেখ কি কাণ্ড! হারাণ একবার কনে-বউয়ের দিকে তাকাইয়াই পাংশুমুখে নতমস্তক হইয়া বসিয়া রহিল। ঠিক এই সময়ে সরোজিনীর জ্ঞান হইল, মাথা তুলিয়া কহিল, কি? কে? তারপর মুখ ফিরাইয়া পদ্ম ও কনে-বউয়ের দিকে তাকাইয়া ভয়ার্ত স্বরে কহিল, কে তোমরা? পেত্নী? জামাইবাবু, ধরুন আমাকে, পেত্নীরা আমাকে ধ'রে নিয়ে যেতে এসেছে।—বলিয়া আবার হারাণের কোলে মুখ গুঁজিয়া সজোরে তাহার কোমর আঁকড়াইয়া ধরিল।

কনে-বউ গর্জিয়া উঠিয়া কহিল, কি? আমি পেত্নী? এই কথা ব'সে ব'সে শুনছ তুমি? উঠে এস। চীৎকার করিয়া কহিল, উঠে এস বলছি।

হারাণ থতমত খাইয়া কহিল, ছাড়ছে না যে!

ধমকাইয়া কনে-বউ কহিল, ছাড়ছে না যে! কেন কোলে নিতে গিছলে? পরের মেয়েমানুষ ভারি মিষ্টি, না?

হারাণ কহিল, পর আবার কি? নিজের শালী—

দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া কনে-বউ কহিল, শালী! শালীর নিকুচি করেছে! উঠে এস। ঠাকুরঝি, দাও তো একটা ঝাঁটা—

ফুটি হাঁকিয়া কহিল, আমাদের জিনিসে কেউ হাত দিও না বলছি।

কনে-বউ কহিল, ঝাঁটা দেবে না? বেশ।—বলিয়া হারাণের হাত ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া কহিল, ঠাকুরঝি, তুমিও ধর তো—

আমি বাধা দিয়া কহিলাম, কনে-বউ, ভারি বাড়াবাড়ি হচ্ছে না?

কনে-বউ ত্বরিত-হস্তে মাথায় ঘোমটা টানিল। যাহাই করুক, কনে-বউয়ের লজ্জা-শরম নাই—এ কথা পরম শত্রুতেও বলিতে পারে না।

হারাণকে কহিলাম, মাথাটা আর কারও কোলে দাও।

তিনকড়ি উঠিবার উপক্রম করিতেই ফুন্টি কহিল, আমি নিচ্ছি। ফুন্টি সরিয়া বসিল। তখন সবাই মিলিয়া টানাটানি করিয়া সরোজিনীর বাহুবন্ধন একটু আলগা করিতেই হারাণ নিজেকে ছাড়াইয়া লইল; তারপর হেডমাস্টারের পিছু পিছু অপরাধী ছাত্র যেমন ভাবে আপিস-ঘরের দিকে যায়, ঠিক তেমনই ভাবে কনে-বউয়ের পিছনে পিছনে চলিল। পদ্মকে কহিলাম, তুমিও যাও।

পদ্ম কহিল, দাঁড়াও, জ্ঞান হোক। একবার শুনিয়ে যাব না! পেত্নীই হই আর যা-ই হই, ছিনালি করা আমাদের অভ্যেস নেই।

মণীন্দ্র কহিল, খুব হয়েছে, আর শোনাবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। তুই বেরো দেখি।

পদ্ম মুখ নাড়িয়া জবাব দিল, তোর যে ভারি বাড় হয়েছে রে মনু! বড়লোক বোন চিরদিন গাঁয়ে থাকবে না। মাথা ন্যাড়া ক'রে, ঘোল ঢেলে, কুলোর বাতাস দিয়ে গাঁয়ের লোক একদিন গাঁ থেকে তাড়াবেই। তখন কি ক'রে গাঁয়ে থাকিস দেখব।

মণীন্দ্র কহিল, শুনছ মাস্টার? নেহাত মেয়েমানুষ ব'লে সহ্য করতে হচ্ছে। না হ'লে—মনু চক্রবর্তী এসব সয়?—বলিয়া আমার দিকে কটমট করিয়া তাকাইল।

আমি, পদ্ম ও আরও অন্যান্য বিধবাদের উদ্দেশে কহিলাম, আপনারা যান, আর ভয় নেই। ওষুধ যখন শোঁকানো হচ্ছে, তখন এখনই ভাল হয়ে উঠবে।

সৌদামিনী কহিল, ভাল হয়ে উঠলেই ভাল ভাই, আমাদের আর কি? চোখে দেখা তো। তাও যদি সহ্যি না হয় তো আমরা চ'লেই যাচ্ছি।—বলিয়া অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত সাঙ্গোপাঙ্গদের লইয়া স্থান-ত্যাগ করিল।

কৃন্টি ছিপিটা বন্ধ করিয়াই শুধু শিশিটা শুঁকাইতেছিল। লক্ষ্য করিয়া কহিলাম, ও রকম ক'রে নয়; ছিপিটা খুলে ভাল ক'রে শোঁকা। একবার শোঁকাইতেই সরোজিনী চেতনালাভ করিয়া 'আঃ' শব্দ করিয়া উঠিল এবং শিশিটা হাত দিয়া সরাইয়া কহিল, থাক্, আর দিতে হবে না।—বলিয়া শান্ত ও স্বাভাবিক ভাবে শুইয়া রহিল।

মণীন্দ্রকে কহিলাম, যদি ঘুমিয়ে পড়ে, আর ঘুম ভাঙিও না। তবে আবার যদি মূর্চ্ছা হয় তো ওবুধটা শুঁকিয়ে দিও।

সরোজিনীর শাশুড়ী এতক্ষণ একটানা সুরে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছিলেন—ওমা, আমার কি হ'ল গো! কাকে নিয়ে এ সংসারে থাকব গো! ইত্যাদি।

এতক্ষণে কান্না থামাইয়া আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, হ্যাঁ বাবা, ভাল হবে?

আমি বলিলাম, ভাল হবে কি, হয়ে গেছে। আপনি আর ব'সে থাকবেন না, শোন্‌গে। তারপর চলিয়া আসিলাম।

১২

পরদিন রবিবার। বেলা আটটার সময়ে হুজুর ও তাঁহার অনুচর-বৃন্দের খবর লইবার জন্য গাঙুলী মশায়ের বাড়িতে হাজির হইলাম। বৈঠকখানায় ছিলেন না। বাড়ির মধ্যে গিয়া দেখিলাম, দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া গাঙুলী মশায় চা খাইতেছেন। আমাকে দেখিয়া গম্ভীর-মুখেই কহিলেন, এস, ব'স। পাশে বসিয়া কহিলাম, আজ এত বেলা? গাঙুলী মশায় জবাব না দিয়া চা পান করিতে লাগিলেন। চুপ করিয়া মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। বিনিদ্র-রজনীর ক্লান্তি ও অপরিতৃপ্তি

মুখে-চোখে পরিস্ফুট, চোখ দুইটি ফুলিয়া উঠিয়াছে, মুখ শুষ্ক ও বিবর্ণ, ঠোঁটের কোণ দুইটি ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কহিলাম, কাল কি হ'ল ?

সে অনেক ব্যাপার।—বলিয়া চুপ করিয়া গেলেন। দিদিমা কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে আসিয়া হাজির হইলেন এবং কলিকাটি হুঁকার মাথায় দিয়া ও হুঁকাটি দাদামশায়ের হাতে ধরাইয়া দিয়া আমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, আমি বলেছিলাম না নাতি, যে ল্যাটা গাঁয়ে এসে জুটেছে, সকলকে নিকেশ না ক'রে যাবে না ? গাঙুলী মশায় তামাক টানিতে টানিতে কহিলেন, সত্যি।— বলিয়া মাঝারি-গোছের নিশ্বাস ফেলিলেন। দিদিমা উৎসাহিতা হইয়া কহিলেন, গরিবের কথা বাসী হ'লেই মিষ্টি লাগে কিনা! তখন পইপই ক'রে বলেছিলাম, এসব হাঙ্গামে থেকো না, কথা না শুনে কি ফ্যাসাদে পড়লে দেখ! আগ্রহের সহিত কহিলাম, কি ফ্যাসাদ ?

দিদিমা কহিলেন, পেঁয়াজ, পয়জার—দুই হয়ে গেছে কাল। অপমান, তার ওপর জরিমানা।

সবিস্ময়ে কহিলাম, তাই নাকি ?

গাঙুলী মশায় একাগ্রচিত্তে তামাক টানিতে লাগিলেন। গাঙুলী-গিন্নী উঁচু পর্দায় কহিলেন, তবে আর বলছি কি! সব শোন ব'সে ব'সে। আমি আবার ডাল চড়িয়ে এসেছি।— বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াই আবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, তর্জনী নাড়িয়া কহিলেন, এই আমি ব'লে দিচ্ছি, ও ছুঁড়ীকে জব্দ করা তোমাদের সাধ্যি নয়। উল্টে ও-ই যদি সবাইকে জব্দ ক'রে না ছাড়ে তো কি বলেছি।— বলিয়া রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে ছুটিলেন।

অনেকক্ষণ ক্রমাগত ধূমপান করিয়া কতকটা চাঙ্গা হইয়া উঠিয়া, গাঙুলী মশায় কহিলেন, ওঃ, কাল ভারি বিপদ গেছে! বেটা দারোগা

গুলিখেকো বাঘের মত হয়ে উঠল। যেমন লম্ফঝম্প, তেমনই দাঁত-মুখের খিঁচুনি! কখনও বলে, হাজতে পুরব; কখনও বলে, কোমরে দড়ি বেঁধে জেলা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাব। অনেক বোঝালাম, মিনতি করলাম।

ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, কিছুতেই না।

দুজনে তখন লম্বালম্বি পায়ের নীচে গড়িয়ে পড়লাম। ম্লেচ্ছটার তাতেও মন গলল না। শেষে টাকা দিয়ে ছাড়ান পেলাম।

কত টাকা?

মুখ ভারী করিয়া, বিষণ্ণ গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, অনেক। পাঁচশো টাকা। সঙ্গে সঙ্গে দিতে হ'ল।

অত রাত্রে এত টাকা পেলেন কোথায়?

ওই গাঁজাওয়ালার কাছে। অত রাত্রে উঠিয়ে হ্যাণ্ডনোট লিখে দিলাম দুজনে—টাকায় মাসে দু পয়সা সুদ।—বলিয়া প্রচণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

কখন ফিরলেন?

ফিরলাম রাত তিনটেয়। হুজুরের কাছে গেলাম, হুজুর তখনও জেগে। ঘুম কি হয়! হাকিম হয়ে এতবড় অপমান! তাও আবার একটা একফোঁটা মেয়ের কাছে!

হুজুরকে সব বললেন?

বললাম বইকি।

ঘুষের কথা বললেন?

ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, হাঁ।

কহিলাম, ওটার জন্যে কোন ব্যবস্থা করা যাবে না? ঘুষ যে নিয়েছে, তা তো হ্যাণ্ডনোট থেকেই প্রমাণ হবে।

করুণ মুখে গাঙুলী মশায় কহিলেন, হায় হায়! তার কি উপায় রেখেছে বেটা! এক মাস আগের তারিখ দিয়ে হ্যাণ্ডনোট লিখিয়েছে।

সাক্ষী?

সাক্ষী—দোকানের কর্মচারীরা আর বীরু আচায্যি।

সবিস্ময়ে কহিলাম, বীরু আচায্যি গিছল নাকি?

গাঙুলী উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, যাবে না! মাতঙ্গ পাঁকে পড়েছে, ব্যাং নয়ন ভ'রে দেখবে না! মন্থু চক্রবর্তীর সঙ্গে দল বেঁধেছে। প্রবোধ গাঙুলীর কাছে ঘরবাড়ি বাঁধা আছে, জান না? ভাবছে, মন্থুকে তেল দিয়ে সব ছাড়িয়ে নেবে।

কহিলাম, রাধানাথের ভগ্নীপতি যে!

হ'লই বা। জমি নিয়ে দুজনে ঝগড়া চলছে না! এখন খুব দারোগার কাছে যাওয়া-আসা করছে। রূপসী মেয়েটার ওপর যখন থাবল পড়বে, তখন বুঝবে মজাটা।

হুজুর কি পরামর্শ দিলেন?

বললেন, এস. ডি. ও.-কে সব বিবরণ জানিয়ে দরখাস্ত করুন, দারোগা যে ও-দলে রয়েছে, তাও খুলে লিখবেন। তা হ'লে এন্‌কোয়্যারির ভার আমার হাতেই পড়বে। তারপর এমন রিপোর্ট দোব যে, মাথায় ক'রে বুড়ীকে বাড়িতে পৌছে দিয়ে যাবে।

কহিলাম, আজ আর কোথাও বেরোবেন না। সকাল সকাল খেয়ে-দেয়ে ঘুমুনগে।

খিন্ন কণ্ঠে গাঙুলী মশায় কহিলেন, আর ঘুম! ঘুম কি আমার আসবে ভাই! এতগুলো টাকা ন দেবায় ন ধর্মায় গেল। শোধ যে কি ক'রে করব, তাই ভাবতে গেলে মাথায় আগুন জ্ব'লে উঠছে। ঘুম! ঘুম আর আমার হবে না।

উঠিলাম। উঠানে পা দিতেই দিদিমা পাছু ডাকিলেন, ওহে! এদিকে একবার শুনে যাও দেখি।

কাছে যাইতেই কহিলেন, লুকিয়ে লুকিয়ে পালাচ্ছ যে বড়! নাত-বউয়ের টানে, না, ওই ডাইনীটার টানে?

কহিলাম, মানে?

তুমিও তো খুব যাওয়া-আসা করছ শুনছি। খুব সাবধান কিন্তু। বাগে পায় তো চুষে নেবে। কাউকে বাদ দেবে না ও, ব'লে দিচ্ছি। হারাণের কি হাল হয়েছে, জান না? পদ্ম ব'লে গেল এখনই।

উৎসুক কণ্ঠে কহিলাম, কি?

আজ মাথা মুড়িয়ে প্রাশ্চিত্তির করাচ্ছে ওর বউ, তারপর নাকি রাত্রেই ওকে নিয়ে পালাবে।

কোথায়?

বাপের বাড়ি। শুধু কি ওই, পাড়ার যতগুলো বউ আছে, সকলেরই টনক নড়েছে। সব পালাবে নিজের নিজের স্বামী নিয়ে। পুরুষদের মড়ক লেগে গেছে গাঁয়ে ভাই। নাতবউকে একটু সাবধান হতে ব'লে দিয়ে আসব ভাবছি।

দোহাই দিদিমা, আমার বাড়িতে আর আতঙ্ক ছড়িয়ে আসবেন না। নাতবউ আপনার বেশ দিল ঠাণ্ডা ক'রে আছে।

দিদিমা মুচকি হাসিয়া কহিলেন, তার জন্যেই তো ভয় হয় হে। যদি কোন বিপদ-আপদ হয়ে যায় তো জানতেই পারবে না। কপাল চাপড়ে মরবে শেষে।

আমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি। আপনার নাতবউকে বইতে বইতে ঘাড়ে কড়া প'ড়ে গেছে, যেমন দাঁতই হোক, এখানে বসবে না।

বিকালে হারাণের খবর লইতে চলিলাম। দরজায় শিকল তোলা। হারাণের সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে হারাণকে কনে-বউ একা ছাড়িয়া দিয়া কোথাও যাইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে কি সঙ্গে লইয়াছে গা ধুইতে গিয়াছে? তাও সম্ভব বলিয়া মনে হইল না। তবে কি বাড়িতে আটকাইয়া রাখিয়া গিয়াছে? হারাণের নাম ধরিয়া ডাক দিলাম।

হারাণ সাগ্রহে সাড়া দিল, এস হে, শেকল, না, তালা?

জবাব দিলাম, শেকল।

হারাণ মিনতির সুরে কহিল, তবে খুলে ভেতরে এস ভাই।

বাড়ির ভিতরে গিয়া হারাণের মূর্তি দেখিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম, গলা হইতে সমস্ত মুণ্ডটায় কেশের লেশমাত্র নাই—মাথাটা একটা প্রকাণ্ড বেলের মত একেবারে চাঁছা-পোঁছা, গোঁফ-দাড়ি যৎসামান্য যাহা ছিল, মায় ভ্রূ দুইটা পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে নির্মূল। হারাণের গা খালি, পরনে একটা নূতন গামছা; গলা হইতে নূতন পৈতা ঝুলিতেছে।

কহিলাম, কি ব্যাপার?

হারাণ কহিল, এস, সব বলছি।

কাছে গিয়া বসিতেই হারাণ কহিল, কাল যে কি ক'রে রাত কেটেছে, তা আমিই জানি। ঝাঁটা হাতে এই মারে তো এই মারে, উল্টে কিছু বলতে গেলেই মূর্ছো। তারপর সকাল হতেই এই ব্যাপার। ঢোক গিলিয়া কহিল, প্রাশ্চিত্তির করতে হ'ল।

কহিলাম, ভ্রূ দুটো কামিয়ে দিয়েছ কেন?

শোকার্ত কণ্ঠে হারাণ কহিল, আমি কি নিজে কামিয়েছি? বউ গোবিন্দ নাপিতকে হুকুম করলে, মাথায় মুখে যেন একগাছি চুল না থাকে। আর বেটা গোবিন্দকে জান তো! হুকুম করতে না করতেই

একেবারে ফস ক'রে (ডান হাত দিয়া ক্ষুর-চালনার ভঙ্গী করিল) একটা ভুরু সাবাড় ক'রে দিলে, তখন আর একটাকে কি ক'রে রাখি বল ?

কহিলাম, কাপড়-চোপড়ও কেড়ে নিয়েছে নাকি ?

হারাণ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সব ঘরে চাবি দিয়ে রেখে গেছে ; পাছে দেওয়াল ডিঙিয়ে পালাই। বাইরে শেকল তুলে দিয়েও বিশ্বাস হয় নি।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আজ রাতেই আবার খানশোল (হারাণের শ্বশুরালয়) টেনে নিয়ে যাবে।

প্রশ্ন করিলাম, পদ্ম কোথায় ?

তার কথা আর ব'লো না মাইরি ! ভাত খেয়ে পুঁথি শুনতে গেছে। ওই যে সদু বামনীর বাড়িতে রোজ ভাত খাবার পর বিধবাগুলোর আড্ডা বসে, একটা রামায়ণ কিংবা মহাভারত সাক্ষী রেখে পরচর্চা করে—

কহিলাম, পদ্মই বুঝি কাল কনে-বউকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল ?

তা ছাড়া এত কুবুদ্ধি কার ? বদমাইসের জাসু কিনা ! এদিকে এত ঝগড়া, তবু সাত-তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ডেকে নিয়ে গেছে। একবার ভালয় ভালয় ফিরে আসি, ওকে তাড়াব আমি। যেখানে ইচ্ছে যাক, জায়গা-টায়গা কিচ্ছু দোব না। ছেলে তো রোজগার করছে, বাড়ি করুক গিয়ে কোথাও।

কহিলাম, গাঙুলী মশায়েরও কাল খুব বিপদ গেছে।

হারাণ কহিল, সব শুনেছি। আমাদের গেজেটটি তো সকালে এক-পাক ঘুরে এসেছেন কিনা ! কিন্তু খুব ভাল হয়েছে। ওদের একটু শাস্তি হওয়া দরকার।

বিস্ময়ের স্বরে কহিলাম, কেন ?

ওরা ভারি অন্যায় করতে আরম্ভ করেছে। একটা অনাথা অবলা মেয়েমানুষ, অল্পবয়সে স্বামী হারিয়ে গাঁয়ে এসে আশ্রয় নিলে তো সবাই তার যা কিছু সম্বল সব সাবাড় ক'রে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। যখন তা পারলে না, তখন তাকে গাঁ থেকে অপবাদ দিয়ে তাড়িয়ে দেবার জন্যে উঠে-প'ড়ে লেগে গেল।

কহিলাম, কিন্তু সরোজিনীর দারোগাবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা, গাঁয়ের ছোকরাগুলোকে হাত করা, এগুলো কি?

হারাণ বাধা দিয়া কহিল, বাধ্য হয়ে করেছে। তা ছাড়া যদি অন্যায়ই করেছে, আর তার শাশুড়ীর জন্যে তোদের বুকই ফাটছে তো তাকেই সরিয়ে নিয়ে আয়।

সরতে দেয় কই? হুজুরকে পর্যন্ত হিমসিম খাইয়ে দিলে কাল।

কই, সে কথা তো কাল কিছু হ'ল না! হুজুর বুড়ীকে নিজের মুখে জিজ্ঞাসা করলেই পারতেন, তার কষ্ট হচ্ছে কি না, সে যেতে চায় কি না! তা না ক'রে গাঙুলী মশায় আর রাধানাথকে লেলিয়ে দিলেন। আর ওরাও, আসল কথা জিজ্ঞাসা না ক'রে, সরোজিনী এই করে, সরোজিনী সেই করে, সে বদমাইস, সে বেশ্যা—এই সব অবান্তর ঝগড়া করলে।

সত্য কথা। গাঙুলী মশায় ও রাধানাথ, বৃদ্ধাকে উদ্ধার করার চেয়ে, সরোজিনীর স্বরূপ-মূর্তি হুজুরকে দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল; এবং সেই মূর্তি হুজুর যতটা দেখিয়াছেন, তাহাতেই মোহিত হইয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়; আর বোধ হয় সহজে সরোজিনীর ত্রিসীমানায় পা দিবেন না।

হঠাৎ হারাণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, কাল কার মুখ দেখে উঠেছিলাম মাইরি!

কহিলাম, পরশু রাতে তো ঘুমোও নি বলছিলে।

হারাণ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, তাই। না হ'লে, দেখে দিনটা ভাল যাবে এমন মুখ তো আমাদের ত্রিসীমানায় নেই কিনা।

কহিলাম, কি ভালটা হ'ল?

দুই চোখ ডাগর করিয়া হারাণ কহিল, ভাল নয়? সরোজিনীর মত মেয়ে আধ ঘণ্টা ধ'রে যার কোলে মাথা গুঁজে শুয়ে থাকে, হাত দিয়ে কোমর জড়িয়ে ধ'রে থাকে, তার ভাল নয়? কাল দারোগাবাবুর চোখ দেখ নি? ওর ইচ্ছে ছিল—ওই ব'সে যায়, নেহাত চক্ষুলজ্জায় পারলে না। আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, সত্যি, কি রকম রঙের জলুস দেখেছ! এই পাড়াগাঁয়ের রোদ-হাওয়াতেও একটু পোড় খায় নি। কাল মনে হচ্ছিল, মুখ নয়, যেন একরাশ তাজা পদ্মফুল নিয়ে ব'সে আছি। আর হাত দুটো কি নরম! এত জোরে ধরেছিল, তবু একটুও কষ্ট হয় নি। আর আমাদের গুলির? হাত তো নয়, যেন লোহার বেড়ি!

কহিলাম, ওসব কথা বাদ দাও।

হারাণ কহিল, কেন? হিংসে হচ্ছে বুঝি? তা দাদা সাজতে রাজি হয়েছিলে কেন? বউয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক পাতিয়ে দিয়ে জামাইদাদা সাজলেই পারতে।

কথার মোড়টা ঘুরাইবার জন্য কহিলাম, কখন যাচ্ছ তোমরা?

হারাণ কহিল, কাল ভোরে। কত বোঝাচ্ছি, এই চেহারা নিয়ে এক মাস কোথাও বার হতে পারব না, তা শুনছে না। ভারি একগুঁয়ে মেয়েমানুষ।

এই চেহারার জন্যে বাপের বাড়িতে কি কৈফিয়ৎ দেবে বলছে?

তাও ঠিক করে নি নাকি? বলবে, বাড়িতে একটি গাই গলায়

ড়ি দিয়ে ম'রে গেছে, তাই প্রাশ্চিত্তির করতে হয়েছে। সুবুদ্ধি না থাক্, কুবুদ্ধির অভাব নেই কিনা।

কহিলাম, আচ্ছা, আমি উঠি। একবার সরোজিনীর ওখানে যাব ভাবছি, খবরটা নিতে।

হারাণ করুণস্বরে কহিল, ব'লো ভাই সব বুঝিয়ে আমার কথা, কি অবস্থায় প'ড়ে গাঁ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি; যদি গাঁয়ে থাকতাম তো তাকে বুক দিয়ে আমি আগলে রাখতাম।

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া পত্নীকে কহিলাম, সরোজিনীকে একবার দেখতে যাবে না?

পত্নী বিস্ময়ের সহিত কহিলেন, কি হয়েছে ওর?

কহিলাম, না রে! জান না, কাল হঠাৎ মূর্চ্ছা হয়ে গিয়েছিল?

পত্নী আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, ওঃ, তাই। আমি বলি, আর কিছু হয়েছে।

কহিলাম, মূর্চ্ছা যাওয়াটা সোজা নাকি? মনের আর মস্তিষ্কের কতখানি উত্তেজনা হ'লে—

বাধা দিয়া পত্নী ধারালো স্বরে কহিলেন, দেখ, ব'কো না, আমার এসব ঢের দেখা-শোনা আছে। তোমরা পুরুষরাই ওতে ভুলবে, আমরা ভুলব না। আমাদের বড় মামীর মূর্চ্ছা দেখ নি?

দেখি নাই। বড় মামীকেই দেখি নাই তো তাঁহার মূর্চ্ছা দেখিব কি? বড় মামাকে দেখিয়াছি। তিনি জজের সেরেস্তাদার। কেহ কোথাও সরকারী চাকরি করে শুনিলে ইঁহারই নাম পত্নী সর্বপ্রথমে উল্লেখ করেন। ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, না।

পত্নী মৃদু হাসিয়া কহিলেন, সে ভারি মজার মূর্চ্ছা! সারাদিন বেশ

ভালমানুষ, খাচ্ছেন-দাচ্ছেন, হাসছেন-খেলছেন ; কিন্তু যেমনই মামা কাছারি থেকে বাড়িতে পা দেওয়া, অমনই মূর্ছা। আর বড় মামা সারাদিনের রোজগার পকেট খালি ক'রে হাতে গুঁজে দেবামাত্রই মূর্ছা ভেঙে উঠে বসা।

কহিলাম, সরোজিনীর মূর্ছা ও রকম মেকী মূর্ছা নয়, খাঁটি।

অধর ও ওষ্ঠ সহযোগে অবজ্ঞাসূচক ধ্বনি করিয়া পত্নী কহিলেন, খাঁটি! পদ্মর কাছে যদি না সব শুনতাম।

কহিলাম, পদ্ম এসেছিল নাকি ?

ঘাড় নাড়িয়া পত্নী কহিলেন, হুঁ, এইমাত্র তো গেল।

কি বললে পদ্ম ?

ঢঙী মেয়ের ঢঙের কথা সব ব'লে গেল। মেয়েটা সত্যি খারাপ। পরপুরুষকে জড়িয়ে ধরতে একটু সঙ্কোচ হয় না! আমাদের তো ভাবলে গা-ঘিনঘিন করে।

কহিলাম, জড়িয়ে ধরবার লোক আছে কিনা, তাই বলছ ; না থাকলে—

পত্নী ধমক দিয়া কহিলেন, ওসব কথা যেতে দাও। মোট কথা, ওখানে যাবার দরকার নেই তোমার। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, পরের বউরা মূর্ছা গেলে পুরুষদের বুক ফেটে যায়, আর নিজেদের বউরা মুখে রক্ত উঠে মরলেও দেখতে পায় না। হারাণ কোন্ লজ্জায় ওর মাথা কোলে করলে ?

কহিলাম, নিজের শালী যে!

স্ত্রী কহিলেন, শালী নয়, ওসব ধাপ্পা। পদ্ম বললে, ও কোন দিন ও-কথা শোনে নি।

কহিলাম, পাগল নাকি! সরোজিনীর মিছে কথা ব'লে লাভ কি ?

হারাণ এমন কিছু স্বনামধন্য ব্যক্তি নয় যে, মেয়েরা সব ওর শালী হবার জন্যে ঝুলোঝুলি করবে।

স্ত্রী দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, আমি বলছি, হারাণকে হাত করবার জন্যে ও মিথ্যে বলেছে। তুমি যে রকম আনাগোনা করছ, তোমাকেও ও বিপদে ফেলবে, ব'লে দিচ্ছি। সাংঘাতিক মেয়েমানুষ ও। মুচকি হাসিয়া কটাক্ষ হানিয়া কহিলেন, যদি জড়িয়ে-টড়িয়ে ধরে তো কনে-বউয়ের মত আমি ছাড়িয়ে আনতে পারব না, ব'লে দিচ্ছি। মজাটা টের পাবে তখন।

১৩

দিন চার অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম। বিভাগীয় সহকারী ইন্‌স্পেক্টর মহাশয় স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। পল্লীগ্রামের স্কুলে ইঁহাদের আগমন উপলক্ষ্যে প্রধান-শিক্ষককে যে কি অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া কেহ বুঝিবেন না। স্কুল-গৃহের সারাবৎসরের পুঞ্জীকৃত আবর্জনা পরিষ্কার করানো, ভাঙা বেঞ্চি চেয়ার ও টেবিলগুলি মেরামত করানো, স্কুলের খাতাপত্র সারা, ছাত্রদিগকে আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়া, শিক্ষকদিগের পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা, প্রত্যেক ক্লাসে শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য শিক্ষকদিগকে উপদেশ দেওয়া, ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়ের আদর-আপ্যায়ন ও আহারের ব্যবস্থা করা, এবং অনিবার্য ত্রুটিগুলি যাহাতে ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়ের শ্যেন-দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে সেই-জন্য তাঁহার বিদায়গ্রহণ পর্যন্ত দুর্গানাম জপ করা ইত্যাদি সকল কার্যই প্রধান-শিক্ষককেই করিতে হয়। কাজেই এ কয়দিন গ্রামের কোন

খোঁজ-খবর রাখার ফুরসৎ হয় নাই। গাঙুলী মহাশয় স্কুলে আসিয়া-ছিলেন বটে, কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর সাহেব চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কখন চলিয়া আসিয়াছিলেন, জানিতে পারি নাই।

সেই দিন স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিবার পর পত্নী কহিলেন, সাহেব চ'লে গেল?

আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম, গেছে। সাহেব নয়, ফাঁড়া; তা এক রকম কেটে গেছে, বছর খানেকের জন্যে। এখন নিশ্চিন্ত।

স্ত্রী কহিলেন, মুখ-হাত ধুয়ে নাও। খাবে না?

কহিলাম, চা-খাবার স্কুলে খেয়ে এসেছি, এখন আর খাব না। একটু চা দেবে তো দাও।

আচ্ছা।—বলিয়া পত্নী রান্নাঘরের দিকে গেলেন; আমিও রাজবেশ ছাড়িয়া রাখাল-বেশ ধারণ করিলাম। ইতিমধ্যে পত্নী চা আনিয়া হাজির করিলেন। খাইতে খাইতে কহিলাম, চোখে কানে কদিন দেখতে শুনতে পাই নি। গাঁয়ের কি কি খবর বল দেখি?

পত্নী কহিলেন, ভারি মজার মজার ব্যাপার সব চলছে গাঁয়ে।

উৎসুক কণ্ঠে কহিলাম, কি?

পত্নী কহিলেন, এক নম্বর, পদ্মর মূর্চ্ছা।

মানে?

ভাত খাবার পর সদু দিদিমার বাড়িতে গাঁয়ের বিধবাদের যে একটা আড্ডা বসে, সেখানে পরশুর আগের দিন পদ্ম গোবিন্দকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে—ছুঁচোর চাকর চামচিকে, তার মাইনে চোদ্দ সিকে।

কহিলাম, এ কথা বলার অর্থ?

অর্থ বুঝতে পারছ না? গোবিন্দর ভাই তিনু যে ফুন্টিকে পড়ায় কিনা, তাই।

তারপর ?

শুনে গোবিন্দ ফোঁস ক'রে উঠে বললে, শুধু আমার ভাই চানচিকে ? আর তোর ছেলে ? পদ্ম হাত নেড়ে বললে, সে বলতে হয় না, তেমন ছেলে গর্ভে ধরি নি, আমার ছেলে সরকারী চাকরে। গোবিন্দ মুখ ভেংচিয়ে বললে, সরকারী চাকরে ! তবু যদি না প্রবোধ গাঙুলীর বউয়ের দিনরাত মাথা না টিপত। পদ্ম লাফিয়ে উঠে বললে, খবরদার বলছি, আমার ছেলের নামে যা-তা বলবি না। জিব কেটে দোব। গোবিন্দও লাফিয়ে উঠে বললে, জিব সবাই কাটে ! তোরও থাঁদা নাক খুঁচিয়ে দোব না ! দেখে আয়গে যা, বিশ্বেস না হয় তো। পদ্ম গোবিন্দর হাত ধ'রে টেনে বললে, আয়, দেখাবি চল্। যদি দেখাতে পারিস, সবাইকার সামনে মাঝ-উঠোনে ঘ'সে ঘ'সে সাত হাত নাকখত দোব ; আর যদি দেখাতে না পারিস, তোর মুখে গুনে গুনে সাতবার মুড়ো ঝাঁটা মারব। তারপর দুজনে চলল প্রবোধ গাঙুলীর বাড়ি ; সদর-দরজা খোলা ছিল ; ওরা ঢুকে একেবারে উঠল দোতলায়। পা টিপে টিপে গিয়ে দেখে, সরোজিনী বিছানায় শুয়ে আছে। প্রকাশ মাথার কাছে ব'সে সরোজিনীর মাথায় হাত বুলোচ্ছে, আর সরোজিনীর পাশে প্রকাশের মুখোমুখি ব'সে পাখা করছে মিণ্টা।

ঔৎসুক্যের সহিত কহিলাম, তারপর ?

দেখে, পদ্ম চেঁচিয়ে উঠে বললে, তাই তো লো ! আমার ননীর পুতুল রাক্ষুসীদের গহ্বরে ঢুকেছে !—ব'লে ছুটে পালিয়ে এল।

সাত হাত নাকখত দেওয়ার কি হ'ল ?

আর নাকখত দেওয়া ! এসেই ধড়াস ক'রে প'ড়ে পদ্ম মূর্ছা গেল। তখন গোবিন্দই গিয়ে প্রকাশকে ডেকে নিয়ে এল।

তারপর ?

প্রকাশ ওষুধ শোঁকাতেই পদ্ম ভাল হয়ে উঠে ব'সে, কাঁদতে শুরু ক'রে দিলে। প্রকাশ বললে, চল, বাড়িতে পৌছে দিয়ে আসি। পদ্ম কেঁদে বললে, না, আমি যাব না, তুই আগে আমার পা ছুঁয়ে বল্, ওখানে আর যাবি না। প্রকাশ বললে, আমি তো নিজে যাই নি, ডাক্তারবাবু আমাকে যেতে বলেছেন। পদ্ম বললে, সে মুখপোড়া নিজে না গিয়ে তোকে পাঠিয়েছে কেন?

আমি বাধা দিয়া কহিলাম, আমারও ওই প্রশ্ন, তার নিজেরই তো যাওয়া উচিত ছিল!

পত্নী হাত নাড়িয়া কহিলেন, সবাই তো আমার মত হাবা-গোবা মেয়ে নয়। ওঁর গিন্নী নিশ্চয় ছাড়ে নি।

কহিলাম, ও তো তোমার জবাব, প্রকাশের জবাবটা কি হ'ল?

প্রকাশ বললে, তাঁর শরীর খারাপ, কদিন কোথাও বেরোন নি। তা ছাড়া আমি তো বিনা পয়সায় যাচ্ছি না। আমাকে রীতিমত টাকা দিচ্ছে। পদ্ম রেগে বললে, ও টাকার মুখে আমি ঝাঁটা মারি, তুই কিছুতেই ও-বাড়িতে পা দিতে পাবি না, দিলে আমি দেশান্তরী হব। প্রকাশ চুপ ক'রে রইল। তখন পদ্মর বন্ধুরা প্রকাশকে বোঝাতে লাগল। প্রকাশ বেঁচে থাকলে অনেক টাকা রোজগার করবে, ও-রকম একটা নষ্ট-দুষ্ট মেয়ের কাছে যেয়ে পদ্মর মত মায়ের মনে কষ্ট দেওয়া প্রকাশের মত সুসন্তানের উচিত নয়। প্রকাশ শেষে বললে, বেশ, যাব না। তুমি বাড়ি চল। তারপর পদ্মকে বাড়ি পৌছে দিয়ে প্রকাশ চ'লে এল।

আবার সরোজিনীর বাড়ি?

না, ডাক্তারখানায়। পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা ক'রে আর কি যেতে পারে?

কহিলাম, তোমার দু নম্বর খবর বল এবার।

পত্নী হাসিয়া কহিলেন, সেও ভারি মজার। পরশু দুপুরবেলায় হঠাৎ গোবিন্দ এসে হাজির হ'ল। জিজ্ঞাসা করলাম, কি গো ঠাকুরঝি, কি খবর? গোবিন্দ খুঁট থেকে একটি মোড়ক-করা কাগজ খুলে আমার হাতে দিয়ে বললে, দেখ তো, কে লিখেছে? বললাম, কার চিঠি? বললে, তিনুর বোধ হয়, ফুটির ভাই দিয়ে গেল। বললাম, তিনু তো দিনরাত ওখানেই থাকে, তা আবার চিঠি পাঠানো কেন? গোবিন্দ বিরক্ত হয়ে বললে, তুমিও ওই কথা বলছ বউ! দিনরাত ওখানে থাকবে কিসের দুঃখে? গরিব হ'লেও মাথা গোঁজবার জায়গা ওর আছে। বললাম, না ঠাকুরঝি, আমি কিছু ভেবে বলি নি। গোবিন্দ বললে, তুমি হয়তো বল নি, কিন্তু সবাই তো বলছে। দু পয়সা পাবে ব'লে সবাইকার বুক চড়চড় করছে, তাও এখনও এক পয়সা ঘরে ঢোকে নি। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, তাও তো কাল সারাদিন ঘরেই ছিল, ওদের বাড়ি যায় নি।

চিঠিটা প'ড়ে আকাশ থেকে পড়লাম।

প্রশ্ন করিলাম, কেন?

পত্নী কহিলেন, চিঠি নয়—প্রেমপত্র, ফুটি লিখেছে—তিনুকে। পাঠ লিখেছে—প্রাণের মাস্টার মশায়। নীচে লিখেছে—তোমারই জীবনে-মরণে।

সবিস্ময়ে কহিলাম, তিনেটা এর মধ্যেই খুব শিখেয়েছে তো! একেবারে প্রেমপত্র লেখা অবধি! মেয়েদের লেখাপড়ার চরম শিখিয়ে দিয়েছে একেবারে।

পত্নী সহাস্যে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন। চিন্তার ভান করিয়া কহিলাম, কিন্তু ফুটি যে তিনুকেই লিখেছে, তা নাও হতে পারে।

হয়তো তিনু ওকে লিখতে দিয়েছিল। কুন্টি লিখে, কেমন হয়েছে দেখবার জন্যে তিনুর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

পত্নী কহিলেন, তোমার তো ওই রকমই বুদ্ধি কিনা। তিনু লিখতে-টিখতে দেয় নি। ও পুরো একদিন সরোজিনীর বাড়ি যায় নি; ওকে এতক্ষণ না দেখতে পেয়ে কুন্টির বিরহ-আগুন দাউদাউ ক'রে জ্বলে উঠেছিল, তাই পত্রপাঠ দেখা দিয়ে আগুন নেবাবার জন্যে তিনুকে চিঠি লিখেছিল।

কহিলাম, তাই নাকি! কুন্টি একফোঁটা মেয়ে, তার এই কাণ্ড!

একফোঁটা মেয়ে! ষোল বছরের ধাড়ী। বুকের ভেতরটা এখন একেবারে বারুদের মত হয়ে আছে যে। পুরুষের ছোঁয়াচ লাগলেই দপ ক'রে জ্বলে উঠবে; তুমি পড়াতে গেলেও ও তোমার প্রেমে প'ড়ে যেত।

কথাটা উল্টাইয়া দিয়া কহিলাম, তিনুর মানসিক অবস্থার কোন খবর জান?

পত্নী কহিলেন, বলছি। গোবিন্দকে বোঝালাম, সরোজিনীর চিঠি— তিনু কাল পড়াতে যায় নি কিনা, তাই যেতে লিখেছে। তিনু বোধ হয় কোন কারণে রাগ করেছে। গোবিন্দ চোখ কপালে তুলে বললে, বিধবা মেয়ের ওপর রাগ আবার কি বউ? ভাল কথা নয়। তিনুকে আর আমি যেতে দোব না। থাক্ আমার রোজগার।

বললাম, না না, ওসব কিছু নয়। তুমি তিনুকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। চিঠিটা আমার কাছে থাক্, আমি বুঝিয়ে দোব।

প্রশ্ন করিলাম, তিনু এসেছিল?

পত্নী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, হুঁ, সেই দিন বিকেলে এসে আমার সঙ্গে

দেখা করলে। জিজ্ঞেস করলাম, পড়াতে যাচ্ছ না কেন? তিমু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি জানলেন কি ক'রে? বললাম, সে জেনেছি যেমন ক'রে হোক, না যাবার কারণটা কি শুনি? তিমু একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, কুন্টি বারণ করেছে। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? তিমু একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, সরোজিনী দেবীর কদিন ধ'রে দিন-রাত ঘন ঘন মূর্চ্ছা হচ্ছিল। তাই তাঁর কাছে থেকে সেবা করতে হয়েছিল। বললাম, সে তো উচিত কাজই করেছিলে, তাতে কুন্টি বারণ করলে কেন? একটু ইতস্তত ক'রে তিমু বললে, মানে, আমি একা তো নয়, মিণ্টাও করছিল; এক রাত্রি তো দুজনকেই জাগতে হ'ল। কুন্টি জাগতে না পেরে ঘুমিয়ে পড়ল, তার পরের দিন সকালেই কুন্টি হঠাৎ রেগে উঠে বললে, পিসীমা ভাল না হয়ে ওঠা পর্যন্ত আমি পড়ব না। আপনি এ কদিন আসবেন না। হেসে বললাম, কুন্টি যদি পছন্দ না করে তো মিণ্টার সঙ্গে রাত জাগবার দরকার কি? তিমু বললে, কুন্টি পছন্দ করবে না ব'লে আমি আমার কর্তব্য করব না? বললাম, বুকে হাত দিয়ে বল দেখি, কুন্টি রাগ করলে তোমার কিছু যাবে-আসবে না। তিমু চুপ ক'রে রইল। বললাম, এই চিঠি নাও, কুন্টি তোমাকে লিখেছে; রাগ ক'রে পুরুষত্ব না দেখিয়ে, তাকে ভোলাওগে যাও, আর তাড়াতাড়ি বিয়ে করগে।

তারপর?

তারপর আর কি? তিমু শুনছি, সেই দিনই ওখানে গিছল, আর বিয়েরও নাকি কথাবার্তা হচ্ছে।

কি ক'রে জানলে?

গোবিন্দ আজ ব'লে গেল, মনু চক্রবর্তী ওর সঙ্গে দেখা ক'রে বিয়ের কথাবার্তা ক'য়ে গেছে।

গাঙ্গুলী মশায়ের সহিত দেখা করিতে গেলাম। বৈঠকখানায় বসিয়া ইহার মধ্যেই লণ্ঠন জ্বালাইয়া ইউনিয়ন বোর্ডের খাতাপত্র সারিতেছিলেন, আমাকে দেখিয়া কহিলেন, এস ভায়া। তখন তোমাকে বলবার সময় হ'ল না, এস. ডি. ও. সাহেব আসছেন আসছে রবিবার।

কহিলাম, ইউনিয়ন বোর্ড দেখবেন নাকি?

তা দেখতে চান, দেখাব। খাতাপত্র সব ঠিক ক'রে রাখছি। চোখ মটকাইয়া কহিলেন, কি জন্যে আসছেন জান? আমাদের সেই দরখাস্তটার তদন্ত করতে। আমাদের হুজুর নিজে গিয়ে সব বলেছেন তো। ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, ভায়া, নেকড়ে হ'লেও বাঘ তো! মুখ শোঁকাশুঁকি আছেই।

ওরা দরখাস্ত করে নি?

গাঙ্গুলী মশায় নাসিকা উঁচাইয়া কহিলেন, করলেই বা। মুরুব্বি তো ওদের দারোগা। দরখাস্ত পাবামাত্র ছিঁড়ে ফেলে দেবে।—বলিয়া কাল্পনিক দরখাস্তটি দুই হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিবার ভঙ্গী করিলেন। তারপর ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, কিচ্ছু হবে না। কবে বুড়ীকে কাঁধে ক'রে পৌঁছে দিয়ে যায় দেখ।

বাড়ি ফিরিবার রাস্তায় মণীন্দ্রর সঙ্গে দেখা হইল। পরিধানে সাদা জিনের গলাবন্ধ কোট, পায়ে মেটে রঙের বাটার তৈয়ারি ক্যাম্বিসের জুতা, বগলে ছাতা, আমাকে দেখিয়া হাঁক দিয়া কহিল, কোথায় যাওয়া হয়েছিল—অ্যাঁ? গাঙ্গুলীর আড্ডায় বুঝি? ওই তোমার মাথা খাবে দেখছি।

জবাব না দিয়া কহিলাম, কোথায় গিয়েছিলে?

আমার মুখের দিকে তাকাইয়া ভ্রূ দুইটি নাচাইয়া কহিল, বলব কেন? সবাইকে সব কথা বলতে আছে কি?—বলিয়া চলিতে আরম্ভ

করিল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলাম। হঠাৎ মণীন্দ্র বলিয়া উঠিল, সব ব্যাটার গুড়ে বালি দিয়ে এলাম।

চুপ করিয়া থাকিয়া চলিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে মণীন্দ্র আবার বলিয়া উঠিল, হিন্দুর অনিষ্ট করতে হিন্দুর জোড়া আর নেই; মুসলমানরা ঢের ভাল।—মণীন্দ্র বোধ হয় দারোগাবাবুর কথা বলিতেছে। কিন্তু কথাটি তো সত্য। সরোজিনী গ্রামে আসার পর হইতেই, গ্রামের ছোকরারা ছাড়া সব হিন্দুধর্মধ্বজীরাই তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে; শুধু দারোগাবাবু, বিধর্মী হইয়াও, কর্তব্য-বুদ্ধি বা হৃদয়-বৃত্তি যাহারই তাগিদে হোক, সরোজিনীর সপক্ষে দাঁড়াইয়াছেন।

মণীন্দ্র হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করিল, হ্যাঁ হে মাস্টার, এস. ডি. ও. সাহেবকে যে ওরা দরখাস্ত করেছে সরোজিনীর বিরুদ্ধে, সেটা তো তোমার লেখা, নয়?

থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, কে বললে?

মণীন্দ্র কহিল, কে আবার বলবে? আমি বললাম—

আর্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, কাকে বলেছ?

মণীন্দ্র বেপরোয়াভাবে কহিল, কেন? এস. ডি. ও. সাহেবকে, জিজ্ঞাসা করছিলেন কিনা! তা এম. এ. পাস ক'রে এত ভুল লিখেছ কেন? সাহেব চোখ-মুখ কুঁচকে একাকার।

আমি কড়া গলায় কহিলাম, দেখ মনুদা, তুমি অত্যন্ত বোকা। কি ক'রে জানলে তুমি, আমি লিখেছি?

মণীন্দ্র জবাব দিল, গাঁয়ে তোমার ছাড়া ইংরিজীতে দরখাস্ত লেখার বিদ্যে আর কার আছে?

মুখ ভেংচাইয়া কহিলাম, বিদ্যে আর কার আছে! কেন, তোমাদের মামাবাবুটি এসেছে, ও লিখতে পারে না?

মণীন্দ্র আকাশ হইতে পড়িল। চোখ বড় করিয়া, ঘাড় কাত করিয়া কহিল, ঠিক ধরেছ তো! ঐ ব্যাটারই তো লেখা। তাই তো বলি, আমাদের মাস্টারের মত বিদ্বান লোক—ছি ছি! হাকিম কি ভাবলেন বল দেখি? আমাকে মনে করিয়ে দিতে হয়।

মনে করিয়ে দিতে হয়! আমি কি তোমার সঙ্গে গিয়েছিলাম নাকি?

অনুতাপের সুরে মণীন্দ্র কহিল, তাই তো, তুমি সঙ্গে থাকলে ঠিক হ'ত।—বিরক্তির সহিত কহিল, বললাম তখন সরোজকে, মাস্টারকেও ধ'রে নিয়ে যাই। বললে, না না, যাকে-তাকে নিয়ে গিয়ে কাজ নেই।

যাকে-তাকে কথাটা খচ করিয়া মনের গায়ে বিঁধিল। সরোজিনীর আদর-আপ্যায়ন তাহা হইলে মৌখিক, অন্তরে সে আমাকে পর বলিয়াই জানে।

মণীন্দ্র ক্ষোভের সহিত কহিল, ব্যাটার নামটা ক'রে দিলে কত কাজ এগিয়ে যেত বল দেখি? তোমার নাম করাটা ভাল হয় নি। ভাবলে, মাস্টারের মত লোক ও-দলে আছে! যেমন ক'রেই হোক, এম. এ. পাস করেছে তো। আবার নিজেই প্রবোধ মানিয়া কহিল, যাকগে, ওতে কিছু হবে না। তোমার ইংরিজী প'ড়েই—

ধমক দিয়া কহিলাম, আবার বলছ, আমার ইংরিজী?

মণীন্দ্র থতমত খাইয়া কহিল, আরে না না, তোমার ইংরিজী নয়, কিন্তু সাহেবকে বলেছি তো তোমার ইংরিজী, সেইটাই সে বুঝে ব'সে আছে। কিন্তু থাক্‌গে ব'সে, তুমি তো জান, তোমার লেখা নয়। কিন্তু বাজে কথা যাক, আজ আজিজ সাহেব খুব উপকার করেছে ভাই, আমরা দু ভাই-বোনে চিরদিন তার কাছে কেনা হয়ে থাকব।

অন্যমনস্কভাবে চুপ করিয়া রহিলাম।

মণীন্দ্র কহিল, আজিজ সাহেবকে জান না? ঐ যে হে, চপাইয়ে

বাড়ি, মস্ত বড়লোক, জমি-জায়গা পুকুর-বাগান বিস্তর ; নিজ জোতেই তো দুশো বিঘে জমি ; বিশ জোড়া বলদ, ছাগলের মত নয়, প্রকাণ্ড—এক-একটা যেন হাতি ; গাই-বাছুর যে কত, তার ইয়ত্তা নেই। আর খামার যদি দেখ তো হাঁ ক'রে চেয়ে থাকবে, ধানের মরাইয়ে ঠাসা, পা ফেলবার জায়গা নেই।

আজিজ সাহেবকে জানি। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সরকার-মনোনীত সভ্য। এ তল্লাটের একজন অবস্থাপন্ন জাঁদরেল ব্যক্তি ; আমাদের ইউনিয়ন-বোর্ডেরও একজন সভ্য।

মণীন্দ্র বলিতে লাগিল, তা ছাড়া খাঁটি মুসলমান, ইয়া চাপদাড়ি, পাঁচ ওখ্‌ত নমাজ করে।

বিরক্তির সহিত কহিলাম, জানি হে, জানি আজিজ সাহেবকে, অত ব্যাখ্যান ক'রে বলতে হবে না। কি করেছে বল না!

মণীন্দ্রও মেজাজের সহিত কহিল, অত ধমক কিসের বল দেখি? ছাত্র পেয়েছ নাকি? যাও, বলব না।—বলিয়া আবার চলিতে শুরু করিল। আমি পিছু পিছু চলিতে লাগিলাম। ভুল ইংরেজীটি আমার লেখা বলিয়া এস. ডি. ও. সাহেব জানিয়াছেন ভাবিয়া মনটা বিরক্তিতে ভরিয়া গিয়াছিল, কথা কহিতে বা শুনিতে ভাল লাগিতেছিল না। মণীন্দ্র হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ভালয় ভালয় শোন তো সব বলছি। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মণীন্দ্র বলিতে লাগিল, দারোগাবাবু কাল আজিজ সাহেবকে ডেকে সরোজিনীর ওপর গ্রামের লোকের অত্যাচারের সব পরিচয় দিলেন। শুনে আজিজ সাহেবের চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল গাল বেয়ে পড়তে লাগল।

কহিলাম, দেখতে পেলে কি ক'রে? নাক চোখ বাদ দিয়ে সারা মুখে তো দাড়ির জঙ্গল।

মণীন্দ্র বিরক্ত হইয়া কহিল, জঙ্গল তো কি হবে? কাঁদলে বোঝা যায় না? গোঁফ-দাড়ি ভিজে সপসপ করছিল যে।

তাই বল।

মণীন্দ্র রাগিয়া উঠিয়া কহিল, অত কথা ধরলে কথা বলা যায় না। শোন না. আজিজ সাহেবের চোখ থেকে জল পড়তে লাগল, বললে যে, সে জান দিয়ে সাহায্য করবে। তারপর দারোগা সাহেব তাকে যা যা করতে হবে, ব'লে দিলেন। ঠিক হ'ল, আমাকে নিয়ে জেলায় গিয়ে ও যথাকর্তব্য সব করবে।

কহিলাম, তারপর?

আজ সকালে গিয়েছিলাম। ভাল উকিল দিয়ে মুসাবিদা করিয়ে দরখাস্ত লেখানো হ'ল, আজিজ সাহেবের সঙ্গে এস. ডি. ও. সাহেবের বাড়ি গিয়ে দরখাস্ত দিলাম। আজিজ সাহেব সমস্ত ঘটনা সাহেবকে বুঝিয়ে বলতে তিনি বললেন, ও-পক্ষেরও দরখাস্ত পেয়েছি।—ব'লেই কাগজের তাড়া থেকে তোমাদের দরখাস্ত—

বাধা দিয়া কহিলাম, তোমাদের মানে?

মণীন্দ্র কহিল, বেশ বেশ। ঐ ব্যাটাদের দরখাস্ত প'ড়ে শুনিয়ে দিলেন, শেষে বললেন, রবিবার নিজে এসে তদন্ত ক'রে সব ঠিক ক'রে দিয়ে যাবেন।

কহিলাম, এই বারেই তিমুকে নিয়ে গিয়ে লাইব্রেরির বই-টইগুলো কিনে আনলে না কেন? এস. ডি. ও. সাহেবকে দিয়ে এই বারেই লাইব্রেরিটার উদ্বোধন করিয়ে নিলে হ'ত।

মণীন্দ্র ভারী গলায় কহিল, লাইব্রেরি-টাইব্রেরি ওসব হবে না। সরোজ বলেছে, ও এখন থাক্। পরে করলেই হবে। এখন অনেক

খরচ। তা ছাড়া তিনুরও ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো আর চলবে না।

আন্দাজে কতকটা বুঝিলাম ; তবু প্রশ্ন করিলাম, কেন ?

তিনুর সঙ্গে কুন্টির বিয়ে দোব ভাবছি, সরোজ সব খরচ দেবে।

কহিলাম, ওদের মত হয়েছে ?

মণীন্দ্র তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, মত! হাত ধুয়ে ব'সে আছে। ছেলে তো না বলতে বলতেই রাজি।

আর গোবিন্দ ?

ঢোক গিলিয়া মণীন্দ্র কহিল, হ্যাঁ, সেও রাজি। ব্যারিং পোস্টে তো আর চালান হচ্ছে না, রীতিমত পয়সা খরচ করা হবে। বললাম যে, সরোজিনী সব খরচ দেবে বলেছে।

প্রবোধ গাঙুলীর বাড়ির সামনে আসিতেই মণীন্দ্র কহিল, এস না, একবার সরোজিনীর সঙ্গে দেখা ক'রে যাবে। সেদিন এত বিপদ দেখে গিয়েও তো একবার উঁকি পর্যন্ত মার নি। ঢের ঢের নেমকহারাম দেখেছি, তোমার মত দেখি নি। আর ওদিকে গাঙুলী বুড়োর বাড়ি রোজ যাওয়া হচ্ছে।

কহিলাম, দেখ মনুদা, মিথ্যে কথা ব'লো না। ইন্‌স্পেক্টর আসার হিড়িকে নাইতে খেতে সময় পাই নি, লৌকিকতা করব কি ?

ওঃ, তাই! তা চল না একবার। এতবড় একটা কন্যাদায় ঘাড়ে চেপে বসেছে। ঘাড় থেকে নাগাবার একটা ফন্দি-ফিকির বাতলে দাওগে দেখি, তুমি তো এসব বিষয়ে ওস্তাদ লোক।

সরোজিনীর 'যাকে-তাকে' কথাটা এখনও মনের গায়ে খচখচ করিতেছিল। তাই এড়াইবার জন্য কহিলাম, হ্যাঁ, ওস্তাদ বইকি। কতগুলো মেয়ে পার করলাম এই বয়সে!

তা নাই বা করলে। বুদ্ধি-সুদ্ধি তো আছে? অন্য উপকার তো কোন দিন কর নি, করবেও না, এক-আধটা পরামর্শ দিয়ে উপকার করতেও অনিচ্ছে?

যাইতেই হইল। উঠানে পা দিতেই দেখিলাম, মন্নুর ও বীরু আচায্যির একপাল ছেলেমেয়ে উঠানে কলরব সহকারে খেলা করিতেছে। রান্নাঘরের দাওয়ায় গোবিন্দ, মিণ্টা ও মন্নু চক্রবর্তীর স্ত্রী মুখামুখি বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছে।

মণীন্দ্র হাঁক দিয়া কহিল, ওরে কে আছিস, একটা শতরঞ্জি পেতে দিয়ে যা তো। আমাকে কহিল, দাঁড়াও হে মাস্টার, আসছি।—বলিয়া পাশের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। মণীন্দ্র বিবাহের অছিলায় সপরিবারে এখানে আড্ডা গাড়িয়াছে বুঝিলাম। ফুল্টি আসিয়া একটা ছোট শতরঞ্জি পাতিয়া দিল। আমার সহিত চোখোচোখি হইবামাত্র ফুল্টি লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া লইল। তাহার গোপন দুষ্কর্মের কথা আমরা জানিতে পারিয়াছি, ফুল্টি বোধ হয় জানে।

মণীন্দ্র খালি গায়ে আসিয়া কহিল, ব'স হে মাস্টার। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? শতরঞ্জিতে বসতে মন সরছে না বুঝি? সাহেব মানুষ তো!

বলিলাম, না না, তা কেন?—বলিয়া জুতা খুলিয়া বসিয়া পড়িলাম।

মণীন্দ্র পরনের কাপড় হাঁটুর উপর পর্যন্ত তুলিয়া দিয়া চৌকস হইয়া বসিয়া আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আজ ভারি ছুটোছুটি করতে হয়েছে। যাক, কাজ এক রকম হাসিল করা গেছে তো। আর বাছাধনদের চুলবুল করতে হবে না।

চুপ করিয়া রহিলাম।

মণীন্দ্র কহিল, আর একদিন আবার গিয়ে বিয়ের জিনিসপত্রগুলো কিনে আনতে হবে।

কহিলাম, তিন্নুকে নগদ টাকা না দিয়ে কিছু জমি-জায়গা ক'রে দাও না।

মণীন্দ্র বিজ্ঞের মত কহিল, সব হবে। সরোজ যখন রয়েছে, কোন ব্যবস্থার জন্যে কারও মাথা ঘামাতে হবে না।

কিঞ্চিৎ উষ্মার সহিত কহিলাম, কাউকে যখন মাথা ঘামাতে হবে না, তখন আমাকে মিছিমিছি টেনে আনলে কেন?

সরোজিনী আসিয়া হাজির হইল। আমাকে দেখিয়া হাসিয়া কহিল, দাদা, পথ ভুলে এসেছেন নাকি? বোন পোড়ারমুখী একেবারে মরেছে, না, এখনও বেঁচে আছে, দেখবার জন্যে?

হাসি দেখিয়া বিগলিত হইলাম না। নীরস কণ্ঠে কহিলাম, ভারি ব্যস্ত ছিলাম কদিন, ইন্‌স্পেক্টর স্কুল দেখতে এসেছিলেন।

সরোজিনী গম্ভীর মুখে কহিল, ওঃ, তাই! তা কাউকে পাঠিয়েও একবার খবর নিতে পারতেন।

কহিলাম, খবর রোজই পাচ্ছি। যাক, ভাল আছ তো?

সরোজিনী কহিল, কই আর ভাল! সেদিন তো প্রায় সারারাতই মূর্ছা হয়েছিল, তার পরদিনও অনেকবার, আজ দুদিন একটু ভাল আছি, দুবার ক'রে হয়েছে মাত্র।

ডাক্তার এসেছিল কোন দিন?

সরোজ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, ডাক্তার তো একদিনও এ বাড়িতে পা দেয় নি। রাধানাথ ঠাকুরপোরা মানা ক'রে দিয়েছে বোধ হয়। তবে প্রকাশ এসেছিল। ভারি ভাল ছেলেটি! ও-মায়ের ছেলে ব'লে মনেই হয় না।

প্রকাশ এখনও আসছে নাকি ?

ওর মা নাকি আসতে মানা করেছে। তবু আসে দিন একবার ক'রে, রাত্রে বাড়ি ফেরবার সময়ে।

মণীন্দ্র কহিল, বিনা পয়সায় ভেবো না, রীতিমত ফী দেওয়া হচ্ছে।

সরোজ কহিল, কই আর ফী দেওয়া হচ্ছে! প্রথম দুদিন নিয়েছিল, আজকাল নিচ্ছে না। পকেটে গুঁজে দিলেও ফিরিয়ে দেয়, বলে, আপনার লোকের কাছে ফী নোব কি? একটু চুপ করিয়া থাকিয়া উচ্ছ্বাসের সহিত কহিল, ভারি ভাল ছেলে, আমাকে মাসীমা ব'লে ডাকে।

প্রকাশ-প্রসঙ্গ বন্ধ করিবার জন্য কহিলাম, তিনকড়িকে দেখছি না ?

সরোজিনী হাসিয়া কহিল, জানেন না বুঝি, ফুটির সঙ্গে ওর বিয়ের কথা হচ্ছে যে। বিয়ের কথাবার্তার পর থেকে আর লজ্জায় আসে না সব সময়। দুবেলা দুবার খবর নিতে আসে শুধু।

মণীন্দ্র কহিল, মাস্টার বলছে, তিনুকে নগদ টাকা না দিয়ে, জমি দিতে।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সরোজিনী কহিল, তোমার যদি তাতেই সুবিধে হয়, তাই কর।

কথাটা উল্টাইয়া দিয়া মণীন্দ্র কহিল, গোবিন্দ এসেছে।

সরোজিনী ব্যস্ত হইয়া কহিল, তাই নাকি! কোথায় ?

মণীন্দ্র কহিল, রান্নাঘরে ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে।

আমার দিকে চাহিয়া সরোজিনী কহিল, আমি ওঁর সঙ্গে একটু কথাবার্তা কইগে, আপনাদের চা খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি, না খেয়ে যাবেন না কিন্তু।—বলিয়া আপত্তির অবসর না দিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

১৪

পরদিন বিকালে দারোগাবাবু গ্রামের ও ইউনিয়ন-বোর্ডের অধীনস্থ অন্যান্য গ্রামের গণ্য-মান্য ব্যক্তিদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। যথাসময়ে হাজির হইয়া দেখিলাম, ইহার মধ্যেই সকলে উপস্থিত হইয়াছেন। এক পাশে বসিয়া রাধানাথ ও গাঙুলী মশায়, দোলগোবিন্দ এবং আমাদের পাড়ার আরও অনেকে, আর এক পাশে মণীন্দ্র, বীরু আচার্যি, আজিজ সাহেব ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র, এবং বিভিন্ন গ্রামের আরও অনেক ভদ্রলোক, মাঝখানে চেয়ারে বসিয়া দারোগাবাবু। মুশকিলে পড়িলাম। কোন্ পক্ষে বসিব? গাঙুলী মশায় ইঙ্গিতে তাঁহার পাশে বসিবার জন্য ডাকিলেন; মণীন্দ্র হাঁকিল, এ দিকে এস হে মাস্টার।—বলিয়া আর সকলকে ঠেলাঠেলি করিয়া জায়গা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। দারোগাবাবু মুশকিল আসান করিলেন, একজন কন্স্টেব্লকে ডাকিয়া একটা চেয়ার আনাইয়া তাঁহার পাশেই বসিতে বলিলেন। বসিতেই রাধানাথ মুখ ভার করিল, মণীন্দ্র স্পষ্টভাবেই বলিয়া উঠিল, হাকিম।

দারোগাবাবু তাঁহার বক্তব্য বলিতে শুরু করিলেন, এস. ডি. ও. সাহেব আগামী রবিবারে আসবেন, এ কথা বোধ হয় আপনারা অনেকেই শুনেছেন। আমাদের মহামান্য সম্রাট বাহাদুর জার্মান দস্যুদের জব্দ করবার জন্যে যুদ্ধ করছেন। আমাদের সকলেরই উচিত এই যুদ্ধে তাঁকে দৈহিক ও আর্থিক সাহায্য করা। যাঁদের ক্ষমতা আছে, তাঁরা সৈন্যদলে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করুন। (শ্রোতৃমণ্ডলী সকলেই একযোগে 'না'-সূচক ঘাড় নাড়িল।) আর তা না করলে টাকা দিয়ে সাহায্য করুন।। (শ্রোতৃমণ্ডলী ঘাড় নাড়ার পরিবর্তে মুখ গম্ভীর করিল।)

দারোগাবাবু গাঙুলী মশায়ের উদ্দেশে কহিলেন, আপনি, রাধানাথ-বাবু ইত্যাদি যাঁরা অবস্থাপন্ন ব্যক্তি, তাঁরা আপনাদের অবস্থানুযায়ী যে যা পারেন তা তো নিশ্চয়ই দেবেন, তা ছাড়া আপনার ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হিসাবে একটি কাজ করা উচিত; অবশ্য আমার বলবার কোন অধিকার নেই, তা হ'লেও আপনাদের বন্ধু-হিসাবে বলছি: ইউনিয়ন-বোর্ডের তহবিল থেকে অন্তত একশো টাকা দেওয়া উচিত। ওই টাকাটা পরে ট্যাক্স আদায় করবার সময়ে সকলের কাছ থেকে আপনি আদায় ক'রে নেবেন।

গাঙুলী মশায় নীরব রহিলেন, কিন্তু প্রতিবাদ করিল রাধানাথ, তা হ'লে আমরা যা দোব ট্যাক্সের সঙ্গেই দোব।

দারোগাবাবু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, আপনার যা ইচ্ছে হয় করবেন।

মণীন্দ্র বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িয়া কহিল, ট্যাক্সের সঙ্গে আর কত আদায় হবে? দু-চার আনা ক'রে হয়তো। যাদের জমি-জমা তেজারতি-মহাজনি দোকানদানি আছে, তারাও যদি টাকা না দেয় তো সম্রাট বাহাদুর যুদ্ধ বন্ধ ক'রে দেবেন, তখন বুঝবে সব মজাটা জার্মানদের গুঁতো খেয়ে।

দারোগাবাবু বাধা দিয়া কহিলেন, মণীন্দ্রবাবু, চুপ করুন।

তারপর কহিলেন, এস. ডি. ও. সাহেব আমাকে যা বলতে ব'লে পাঠিয়েছেন, তাই বললাম। এর পর যা ইচ্ছে হয় আপনারা করবেন। এস. ডি. ও. সাহেব রবিবার চারটের সময়ে এখানে এসে পৌছুবেন। আপনারা সকলকে জানিয়ে দেবেন যে, সকলে যেন সেই দিন বেলা তিনটের সময় এখানে এসে হাজির হয়। এখানকার কাজ শেষ ক'রে তাঁকে আবার অন্য কাজের জন্যে অন্যত্র যেতে হবে।—বলিয়া রাধানাথ ও গাঙুলী মশায়ের মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। তারপর

গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া কহিলেন, বেশ, তা হ'লে আপনারা সেদিন ঠিক সময়ে এখানে এসে হাজির হবেন, আর যত পারেন নিজের নিজের গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবেন, মোট কথা—আপনাদের সকলের যে এ বিষয়ে খুব উৎসাহ আছে, এটা যেন এস. ডি. ও. সাহেব বেশ বুঝতে পারেন।—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল।

গাঙ্গুলী মশায়, রাধানাথ ও অন্যান্য সকলে দারোগাবাবুকে নমস্কার করিয়া বিদায় লইলেন। আমিও গাঙ্গুলী মশায়ের সঙ্গে যাইবার উপক্রম করিতেই দারোগাবাবু কহিলেন, বসুন না একটু, এত তাড়াতাড়ি কিসের?

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, ব'স ভায়া তুমি, আমরা চলি। রাধানাথ প্যাচার মত মুখ করিয়া তাঁহার অনুবর্তী হইল।

দারোগাবাবু বসিয়া কহিলেন, বসুন, কি কাজ এখন আছে? একটু গল্প-সল্প করা যাক। আমি, মনুদা, আজিজ সাহেব ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি যে কয়জন ছিলাম, বসিলাম। দারোগাবাবু আমার দিকে তাকাইয়া আজিজ সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, ওঁকে চেনেন?

ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, না।

দারোগাবাবু কহিলেন, উনি আজিজ সাহেবের ভাইপো, নাম—আবদুল সত্তর, এখানে থাকেন না। আসানসোলে ওঁর মামার মস্ত বড় চামড়ার কারবার। উনিই তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী। তাই সব দেখা-শোনা করবার জন্যে ওখানেই থাকেন। মৃদু হাস্য সহকারে কহিলেন, একটা বিশেষ কাজের জন্যে এখানে এসেছেন।—বলিয়া সত্তর সাহেবের দিকে তাকাইলেন। তারপর আমাকে উদ্দেশ করিয়া সত্তর সাহেবকে

কহিলেন, ইনি এ গাঁয়ের স্কুলের হেডমাস্টার।—বলিয়া আমার নাম, পদবী ও বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত ডিগ্রীর উল্লেখ করিলেন।

আমি মুখে সৌজন্যসূচক হাসি ফুটাইয়া সত্তরকে নমস্কার করিলাম, কিন্তু সে গম্ভীরমুখে গ্যাঁট হইয়া বসিয়া রহিল।

দারোগাবাবু কহিলেন, আপনাদের ইউনিয়নে এত ভাল ভাল লোক থাকতে আপনারা যে কেন গাঙ্গুলী মশায়ের মত একটা লোককে স্কুলের সেক্রেটারি করেছেন, তা বুঝতে পারি না। না জানে লেখাপড়া, না দেয় একটা পয়সা। আজিজ সাহেব রয়েছেন, সত্তর সাহেব রয়েছেন, এঁদের করলেই তো পারেন।

কহিলাম, আজিজ সাহেব তো স্কুল-কমিটীতে রয়েছেন, চেষ্টা করুন না।

মণীন্দ্র ধমকের সুরে কহিল, শুধু 'চেষ্টা করুন না' বললে হবে না, তোমাকেও চেষ্টা করতে হবে। এদিকে মুখে ভালমানুষি দেখিয়ে ভেতরে ভেতরে যে ওদের দলে থাকবে, তা হবে না। তোমাকে তো চিনি।

দারোগাবাবু হাসিয়া কহিলেন, মণীন্দ্রবাবুর স্পষ্টাস্পষ্টি কথা, মুখে-পেটে আলাদা কিছু নেই।

মনে মনে মণীন্দ্রের মুণ্ডপাত করিয়া কহিলাম, আমার আর দলাদলি কি? মাস্টার মানুষ, সব দলেই আছি। যিনিই সাহায্য চাইবেন, সাধ্যমত সাহায্য করব।

আজিজ সাহেব কহিলেন, ইউনিয়ন-বোর্ড দখল না করলে কিছু হবে না। এস. ডি. ও. সাহেব তো আশা দিয়েছেন, দেখা যাক আসছে বারে।

সত্তর সাহেব চুপ করিয়া থাকিয়া শিস দিবার ভঙ্গীতে অধরৌষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া রহিল।

সত্তর সাহেবের বয়স প্রায় পঁচিশ, গায়ের রঙ তামাটে; পরিধানে লংক্লথের পায়জামা, গায়ে আদ্দির চুড়িদার পাঞ্জাবি ও তাহার নীচে রঙিন গেঞ্জি; পায়ে পেটেণ্ট-লেদারের পাম্পশু; দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার করিয়া কামানো, গাল বসা, চোখ ছোট ও চোখের কোলে সুস্পষ্ট কালো দাগ; নাকটা আগার দিকে খানিকটা চ্যাপ্টা, ঠোঁটের কোণ দুইটা ডাক্তারি ছুরির অগ্রভাগের মত নীচের দিকে বাঁকানো। মোট কথা, ইহার মুখ ও চোখ দেখিলেই মনে হয়, ইহার বুদ্ধি নাই, বিচার নাই, দয়া-মায়া নাই, বিনয়ের লেশমাত্র নাই এবং নারীদেহের উপরও ইহার লালসার অন্ত নাই।

কর্কশকণ্ঠে সত্তর কহিল, দখল করতে চাইলে ঠেকায় কে, টাকা ঢাললে সব ব্যাটাই ভোট দেবে। আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, কি মাস্টারবাবু, দেবে না?

আমি জবাব দিলাম না। দারোগাবাবু কহিলেন, সে কথা এখন থাক্। এখনও দেরি আছে। তবে চেষ্টা করতে হবে এখন থেকে। আর মাস্টার মশায় হাতে থাকলে চেষ্টা সফল হবে ব'লেই মনে হয়।

সত্তর সাহেব কহিল, মাস্টারকে হাত করবার আমি ব্যবস্থা ক'রে দোব। তার জন্যে ভাবনা নেই। হাসিয়া কহিল, মাস্টারই হোক, আর যেই হোক, পয়সা পেলে—

আজিজ সাহেব বাধা দিয়া কহিলেন, ওসব কথা বাদ দাও। আমরা তা হ'লে চলি দারোগাবাবু, অনেকটা রাস্তা যেতে হবে, রাস্তাও ভাল নয়।—বলিয়া উঠিয়া পড়িল।

উহারা চলিয়া যাইবার পর, দারোগাবাবু কহিলেন, অশিক্ষিত কিনা, কথার কোন মাত্রা নেই। মাস্টার মশায়, কিছু মনে করবেন

না। খোঁচা খাইয়াও জবাব দিই নাই, পিঠে হাত বুলাইবার চেষ্টাতেও জবাব দিলাম না।

মণীন্দ্র হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, চল হে মাস্টার, যাবে তো। অনেক কাজ বাড়িতে। নমস্কার দারোগাবাবু।—বলিয়া আমার অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেল। আমিও দারোগাবাবুকে নমস্কার করিয়া মন্টুদার সঙ্গ লইবার জন্য ছুটিলাম।

নাগাল পাইতেই হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিলাম, রেস দিচ্ছ নাকি? কি অত কাজ শুনি? মণীন্দ্র ঝাঁজের সহিত কহিল, যাও যাও। হাকিম মানুষ তোমরা। আমাদের মত লোকের সঙ্গে কেন? বিস্ময়ের সহিত কহিলাম, কি হ'ল? ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মণীন্দ্র কহিল, কি হ'ল? আমরা বসলাম বেঞ্চিতে, আর তুমি গিয়ে বসলে কিনা দারোগাবাবুর পাশে চেয়ারে? একটু সমীহ হ'ল না?

কহিলাম, কি করব? দারোগাবাবু বসতে বললেন যে।

মুখ ভেংচাইয়া মণীন্দ্র কহিল, বসতে বললেন যে! লাটসাহেব কিনা! ওর জন্যে চেয়ার রিজার্ভ ক'রে রেখেছিলেন! আর এতবড় একটা এস্টেটের ম্যানেজার বসল বেঞ্চিতে! মুরোদ বুঝে কাজ ক'রো মাস্টার, না হ'লে অপমান হবে ব'লে দিচ্ছি। কড়া গলায় কহিলাম, দিনের বেলাতেই আজ টেনেছ নাকি? না, টাকা পয়সা নেড়ে মাথা ঘুরে গেছে? মণীন্দ্র কিছু দমিয়া গিয়া কহিল, মানে?

মানে আর কি? ভাবছ, সবাই তোমার প্রজা আর খাতক। ভদ্রতার বালাই তোমার কোন দিন ছিল না, এখন আবার পুরোদস্তুর জানোয়ার হয়ে গেছ, তোমার সঙ্গে ভদ্রলোকের আর কথাই বলা চলে না।—বলিয়া গটগট করিয়া আগাইয়া চলিলাম। মণীন্দ্র পিছন হইতে পিঠে হাত দিয়া কহিল, ভায়া যে একেবারে রেগে টঙ হয়ে

গেলে! অভদ্র, জানোয়ার, গেঁজেল—এক নিশ্বেসে কত কি ব'লে দিলে! লেখাপড়া শিখলে মুখ্‌খ্যু দাদাগুলোর খাতির বুঝি আর করতে নেই? রাগত স্বরে কহিলাম, দাদা মুখ্‌খ্যুই হোক, আর পণ্ডিতই হোক, দাদার মত ব্যবহার না করলে খাতির পাবে কি ক'রে?

জোর করিয়া আমাকে থামাইয়া মণীন্দ্র কহিল, দাদার মত ব্যবহার করি না আমি? তোমার যে কত জায়গায় কত সুখ্যাতি করি, তার ঠিক-ঠিকানা আছে? বলি, আমার এক ভাই—এম. এ. পাস, মস্তবড় বিদ্বান, এ তল্লাটে এমন ইংরিজী কেউ জানে না।

প্রবোধ গাঙ্গুলীর বাড়ির কাছে উপস্থিত হইলাম। বাড়ির পিছনের জমিটা পরিষ্কার করিয়া তিনকড়ি টর্চলাইট-সমিতির জন্য ব্যায়াম-সমিতি স্থাপন করিয়াছে। কাছে আসিতেই দেখিতে পাইলাম, জন দুই প্যারালেল বারের উপর দুলিতেছে, জন চার ডন ফেলিতেছে, তিনকড়ি ও আর একজন মুগুর ভাঁজিতেছে, এবং বাকি কয়েকজন খালি ওঠা-বসা করিতেছে। আমাকে দেখিয়া তিনকড়ি মুগুর-হস্তেই কাছে আসিয়া কহিল, কিসের মীটিং ছিল আজ?

মণীন্দ্র ভারিক্কী সুরে কহিল, সে গোপন ব্যাপার। তোমরা ছেলে-মানুষ, ওসব জানবার দরকার নেই।—বলিয়া পাশ কাটাইয়া বাড়িতে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেই বাকি ছেলেগুলা আসিয়া আমাদের দুইজনকে ঘিরিয়া ফেলিল। মণীন্দ্র হাঁকিয়া কহিল, ভারি সাহস তো তোদের দেখছি! যার শিল, যার নোড়া, তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া! আমিই আখড়া খুলে দিলাম, আর আমারই ওপর শক্তির পরীক্ষা!

তিনু দৃঢ়কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, আমরা শুনলাম, যুদ্ধের চাঁদা আদায় করবার জন্যে নাকি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এখানে সভা করবেন?

কহিলাম, কে বললে তোমাদের?

শুনেছি আমরা।

বেশ তো! তাতে তোমাদের আপত্তি কি?

তিনু কহিল, আমাদের আপত্তি এই—যুদ্ধে চাঁদা দিতে মহাত্মা গান্ধী নিষেধ করেছেন। তাঁর আদেশ কারও অমান্য করা উচিত নয়।

কহিলাম, মহাত্মা গান্ধী নিজের বিশ্বাসমতে যা বলবার বলেছেন। তাতে দেশের অনেক বড়লোক সায় দেন নি, এমন কি কংগ্রেসের অনেক নেতাও তাঁকে সমর্থন করেন নি। তা ছাড়া মহাত্মা গান্ধীর আদেশ সরকার-বাহাদুর মানতে বাধ্য নন। যুদ্ধের চাঁদা আদায় করবার তাঁদের ন্যায্য অধিকার আছে।

পাঁচু এতক্ষণ ডন করিতেছিল, কাজেই বুক চিতাইয়া, ঘুষি বাগাইয়া, আগাইয়া আসিয়া কহিল, কিসের অধিকার?

কহিলাম, রাজার অধিকার। তোমরা তাঁদের প্রজা, তাঁদের আদেশ মানতে তোমরা আইনত ও ধর্মত বাধ্য।

সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল, আমরা মানব না।

মণীন্দ্র হাঁকিয়া কহিল, মাস্টার! তর্ক থামাও দেখি। আমি বলছি। ছোকরাদের উদ্দেশ করিয়া কহিল, তা তোমরা কি করতে চাও বল দেখি, অ্যাঁ?

তিনু দুই হাতে মুগুর দুইটা খাড়া করিয়া ধরিয়া নাচাইতে নাচাইতে সবিক্রমে কহিল, আমরা বাধা দোব, আমাদের দেহের শেষ বিন্দু রক্ত পর্যন্ত ঢেলে দিয়ে আমরা বাধা দোব।

ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিলাম, মারামারি করবে নাকি?

না, আমরা বক্তৃতা করব, আপনাদের সভার পাশেই আমরা সভা ক'রে লোককে চাঁদা দিতে নিষেধ করব।

আশ্বস্ত হইলাম। বাঙালী তথা ভারতবাসী স্বদেশী যুগ হইতে

আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত এত বক্তৃতা দিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটির যদি তিলমাত্র শক্তি থাকিত, তাহা হইলে বক্তৃতাপুঞ্জের পুঞ্জিত শক্তির আঘাতে ভারতে ইংরেজ-শাসনদণ্ড এতদিন গুঁড়া হইয়া যাইত।

মণীন্দ্র রুখিয়া উঠিয়া কহিল, রাস্তা ছেড়ে দাও বলছি, বিরক্ত ক'রো না।

ছেলেরা চীৎকার করিয়া উঠিল, না। আগে প্রতিজ্ঞা করুন, চাঁদা দোব না।

মণীন্দ্র চীৎকার করিয়া কহিল, দেখ তিনু, এই সব বেয়াড়া ছেলেদের সঙ্গ যদি না ছাড় তো ভাল হবে না বলছি।

কে বলিয়া উঠিল, ওরে বাবা! ধমকায় যে! কি করবে শুনি?

মণীন্দ্র আন্দাজে বক্তার অবস্থান নির্ণয় করিয়া সেই দিকে চোখ ফিরাইয়া মিনিট পাঁচেক অনল বর্ষণ করিয়া কহিল, কি করব? রুণুর বিয়ে দোব না ওর সঙ্গে।

কে একজন বলিল, তবে তো ব'য়ে গেল। মেয়ের দুর্ভিক্ষ পড়েছে নাকি?

গোলমাল শুনিয়া বাড়ির দরজায় মন্মর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা আসিয়া ভিড় করিল। তাহাদের দেখিয়া মণীন্দ্রের বীরত্ব চাগিয়া উঠিল; সে আস্ফালন করিয়া কহিল, দুর্ভিক্ষ পড়েছে কি না দেখাব একবার। তারপর ডান হাত অর্ধ-প্রসারিত করিয়া ও তর্জনী তিনুর ঠিক নাকের সামনে তুলিয়া নাড়িতে নাড়িতে প্রশ্ন করিল, তিনু, তোমারও ওই মত তো? ঠিক বল, এর পর কিন্তু—

তিনু বাধা দিয়া কহিল, হ্যাঁ, আমারও তাই মত। রুণুকে বিয়ে ক'রে সংসার করবার আগে দেশের জন্তে জেলে যাওয়াকে আমি আমার কর্তব্য ব'লে মনে করি।

মণীন্দ্র কহিল, ওসব বক্তৃতা আমি বুঝি না, ফুন্টিকে বিয়ে করতে চাও না, এই কথা বলছ তো ?

তিন্নু দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ।

মণীন্দ্র ধাবড়াইয়া গিয়া কহিল, শুনছ হে মাস্টার! মুখের কাছে হাত তুলে বলছে খাব না, আর ওদিকে—

ছেলেরা চীৎকার করিয়া উঠিল, বন্দে মাতরম্।

হঠাৎ দ্বারে দণ্ডায়মান ছেলেমেয়েগুলা বাড়ির ভিতরে ছুটিয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভিতর হইতে একটা সোরগোল শোনা গেল। মিনিট খানেক পরেই মন্নুর বড় ছেলে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, বাবা, দিদি মূর্ছা গেছে।

মণীন্দ্র আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, সে কি রে!—বলিয়া সকলকে ঠেলিয়া বাড়ির ভিতরে ছুটিল, তাহার পিছু পিছু ছুটিল তাহার ছেলে ও তাহার পিছনে ছুটিলাম আমি, এবং আমার সঙ্গে তিন্নুও তাহার দলবল লইয়া ছুটিল।

ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম, উঠানে পড়িয়া ফুন্টি হাত-পা ছুঁড়িতেছে, এবং তাহাকে ঘিরিয়া মণীন্দ্রের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েগুলা চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। সরোজিনী কাছে-পিঠে কোথাও নাই। মণীন্দ্র ছুটিয়া ফুন্টির পায়ের কাছে উবু হইয়া বসিয়া, তাহার পা দুইটা চাপিয়া ধরি । আমি সকলকে চুপ করাইবার জন্য ধমক দিলাম। তিন্নু পাংশু মুখে থ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহাকে কহিলাম, দাঁড়িয়ে থেকো না তিন্নু, হাত দুটো ধর দেখি।

মণীন্দ্রও কহিল, হ্যাঁ বাবা তিন্নু, দাঁড়িয়ে থেকো না, তোমার কথা শুনেই মরতে চলেছে, ভাল ক'রে চেপে ধরলে হয়তো ফিরতে পারে।

তিন্নু ফুন্টির মাথার কাছে বসিয়া হাত দুইটা চাপিয়া ধরিল।

মণীন্দ্রের স্ত্রী কান্নার সুরে কহিল, ও মাগো, চোখ মেলে দেখ্, কে তোর হাত ধরেছে, দেখ্ গো।

কিন্তু ফুন্টির বুদ্ধি ও চাতুর্যের সম্বন্ধে আমার ধারণা ক্রমে উঁচু পর্দায় উঠিতেছে। মাসখানেক মাত্র বিদ্যা-চর্চা করিয়াই সে প্রেমপত্র-লিখন-প্রণালী রপ্ত করিয়াছে; এবং সরোজিনীর কাছে মাত্র একবার দেখিয়াই সে মূর্ছা ও পতন-প্রক্রিয়াটি বেশ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। শুধু আয়ত্ত করিয়াছে নয়, প্রয়োগ-কৌশলে সরোজিনীর চেয়ে উন্নতি সাধন করিয়াছে। কারণ সরোজিনী শুধু শান্তভাবেই পড়িয়া ছিল, কিন্তু ফুন্টি ঘন ঘন হাত-পা ছুঁড়িতেছে, এবং কৌতূহলের বিষয় এই যে, পায়ের চেয়ে হাত বেশি ছুঁড়িতেছে।

মণীন্দ্র ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞাসা করিল, তোদের পিসীমা কোথায়?

ছেলেমেয়েগুলা প্যানপেনে গলায় সমস্বরে বলিয়া উঠিল, পিসীমা ওষুধ আনতে গেছে বাবা।

মণীন্দ্রের স্ত্রী ক্রন্দন-জড়িত স্বরে কহিল, ও বাবা তিনু, মুখে আঙুল দিয়ে দেখ দেখি, দাঁতটা ছাড়াতে পার কি না! দাঁতগুলো ভেঙে গেলে ফোকলা হয়ে যাবে যে!

তিনু চট করিয়া মুখে আঙুল ঢুকাইয়া দিয়া দাঁত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং হঠাৎ 'উঃ' বলিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল। সকলে সমস্বরে প্রশ্ন করিল, কি হ'ল?

তিনু যন্ত্রণা-কুঞ্চিত মুখে কহিল, আঙুলে কামড়ে দিয়েছে, ছাড়ছে না।—বলিয়া আঙুলটা ছাড়াইবার জন্য টানাটানি করিতে শুরু করিল। মণীন্দ্র তাহাকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য কহিল, বেশি হেঁচকা-হেঁচকি ক'রো না বাবা। দাঁতে লাগবে।

সরোজিনী আসিয়া হাজির হইল, হাতে অ্যামোনিয়ার শিশি।

কহিলাম, দাও দাও, আমার হাতে। শিশিটা লইয়া প্যানাকে দিয়া কহিলাম, ধর্ দেখি নাকের কাছে। প্যানা ছিপি খুলিয়া নাকের কাছে ধরিতেই ফুন্টি বার কয়েক নাকের আগাটা কুঁচকাইল, তারপর একবার গভীর নিশ্বাস লইয়াই, আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। তারপর চোখ মেলিয়া চাহিয়া, তিনুকে দেখিয়াই উঠিয়া বসিতে গেল।

মণীন্দ্র বলিয়া উঠিল, উঠিস নি। তিনুকে কহিল, চেপে ধর তিনু, উঠতে দিও না।

তিনু তাহার সদ্যমুক্ত আঙুলটিতে ফুঁ দিতেছিল। মণীন্দ্রের আদেশ পাইবামাত্র ফুন্টিকে চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ফুন্টি জোর করিয়া উঠিয়া বসিয়া চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতে শুরু করিল।

সরোজিনী কহিল, কাঁদছিস কেন? আবার মূর্ছা হবে যে।

ফুন্টি মাথা নাড়িয়া কহিল, হোক, আমি মরব, আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা, আমাকে মরতে দাও।

ফুন্টির মা কহিল, মরবি কিসের দুঃখে? চেয়ে দেখ্, তিনু তোর কাছে ব'সে।

ফুন্টি নির্লজ্জার মত কহিল, ও যে জেলে যাবে বলছে বক্তিতে ক'রে; আমি মরব; এতে না মরলে কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে মরব।—বলিতে বলিতে আবার নিশ্বাস বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেই প্যানা অ্যামোনিয়ার শিশি তাহার নাকের কাছে ধরিল। ফুন্টি আবার চাঙ্গা হইয়া উঠিয়া সুর করিয়া কাঁদিতে শুরু করিল।

সরোজিনী তিনুকে সস্নেহে কহিল, বাবা তিনু, তুমি নিজের মুখে বল যে, বক্তৃতা করবে না।

তিনু নতমুখে কহিল, বলছি, বক্তৃতা করব না।

ফুন্টি কহিল, পিসীমার পা ছুঁয়ে বলুক, না হ'লে শুনব না।

কহিলাম, তাই বল হে তিনু।

উঠিয়া আসিয়া সরোজিনীর পাদস্পর্শ করিয়া তিনু বলিতে লাগিল, আমি বক্তৃতা করব না, জেলে যাব না, যত শীঘ্র সম্ভব বিয়ে করব।

ফুটি কান্না থামাইয়া, চুপ করিয়া তিনুর কথা শুনিতে লাগিল এবং তিনু থামিতেই আবার কান্না শুরু করিয়া কহিল, শুধু ও বললে হবে না, ওর সঙ্গীদের সবাইকেই বলতে হবে।

সঙ্গীরা একসঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, বাঃ রে! আমরা কেন পা ছুঁয়ে বলতে যাব? আমরা তো আর বিয়ে করতে যাচ্ছি না!

ফুটির আবার মূর্চ্ছার উপক্রম হইতেই সরোজিনী সকলকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, আমি তোমাদের গুরুজন, আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, একটা মেয়ের জীবনের জন্যে, তোমরা, ও যা বলছে, কর; তাতে তোমাদের কোন লজ্জা নেই, অপমান নেই।

প্যানা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আচ্ছা, বলছি আমরা। তিনুদার ভাবী স্ত্রীর জীবনের জন্যে আমরা যে কোন কাজ করতে প্রস্তুত, আপনার পায়ে ধ'রে প্রতিজ্ঞা করা তো সামান্য কাজ।—বলিয়া সরোজিনীর সামনে আসিয়া পাদস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করিল, আমি বক্তৃতা করব না, জেলে যাব না, যত শীঘ্র সম্ভব বিয়ে—। বলিয়াই জিব কাটিয়া কহিল, না না, তা নয়, যত শীঘ্র সম্ভব তিনুদার বিয়ে দোব। তারপর একে একে সকলেই আসিয়া সরোজিনীর পা ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করিল।

ফুটিও তারপর মূর্চ্ছা সংবরণ করিয়া কান্না থামাইয়া আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

১৫

রবিবার সকালে সার্কল-অফিসার আসিয়া হাজির হইয়া গাঙুলী মশায়কে জানাইলেন, আজ বিকেলে থানার সামনে সভার আয়োজন করতে হবে। একজন বক্তা সায়েবের সঙ্গে আসবেন; তিনি সভাতে যুদ্ধ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন, গ্রামের সকলেই যেন বক্তৃতা শোনবার জন্যে সভায় হাজির থাকে। গাঙুলী মশায় একজন ডোমকে ডাকিয়া ঢোল পিটাইয়া এই বার্তা সারা গ্রামে প্রচার করিতে আদেশ দিলেন। সভাজনদের বসিবার জন্য স্কুল খালি করিয়া চেয়ার বেঞ্চি থানাতে পাঠানো হইল, এবং সেগুলিকে সাজাইবার জন্য চৌকিদারদের আদেশ দেওয়া হইল।

বেলা চারিটার আগেই থানায় গিয়া হাজির হইলাম। থানার সামনে প্রকাণ্ড ময়দানে সামিয়ানা টাঙাইয়া সভার ব্যবস্থা করা হইয়াছে; স্কুলের চেয়ার ও বেঞ্চিগুলি যথাবিধি সাজানো হইয়াছে; গাঙুলী মশায়, দারোগাবাবু ও সরকারী পোশাক-পরা চৌকিদার ও কনস্টেবলরা বিনা কাজেই ব্যস্ত-সমস্তভাবে ইতস্তত ছুটাছুটি করিতেছে; আমাদের হুজুর সাহেব একটা চেয়ারে বসিয়া চুরুট টানিতেছেন; পাশে দাঁড়াইয়া আজিজ সাহেব ও তাঁহার ভাইপো বিনীতভাবে হুজুরের সহিত আলাপ করিতেছে।

দেখিতে দেখিতে বেঞ্চিগুলি ভরিয়া উঠিল এবং চারিদিকে ভিড় জমিয়া উঠিল। দেখিলাম, অন্ধ, খঞ্জ, রোগী, শিশু ও টর্চলাইট-সমিতির সভ্যবৃন্দ ছাড়া গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ সকলেই, এমন কি বাউরী-বাগদীদের জনকয়েক প্রৌঢ়া ও বালিকা, সভায় সমুপস্থিত। সামনের বেঞ্চিতে বসিয়া বালকেরা ঠেলাঠেলি মারামারি ও চীৎকার করিতে

লাগিল, তাহাদের পিছনে বসিয়া বয়োজ্যেষ্ঠরা তাহাদিগকে উচ্চকণ্ঠে শাসন করিতে লাগিল ; চারিদিকে ভিড় করিয়া দণ্ডায়মান বাউরী, বাগদী ও অন্যান্য অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকগুলা কোলাহল-সহকারে আলাপ ও আলোচনা করিতে লাগিল, এবং উচ্চনীচ-নির্বিশেষে সমগ্র জনতার সমবেত ধূমপানের ফলে সমস্ত সভা-মণ্ডপ গাঢ় কুহেলিকা-জালে আবৃত হইয়া উঠিল।

হঠাৎ মোটরের শব্দ শোনা যাইতেই, যাহারা দাঁড়াইয়া ছিল তাহারা রাস্তার দিকে ছুটিতে লাগিল, বালকেরা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বয়োবৃদ্ধেরা উঠি-উঠি করিতে লাগিল। দারোগা নিজে আসিয়া সকলকে শান্তভাবে বসিয়া থাকিতে অনুরোধ করিলেন এবং কন্‌স্টেব্‌লরা ছুটাছুটি ও গুঁতা-গুতি করিয়া ধাবমান জনপ্রবাহকে রোধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

গাড়ি আসিয়া পৌঁছিল। দারোগাবাবু, সার্কল-অফিসার, পিছু-পিছু গাঙ্গুলী মশায়, ও ইউনিয়ন-বোর্ডের মেম্বাররা ছুটিয়া গাড়ির কাছে গিয়া হাজির হইলেন। এস. ডি. ও. সাহেব প্রথমে গাড়ি হইতে নামিলেন, এবং তাঁহার পরেই নামিলেন একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, খুব সম্ভব বক্তা। এস. ডি. ও. সাহেবের পরিধানে খাকী জিনের হাফ-প্যাণ্ট, সাদা টুইলের হাফ-হাতা শার্ট, মোজা ও বুট-জুতা। দেখিতে মোটেই সুশ্রী নহেন, কিন্তু তাঁহার মত স্বভাবত-ভদ্রলোক হাকিমদের মধ্যে খুব অল্পই দেখা যায়। সকলের সহিত এমন মিষ্ট ব্যবহার করেন যে, উনি যে হাকিম, তাহা কাহারও মনে থাকে না। বক্তা ভদ্রলোকটির দেহ শীর্ণ ও খর্ব, মেটে রঙ ; মুখটি লম্বা ধরনের ; মাথায় স্বল্প চুলে কাইজারী প্যাটার্নের টেরি ; খাড়া নাকের নীচে টাঙ্গির মত গোঁফ ঠোঁটের উপর পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে ; দাড়ি পরিষ্কার করিয়া চাঁছা ; চুল ও গোঁফ দুইয়েরই বেশ পাক ধরিয়াছে ; চিবুক সূক্ষ্মাগ্র ; কপালে ও সারা মুখে বয়স ও

সাচ্ছল্যহীন জীবনযাত্রার গভীর বিদারণ-রেখা ; পরিধানে ধুতি ও গলাবন্ধ কোট, পায়ে অ্যালবার্ট জুতা ও হাতে রূপার পাত দিয়া মাথাটি বাঁধানো একটি মোটা বেতের লাঠি।

এস. ডি ও. সাহেব হ্যাট হস্তে সকলের সহিত হাস্যমুখে আলাপ করিতে লাগিলেন ও বক্তা মহাশয়কে সকলের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। আমি সকলের পিছনে ছিলাম। আমাকেও ডাকিয়া বক্তার সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন এবং দুই-এক কথায় স্কুলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তারপর সকলে সভামণ্ডপে আসিয়া হাজির হইলেন। উপবিষ্ট সভ্যবৃন্দ জায়গা হারাইবার ভয়ে গ্যাঁট হইয়া বসিয়াই রহিল। এস. ডি. ও. সাহেব টেবিলের সম্মুখের চেয়ারটায় বসিয়া বক্তা মহাশয়কে পাশের চেয়ারে বসাইলেন এবং আমাকেও কাছেই একটা চেয়ারে বসিতে অনুরোধ করিলেন। দেখিতে দেখিতে চেয়ারগুলি সব ভর্তি হইয়া গেল। শুধু রাধানাথ জায়গা না পাইয়া চেয়ারে উপবিষ্ট চাষী-কৈবর্ত জাতীয় একজন ইউনিয়ন-বোর্ডের মেম্বারকে টানাটানি করিতে লাগিল। মেম্বার মহোদয় চেয়ার আঁকড়াইয়া বসিয়া রহিল, অগত্যা রাধানাথ বেঞ্চিতেই ঠেলাঠেলি করিয়া বসিবার জায়গা করিয়া লইল। মণীন্দ্র ইতিপূর্বেই আজিজ সাহেবের পাশে একটা চেয়ার দখল করিয়াছিল। দারোগাবাবু না বসিয়া চৌকিদার ও কনস্টেবল-সহযোগে সভায় শান্তিরক্ষা করিতে লাগিলেন।

এস. ডি. ও. সাহেব প্রথমে উঠিয়া স্বল্প কথায় সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া বক্তাকে সকলের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন, এবং বক্তার বক্তৃতা মনোযোগ-সহকারে শুনিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিলেন। বক্তা মহাশয় লাঠিটি সাবধানে চেয়ারের গায়ে ঠেসাইয়া রাখিয়া আগাইয়া আসিলেন ; ডান হাত দিয়া একবার চুল ও গোঁফ ঠিক করিয়া লইলেন ;

দুই হাত যুক্ত করিয়া সামনে ঝুলাইলেন এবং তারপর সকলকে সচকিত করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন, ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণ! এই ক্ষীণ ও খর্ব দেহ হইতে যে ওইরূপ গুরুগম্ভীর আওয়াজ বাহির হইবে আশা করি নাই, যেন একখণ্ড নেহাৎ-নিরীহ ফিকা সাদা রঙের মেঘ হইতে সহসা বজ্রধ্বনি হইয়া উঠিল। মহোদয়গণ, যাহাদের অধিকাংশ খালি গায়ে বেঞ্চিতে বা চেয়ারে উবু হইয়া বা চৌকস হইয়া বসিয়া ছিল, মেরুদণ্ড খাড়া করিয়া সজাগ হইয়া উঠিল, এবং মহোদয়াগণ, অর্থাৎ বাউরী ও বাগদীদের জনকয়েক প্রৌঢ়া ও বালিকা ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইতে লাগিল।

বক্তা বলিতে লাগিলেন, ইউরোপে আবার যুদ্ধ বেধেছে। দুরাত্মা জার্মানরা, যারা গতবারে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল, এবং মহাত্মা ইংরেজদের অনুগ্রহে একেবারে ধরাপৃষ্ঠ হতে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি, তারাই আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তাদের নেতা বর্বর, পাষণ্ড, হীনমতি হিট্‌লার, সে চায় সমস্ত পৃথিবীকে পদদলিত করতে, ধরণীর যত ধন-সম্পদ নিজেদের করায়ত্ত করতে, মানুষের মনুষ্যত্ব, স্বাধীনতা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে। সে তাদের জার্মানি থেকে শ্রেষ্ঠ মানবদের নির্বাসিত করেছে, জাতির মানবিকতাকে দাবিয়ে দিয়ে তার দানবিকতাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। সেই উন্মত্ত দানবদের দণ্ডাঘাতে পোল্যাণ্ড, বেল্‌জিয়াম, হল্যাণ্ড, এমন কি ফ্রান্স ভূলুণ্ঠিত হয়েছে; শুধু মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সেই বীরাগ্রগণ্য ইংরেজজাতি, যাদের মাথা আজ পর্যন্ত কেউ নামাতে পারে নি, নামাতে পারবে না। সেই ইংরেজজাতি, পৃথিবীর নির্যাতিত নিপীড়িত মানবদের মুক্তির জন্যে একা এই দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। এই যুদ্ধ সম্বন্ধে আপনাদের কোন ধারণা নেই।

এই সময়ে দোলগোবিন্দ কাশিতে আরম্ভ করিল, সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল, থামুন থামুন। কিন্তু দোলগোবিন্দের থামিবার কোন লক্ষণই নাই, চেয়ারের হাতল চাপিয়া ধরিয়া সে কাশিয়াই চলিয়াছে। বক্তা চুপ করিয়া গিয়া ভুরু কুঁচকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাধানাথ লাফাইয়া আসিয়া দোলগোবিন্দকে বাহিরে লইয়া যাইবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিল, দোলগোবিন্দ অবশেষে সামলাইয়া লইয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে কোথাও যাইবে না, কাশিতে কাশিতে তাহার মৃত্যু হইলেও সে যুদ্ধের বক্তৃতা শুনিবেই। রাধানাথ অগত্যা ফিরিয়া গিয়া বেঞ্চিতে বসিল। আবার বক্তৃতা শুরু হইল, এই যুদ্ধ সম্বন্ধে আপনাদের কোন ধারণা নেই। এ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নয় যে, বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ধনু, শরকাঠি দিয়ে তীর ও কাঠ দিয়ে গদা তৈরি করলেই যুদ্ধ চলবে; প্রতিদিন বহু কোটি টাকা খরচ। এক কোটি কত জানেন? একশো হাজারে এক লাখ, একশো লাখে এক কোটি, এ রকম বহু কোটি (সকলে চক্ষু বড় করিয়া ঘাড় নাড়িতে লাগিল) টাকা দিন খরচ। হাজার হাজার লোক দিন প্রাণ দিচ্ছে, হাজার হাজার সংসার থেকে রোজ মর্মভেদী কান্না উঠছে। পুত্রহারা মাতা-পিতা, স্বামীহারা স্ত্রী ও পিতৃহারা সন্তানদের ক্রন্দনধ্বনি সহ্য করতে না পেরে নিষ্ঠুর ভগবানও কান চেপে ধরেছেন।

দম লইয়া কিঞ্চিৎ মৃদুকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, এখন আমাদের কি করা উচিত? যে ইংরেজ আমাদের পিতার মত পালন করছেন, রক্ষা করছেন, আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ-সাধন করছেন, হাত ধ'রে আমাদের স্বাধীনতার পথে অগ্রসর ক'রে দিচ্ছেন, তাঁদের এই বিপদে আমাদের কি করা উচিত?—বলিয়া বিস্ফারিত চক্ষের দৃষ্টি এ-পাশ হইতে ও-পাশ পর্যন্ত বুলাইয়া দিলেন। যাহাদের চাঁদা দিবার ক্ষমতা আছে, তাহারা মুখ

নামাইল ; যাহাদের নাই, তাহারা বেপরোয়া তাকাইয়া রহিল। বক্তা বলিতে লাগিলেন, কি উচিত বলুন ?

বলিয়া আমাদের পাশের গ্রামের লক্ষ্মণ মণ্ডলের দিকে তাকাইতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া যুক্তহস্তে কহিল, হুজুর, আমরা ছেলেমানুষ, কি বুঝি বলুন, যা উচিত আপনি---

বক্তব্য শেষ না কারতেই তাহার পাশের লোকেরা তাহাকে টানিয়া বসাইয়া দিল। কিন্তু ও-দিকে লক্ষ্য না করিয়া বক্তা বলিতে লাগিলেন, আমাদের উচিত জন দিয়ে, জান দিয়ে এ বিপদে মহামান্য সম্রাট বাহাদুরকে সাহায্য করা। (দণ্ডায়মান বাউরী ও বাগদী যুবকদের দিকে তাকাইয়া) আপনাদের মধ্যে যাদের স্বাস্থ্য আছে, শক্তি আছে, মনের জোর আছে, আসুন আপনারা, দলে দলে যুদ্ধে যোগ দিন। আসুন, এই মুহূর্তে আসুন, সৈন্যদলে নাম লেখান।

এই সময়ে বাউরী ও বাগদীদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। মেয়েদের গলা শোনা যাইতে লাগিল, ওরে পালিয়ে আয় রে, পালিয়ে আয়, ধ'রে নিয়ে যেতে এসেছে।

বক্তা বলিতে লাগিলেন, প্রমাণ করুন যে, ভারতবাসী ভীরু নয়, কাপুরুষ নয়, ক্লীব নয়, স্বাধীন দেশের লোকের মতই তারা মরতে জানে। মিনিট কয়েকের মধ্যে চারিদিকের লোকের ভিড় সূর্যালোকের তাড়নায় কুয়াশার মতই কোথায় অন্তর্হিত হইল। বক্তা বলিতে লাগিলেন, অনেকদিন যুদ্ধ না ক'রে আপনাদের দেহে ও মনে জড়তা এসেছে, অস্ত্রে মরচে ধরেছে। সেই জড়তাকে পরিহার করুন, অস্ত্রকে শান দিয়ে আবার শানিত ক'রে তুলুন।

বেঞ্চিতে উপবিষ্ট প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরা আপন আপন যুবক পুত্র ও পৌত্রদের সরাইয়া ফেলিতে শুরু করিল।

বক্তা বলিতে লাগিলেন, যাঁরা তা পারবেন না, তাঁরা অর্থ দিয়ে সাহায্য করুন। বিলাসে দিন কাটানো আর চলবে না। মনে করুন, আমাদের রাজ-জাতির নরনারীরা, যাঁদের বিলাস ও বৈভবের অন্ত ছিল না, অর্ধাহারে স্বল্প পরিচ্ছদে দিন কাটাচ্ছেন, রাত্রির পর রাত্রি মূষিকের মত মাটির নীচে তাঁদের থাকতে হচ্ছে। আমাদেরও ক্লেশ সহ্য করতে হবে ; অশন-বসনের ব্যয় সংক্ষেপ করতে হবে এবং উদ্বৃত্ত অর্থ যুদ্ধের জন্যে দান করতে হবে। তারপর, এই যুদ্ধে যখন ইংরেজজাতি জয়লাভ করবেন, শত্রুকে ধ্বংস ক'রে যখন এক নূতন জগতের সৃষ্টি করবেন, সেই জগতে তাঁরা আমাদের অন্যান্য সুসভ্য জাতিদের সঙ্গে সমান আসনে বসিয়ে দেবেন। বক্তৃতা শেষ করিয়া বক্তা যখন আসন গ্রহণ করিলেন, আমরা জনকয়েক হাততালি দিলাম ! কিন্তু পিছনের বেঞ্চির লোকগুলা সুসভ্য জাতিদের সঙ্গে সমান আসনে বসিবার লোভ সংবরণ করিয়া একে একে সরিয়া পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুধু স্কুলের ছেলেগুলি ছাড়া বেঞ্চিতে আর কেহ রহিল না। যারা কাছাকাছি চেয়ারে বসিয়া ছিল, তাহারা পলাইল না বটে, কিন্তু তাহাদের মুখে নিদারুণ অস্বস্তি ফুটিয়া উঠিল।

মণীন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া এস. ডি. ও. সাহেবকে নমস্কার করিয়া যুক্তহস্তে কহিল, হুজুর, গ্রামের জমিদার শ্রীমতী সরোজিনী দেবীর—

পিছন হইতে প্রতিবাদ হইল, কে বললে জমিদার ?

মণীন্দ্র এক মুহূর্তে যুক্তহস্ত মুক্ত করিয়া প্রসারিত বাম হাতের করতলে মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত দিয়া কিল মারিয়া কহিল, আলবৎ জমি।

দারোগাবাবু কহিলেন, ওসব কথায় কান দেবেন না মণীন্দ্রবাবু, যা বলতে চান বলুন।

মণীন্দ্র একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া কহিল, এই যে বলছি, গ্রামের জমিদার

শ্রীমতী সরোজিনীর পক্ষ থেকে যুদ্ধ-ফণ্ডে দুশো টাকা চাঁদা দিচ্ছি।—বলিয়া পুনরায় নমস্কার করিয়া পকেট হইতে দুইখানি একশত টাকার নোট বাহির করিয়া এস. ডি. ও. সাহেবের হাতে দিয়া আর একবার নমস্কার করিল। এস. ডি. ও. সাহেব তাহা লইয়া প্রশংসাসূচক হাততালি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আজিজ সাহেব, দারোগাবাবু এবং মণীন্দ্র নিজে সজোরে হাততালি দিতে লাগিল। গাঙুলী মশায় ও তাঁহার দলের সকলেই নির্বিকার বসিয়া রহিল। তারপর আজিজ সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া পঞ্চাশ টাকা এবং তাহার পরেই সত্তর সাহেব পঞ্চাশ টাকা দিলেন।

তারপর গাঙুলী মশায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটি টাকা-ভর্তি ছোট থলিয়া এস. ডি. ও. সাহেবের হাতে দিয়া নমস্কার করিয়া কহিলেন, আমি আমাদের ইউনিয়ন-বোর্ডের পক্ষ থেকে একশো টাকা দিচ্ছি। এবার এস. ডি. ও. সাহেবের সঙ্গে গাঙুলী মশায়ের দলের সকলে হাততালি দিল। কিন্তু মণীন্দ্র বেপরোয়া বসিয়া রহিল।

দারোগাবাবু কহিলেন, আপনি নিজে কি দিচ্ছেন?

গাঙুলী মশায় মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিলেন, আমার যা দেবার ঐ সঙ্গেই দিয়েছি।

এস. ডি. ও. সাহেব হাসিয়া বলিলেন, তা কি হয়? আপনাদের মত লোকেরা এ কথা বললে চলবে কেন?

গাঙুলী মশায় যুক্তহস্ত হইয়া কহিলেন, হুজুর, আমি যা পারি পরে দোব।

হঠাৎ লছমন সিং চড়া গলায় বলিয়া উঠিল, আপনি কোথায় যাচ্ছেন রাধানাথবাবু?

ফিরিয়া তাকাইতেই দেখিতে পাওয়া গেল, রাধানাথ দ্রুতপদে দূরে

মাঠের মধ্যে একটা পুকুরের দিক লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে। লছমন সিং দৌড়িয়া গিয়া রাস্তা আটকাইতেই রাধানাথ একবার পেটে হাত দিয়া কি বলিয়া আবার দ্রুতবেগে ছুটিতে শুরু করিল।

লছমন সিং ফিরিয়া আসিয়া কহিল, পেটের বেমার বলছেন। এস. ডি ও. সাহেব, বক্তা মহাশয়, আমাদের হুজুর পর্যন্ত হাসিয়া উঠিলেন।

এস. ডি. ও. সাহেব প্রশ্ন করিলেন, কে উনি ?

গাঙ্গুলী মশায় সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, হুজুর, রাধানাথ গাঙ্গুলী। আমাদের গাঁয়ে বাড়ি। পয়সা আছে বিস্তর, তবে কিনা—(কণ্ঠস্বর মৃদুতর করিয়া) ভারি কৃপণ।

মণীন্দ্র শুনিতে পাইয়া কহিল, ওরও বিস্তর পয়সা হুজুর, ভাল কাজে দিতে হ'লেই মাথা চুলকোয়।

স্কুলের ছেলেগুলা এবং আরও অনেকে হাসিয়া উঠিল। দারোগাবাবু ধমক দিয়া তাহাদের হাসি থামাইলেন। গাঙ্গুলী মশায় মণীন্দ্রের দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাইলেন এবং পরক্ষণেই একেবারে নিবন্ত দৃষ্টিতে এস ডি. ও. সাহেবের দিকে তাকাইয়া বোকার মত হাসিলেন।

সভা ভঙ্গ হইলে এস. ডি. ও. সাহেব আজিজ সাহেবকে কহিলেন, চলুন, সেইটার তদন্ত করা যাকগে।

মণীন্দ্র শুনিবামাত্র কাছে আসিয়া যুক্তহস্তে কহিল, হুজুর, চলুন।

বাড়ি পর্যন্ত গাড়ি যাবে ?

মণীন্দ্র কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

বেশ, চলুন, তা হ'লে গাড়িতেই যাওয়া যাক।—বলিয়া গাড়ির দিকে চলিলেন। আমরা তাঁহার পিছুপিছু চলিলাম। এস. ডি. ও. সাহেব, আজিজ সাহেব, সত্তর সাহেব ও বক্তা মহাশয়, একে একে গাড়িতে

উঠিয়া পিছনের সীটে বসিলেন। আমাদের হুজুর ইউনিয়ন-বোর্ডের কাজের অছিলায় যাইতে রাজি হইলেন না।

মণীন্দ্র ড্রাইভারের পাশে বসিয়া আমাকে ডাকিয়া কহিল, তুমিও এস হে মাস্টার, হেঁটে যাবে কেন?

আমার নাম শুনিতেই এস. ডি. ও. সাহেব বলিলেন, মাস্টার মশায়, আসুন।—বলিয়া নিজেই দরজা খুলিলেন।

আমি কহিলাম, থাক্, ওখানে আপনাদের কষ্ট হবে, আমি এখানে বসছি।—বলিয়া মণীন্দ্রের পাশে বসিলাম।

প্রবোধ গাঙ্গুলীর বাড়ি পৌঁছিতে পাচ মিনিটের পরিবর্তে আধ ঘণ্টা লাগিয়া গেল। কারণ, গাড়ি ছাড়িবামাত্র যাহারা দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা, ইতরভদ্রনির্বিশেষে তেমনই দ্রুতবেগে ফিরিয়া আসিয়া গাড়িটাকে ঘিরিয়া ফেলিল। একে রাস্তা ভাল নয়, তাহার উপর চারিদিকে এই ভিড়; কাজেই বিবাহের শোভাযাত্রায় বরের গাড়ি যেমন রাস্তার দুই পাশে দণ্ডায়মান উৎসুক দর্শকদিগকে বর দেখাইতে দেখাইতে মন্দগতিতে চলে, ঠিক তেমনই ভাবে আমাদের গাড়িও চলিতে লাগিল। রাস্তার দুই পাশে বাড়ির দরজায় ছেলেমেয়েরা দাঁড়াইয়া পরিচিত আমাকে ও মণীন্দ্রকে দেখাইয়া আঙুল বাড়াইতে লাগিল, এবং এক স্থানে একটি নারীকণ্ঠ তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট স্বরে সকলকে শুনাইয়া কহিল, মনু চক্রবর্তীর বোনের বর যাচ্ছে লো, দেখে আয় সব গিয়ে।

গাড়ি আসিয়া প্রবোধ গাঙ্গুলীর বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল, এবং পানা-ভরা পুষ্করিণীতে যেমন দুই হাতের কসরৎ করিতে করিতে স্নান করিতে হয়, এখানেও তেমনই দুই হাতে ভিড় ঠেলিয়া ঠেলিয়া কোনমতে গেটের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। মনু যুক্তহস্তে এস. ডি. ও. সাহেবকে অভ্যর্থনা করিয়া বৈঠকখানার মধ্যে লইয়া গেল। বৈঠকখানার

মধ্যে ঢুকিয়াই দেখিলাম, সরোজিনী ইহার মধ্যেই সম্মানার্হ অতিথির যথাযোগ্য অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিয়াছে। বৈঠকখানার দেওয়াল ও মেঝে ঝাড়িয়া-মুছিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে। মেঝেতে শতরঞ্জি পাতা হইয়াছে। মাঝখানে একটি বড় টেবিল, বিচিত্র রঙের রেশমী সুতার কাজ করা দামী টেবিল-ক্লথ দিয়া ঢাকা। টেবিলটি ঘেরিয়া সাত-আটখানি চেয়ার। তিনু ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ অতিথিদের আপ্যায়নে নিযুক্ত।

এস. ডি. ও. সাহেব হাসিয়া কহিলেন, মনুবাবু যে ঠিক বরযাত্রীর আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছেন।

মণীন্দ্র বিনয়হাস্য-বিকশিত মুখে কহিল, হুজুর, সে কি কথা! আপনার মত লোকের পায়ের ধুলো কি আমাদের মত লোকের বাড়িতে সহজে পড়ে! কিছুই করতে পারি নি হুজুর, তবে বিয়ে একটা এ বাড়িতে হবে শিগগির, আমার মেয়ের, তখন হুজুরকে পায়ের ধুলো দিতে হবে।

এস. ডি. ও. সাহেব গম্ভীরভাবে চেয়ারে বসিয়া কহিলেন, তা হ'লে কাজ আরম্ভ করা যাক।

ইতিমধ্যে দারোগাবাবু বাই-সাইকেলে চড়িয়া হাজির হইয়াছিলেন। তিনি মণীন্দ্রকে কহিলেন, আপনি বলুন, কি বলবার আছে আপনাদের।

মণীন্দ্র যুক্তহস্তে কহিল, যা বলবার, আমার বোনই বলবে, ডেকে আনছি তাকে।

এস. ডি. ও. সাহেব সোৎসুককণ্ঠে কহিলেন, তিনি এখানে আসবেন?

মণীন্দ্র কহিল, আসবে বইকি হুজুর। আপনি হাকিম, পিতৃতুল্য, আপনার কাছে আসবে না?—বলিয়া মণীন্দ্র চলিয়া গেল। সকলেই একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। এস. ডি. ও. সাহেব সকলের অলক্ষ্যে দুই হাত

দিয়া টানিয়া টানিয়া হাফ-প্যাণ্টের ঝুলটা নীচের দিকে নামাইবার এবং মোজা দুইটা উপর দিকে তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং কিছুই সম্ভব না হওয়ায়, আদুড় হাঁটু দুইটাকে টেবিলের নীচে ঢুকাইয়া ফেলিলেন ; বক্তা মহাশয় ডান হাত দিয়া চুল ও গোঁফ ঠিক করিয়া লইলেন ; সত্তর সাহেব খাড়া হইয়া দুই চক্ষের দৃষ্টি শাণিত ও উদ্যত করিয়া বসিল ; আজিজ বাং কয়েক দাড়িতে হাত বুলাইল ; দারোগাবাবু বাহিরে গিয়া ঘন ঘন পায়চারি করিতে শুরু করিলেন ; এবং আমি—আমার যে শোচনীয় সাজ-সজ্জা একদিন সরোজিনী দেখিয়া আসিয়াছে, তাহার পর বর্তমানে কেশ ও বেশের কিঞ্চিৎ পারিপাট্য সাধন করিয়া তাহার মনে নূতন করিয়া কোন সৌন্দর্যানুভূতি সৃষ্টি করিতে পারিব না স্মরণ করিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া রহিলাম।

আসুন আসুন, নমস্কার। কেমন আছেন ?—দারোগাবাবুর কণ্ঠধ্বনি শ্রুত হইতেই সকলে দরজার দিকে মুখ ফিরাইলেন, সত্তর সাহেব একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সরোজিনী কক্ষে প্রবেশ করিল। পুরাপুরি বিধবার বেশ, সাদা থান, সাদা ব্লাউজ, মুখখানি স্বামীবিচ্ছেদজনিত শোকে ম্লান ও গম্ভীর, মাথার চুলে প্রসাধনের চিহ্নমাত্র নাই ; অর্থাৎ সরোজিনী স্বীয় আবির্ভাবকে হিন্দুবিধবাসুলভ সুপবিত্র ও সুমহান মহিমা দান করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। সরোজিনী যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া এস. ডি. ও. সাহেবকে তথা অন্যান্য সকল অতিথিগণকে নমস্কার করিল। এস. ডি. ও. সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিয়া কহিলেন, আসুন আসুন। বসুন। দারোগাবাবু প্রায় হাতে ধরিয়া সরোজিনীকে এস. ডি. ও. সাহেবের পাশের চেয়ারে বসাইয়া দিলেন।

উঠানে সমাগত জনতা কোলাহল শুরু করিল। দারোগাবাবু ছুটিয়া

গিয়া তিনু ও তাহার দলবলের সাহায্যে তাহাদিগকে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং অপারক হইয়া কহিলেন, যে এই গেটের ভেতরে পা দেবে, তাকেই বেঁধে নিয়ে জেলে দোব। এক মুহূর্তে সকলে ঠেলাঠেলি করিয়া বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। দারোগাবাবু একজন চৌকিদারকে (ইতিমধ্যে ইহারা আসিয়া পৌছিয়াছিল) আদেশ দিলেন, এখানে দাঁড়িয়ে থাক্, কাউকে আসতে দিবি না, কেউ এলে আমার কাছে ধ'রে নিয়ে আসবি।

এস. ডি. ও. সাহেব কহিলেন, সরকার-বাহাদুরের পক্ষ থেকে আপনার দানের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

সরোজিনী মুখ নামাইয়া কোমল ও মিষ্টি সুরে কহিল, আমাকে লজ্জা দেবেন না, সামান্য কিছু দিয়েছি। এস. ডি.ও. সাহেব কহিলেন, আপনার শাশুড়ীর বেনামী একটা দরখাস্তও হয়েছে, আপনার দরখাস্তও আমরা পেয়েছি। এ সম্বন্ধে আপনার শাশুড়ীর বক্তব্য আমার জানা দরকার।

সরোজিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আসুন আমার সঙ্গে বাড়ির ভেতরে, আপনি নিজে তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেন।—বলিয়া আমার দিকে তাকাইয়া কহিল, দাদা, আপনি ওঁকে নিয়ে আসুন, আমি মাকে খবর দিইগে।—বলিয়া গটগট করিয়া বাহির হইয়া গেল। সত্তর সাহেব আমার দিকে বিস্মিতনয়নে তাকাইয়া কহিল, আপনার বোন? আমি ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' জানাইয়া এস. ডি. ও. সাহেবকে সঙ্গে লইয়া বাড়ির ভিতরে চলিলাম।

বারান্দায় বাম দিকের ঘরের সামনে পাশাপাশি দুইটি চেয়ার পাতা ছিল। দরজার কাছেই বৃদ্ধা একটা মাদুরে বসিয়া ছিলেন। আমরা চেয়ারে বসিলাম। সরোজিনী ভিতরে গিয়া শাশুড়ীকে ডাকিল, মা! স্নেহসিক্ত কণ্ঠে উত্তর আসিল, কি মা?

এস. ডি. ও. সাহেব এসেছেন আপনার কাছে।

টানিয়া টানিয়া বৃদ্ধা কহিলেন, তিনি কে ?

সরোজিনী কহিল, আমাদের জেলার হাকিম।

আমার কাছে কেন ?

ছোট মামা দরখাস্ত করেছেন কিনা, আমার কাছে আপনার কষ্ট হচ্ছে।

বৃদ্ধা নীরস সুরে কহিলেন, অনুকূল এই কথা লিখেছে ? কে বলেছে তাকে ? চিরকাল অনুকূলের ওই রকম, পরের মুখে ঝাল খেয়ে নেচে বেড়ায়।

সরোজিনী কহিল, আমার নাকি আচার-আচরণ মন্দ।

বৃদ্ধা রাগিয়া উঠিয়া কহিলেন, যারা এই সব কথা মিথ্যে ক'রে অনুকূলকে বলেছে, আমি বলছি বউমা, তাদের ভাল হবে না। তুমি মনে কিছু দুঃখ ক'রো না মা। সতী সাবিত্রীর অপমান ভগবান সহ্য করেন না।—বলিয়া উত্তেজনায় ঘাড়টি নাড়িতে লাগিলেন।

এস. ডি. ও. সাহেব কহিলেন, আপনি তা হ'লে আপনার বউমাকে ছেড়ে যেতে চান না ?

বৃদ্ধা কণ্ঠে যতদূর সম্ভব জোর দিয়া কহিলেন, না, কেন যাব ? বউমা আমাকে হাতের তেলোয় ক'রে রেখেছে, নিজের মেয়ে এত যত্ন-আত্তি করে না। ওসব মিথ্যে কথা তুমি বিশ্বাস ক'রো না বাবা।

এস. ডি. ও. সাহেব কহিলেন, ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতেও চান না আপনি ?

বৃদ্ধা কাহলেন, দেখা ? অতি দুঃখের হাসি হাসিয়া কহিলেন, এ জীবনে আর কি কাউকে চোখে দেখতে পাব বাবা ! সে যে আমাকে কানা ক'রে দিয়ে গেছে।—বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। তারপর

সামলাইয়া লইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে অশ্রুজড়িত স্বরে কহিলেন, তবু ভাই তো। দেখতে না পাই, কাছে বসিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলোতে ইচ্ছে করে। ভাই হ'লেও অনেক ছোট, কোলে কাঁকে ক'রে মানুষ করেছি। তারপর অশ্রু-মুক্ত কণ্ঠে কহিলেন, তবে জান কি বাবা, ফহেশ (মহেশের অপভ্রংশ) গাঙুলী কারও বাড়ি ব'য়ে দেখা করতে যেতে পারবে না। পরাণই বল, আর রাধানাথই বল, গাঙুলীদের আগে কারও কিছু ছিল না, আমরাই এ গাঁয়ের জমিদার। তবে উনি অনেক ঘুচিয়ে অল্প বয়সে চ'লে গেলেন, ছেলেও দেশে বাস করলে না, তাই সবাই মিলে হ'রে-হ'য়ে নিয়ে কিছু করছে আজকাল। না হ'লে ফহেশ গাঙুলীর কাছে খত লিখতে হ'ত সবাইকে, এই সেদিনও তো রাধানাথ এক হাজার টাকা ধার করেছে, প্রবোধ বলেছিল আমাকে।

সরোজিনীকে কহিলাম, তাই নাকি?

সরোজিনী স্মিত মুখে কহিল, হ্যাঁ, তাই। গাঙুলী বঠ্‌ঠাকুরও অনেক কিছু লুকিয়ে খাচ্ছেন। বীরু আচায্যির ঘর-বাড়ি পর্যন্ত বাঁধা, আরও কত লোকের কত খত-দলিল আছে। সেগুলো সব হাত করতে পেলেন না ব'লেই তো এত রাগ। না হ'লে দেখুন না—। বলিয়াই চুপ করিয়া গেল। আমরাও নীরব রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে সরোজিনী কহিল, উনি যখন এমন ক'রে ভাসিয়ে দিয়ে চ'লে গেলেন—। সরোজিনীর কণ্ঠস্বর কান্নায় ভাঙিয়া গেল, কিন্তু মুহূর্তমধ্যে সামলাইয়া লইয়া ধরা গলায় কহিতে লাগিল, তখন আর ইচ্ছে হয় নি যে সংসারে থাকি। গুরুদেব বললেন, যে সংসার ভগবান তোমার ভেঙে দিয়েছেন, সেখানে আর থেকো না, আশ্রমে থেকে ভগবানের নাম ক'রে এ জীবনটা কাটিয়ে দাও। আমি বললাম, আমার সে বাঁধন এখনও কাটে নি বাবা।

শাশুড়ীকে কোথায় রাখি? গুরুদেব বললেন, ওঁকেও আশ্রমে নিয়ে এস। উনি রাজি হলেন না।

বৃদ্ধা একমনে শুনিতেছিলেন, এই সময় কহিলেন, না মা। যাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছি, তিনিই আমার মাথায় থাকুন, (দুই হাত জোড় করিয়া মাথায় ঠেকাইলেন) আর এ বয়েসে নতুন ক'রে গুরু করতে পারব না। আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন আমার কাছে থাক, ম'রে গেলে যেখানে ইচ্ছে যেও।

সরোজিনী স্বাভাবিক কণ্ঠে কহিল, তাই ফিরে এলাম। ভাবলাম, যাই হোক, ওঁর নিজের দেশ, এখানে উনি জন্মেছিলেন, কতদিন কাটিয়েছিলেন, এখানে সুখে দুঃখে ওঁর স্মৃতি বুকে নিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দোব, কিন্তু পা দিতে না দিতেই কুকুরের মত সব কাড়াকাড়ি করতে চেষ্টা করলে, না পেরে কলহ শুরু করলে। দারোগাবাবু গাঁয়ে না থাকলে বোধ করি এতদিন গাঁ থেকে চ'লে যেতে হ'ত। বড় ভাইয়ের কাজ করেছেন উনি। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, রোগে ডাক্তার পাওয়া যায় না, এমনই গাঁ—

এস. ডি. ও. সাহেব ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, তার মানে?

আমার অসুখ হয়েছিল দিন কয়েক আগে। গাঁয়ের ডাক্তারবাবু একবার বাড়িতে পা পর্যন্ত দিলেন না, এমন মন্ত্র কানে ওঁর দিয়েছে ওরা।

এস. ডি. ও. সাহেব রোষ-গম্ভীর মুখে কহিলেন, আচ্ছা, এর ব্যবস্থা আমি করব।

সরোজিনী দুই হাত জোড় করিয়া মিনতির সুরে কহিল, আমার কিন্তু একটি নিবেদন আছে।

এস. ডি. ও. সাহেব শশব্যস্ত হইয়া কহিলেন, ও-রকম ক'রে ব'লে আমায় লজ্জা দেবেন না। কি করতে হবে বলুন?

সরোজিনী কহিল, আপনাকে দেখে মনে যেন একটা সাহস পাচ্ছি, নিজের দাদাকে দেখলে যেমন হয়, মনে হচ্ছে, গাঁয়ে হয়তো বাস করতে পারব।

এস. ডি. ও সাহেব দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, নিশ্চয় পারবেন। আপনার কেউ যাতে কোন ক্ষতি করতে না পারে, তার ব্যবস্থা আমি করব। সরোজিনী আবদারের সুরে কহিল, আমার আর একটি অনুরোধ।

এস. ডি. ও. সাহেব সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, কি ?

ছোট বোনের বাড়িতে কিছু খেয়ে যেতে হবে।

সন্দেহমুক্ত সহজ কণ্ঠে এস. ডি. ও সাহেব কহিলেন, বেশ, তাতে আর কি! আমরা বসছি বাইরে, আপনি খাবার পাঠিয়ে দিন।—বলিয়া উঠিয়া বৃদ্ধাকে কহিলেন, আপনার কোনও চিন্তা নেই। আপনার বউমার কাছেই থাকুন আপনি। গ্রামের লোক আর যাতে বিরক্ত করতে না পারে, তার ব্যবস্থা করব আমি।

১৬

দিন দুই পরে বিকালবেলায় গাঙুলী মশায়ের বাড়িতে গিয়া দেখিলাম, তিনি ও রাধানাথ বৈঠকখানায় গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন। জুতার শব্দ শুনিতে পাইয়াই রাধানাথ হাঁকিয়া উঠিল, কে ? জবাব না দিয়া দরজার সামনে উপস্থিত হইতেই গাঙুলী মশায় তাকাইয়া আমাকে দেখিয়া কহিলেন, ওঃ, তুমি! এস ভায়া। পাশে গিয়া বসিলাম। গাঙুলী মশায় প্রবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, শুনেছ ? ঘাড় নাড়িয়া 'না' জানাইয়া প্রশ্ন করিলাম, কি ?

এস. ডি. ও. ব্যাটা আমাদের দরখাস্তটা নাকচ ক'রে দিয়েছে। উল্টে

হুকুম দিয়েছে, সরোজিনী দেবীর—মানে, ঐ মাগীর ওপর কেউ জোর-জবরদস্তি করে কি না, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে। বিপদ দেখ দেখি! মাগী যে লোক ভাল নয়, জান তো! যদি জানতে পেরে থাকে সরকার থেকে এই হুকুম হয়েছে, তা হ'লে নিজেই কোন বিপদ বাধিয়ে আমাকে ফ্যাসাদে ফেলবে।

রাধানাথ কহিল, যাকে বলছেন, সে-ই এখনই ব'লে দেবে গিয়ে। যা দহরম-মহরম, একদিন ওর বাড়ি না গেলে ভাত হজম হয় না।

চুপ করিয়া রহিলাম, প্রতিবাদ করিলেন গাঙ্গুলী মশায়, পাগল নাকি! ও সে রকম লোক নয় হে রাধানাথ।

রাধানাথ রুক্ষকণ্ঠে কহিল, নয় তো দিনরাত আড্ডা দেয় কেন?

ভারী গলায় কহিলাম, তোমার মত দিনরাত আড্ডা দিয়ে বেড়ানো আমার কাজ নয়।

রাধানাথ মুখ ভেংচাইয়া কহিল, আড্ডা দিয়ে বেড়ানো আমারই কাজ নাকি? যাকে এতগুলো দোকান চালাতে হয়, তার যে কত সময়, তা সবাই জানে।

কহিলাম, বলে তো সবাই, বাউরীপাড়ায় সারারাত—

রাধানাথ গর্জন করিয়া উঠিল, দেখ মাস্টার, মুখ সামলে কথা বলবে বলছি।

কহিলাম, কেন? বাউরীপাড়ায় রাত্রে আড্ডা দাও না?

তোমাদের মত অধার্মিক লোকেরাই ওই কথা বলে। রাত দুটো পর্যন্ত খোল-করতালের শব্দ, কীর্তনের শব্দ পাও না? না, কালা হয়েছ?

শুনতে তো পাই, তবে—

রাধানাথ তাহার মুখটা আমার মুখের সামনে আনিয়া কড়া গলায় কহিল, কি তবে?

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, থাক্ থাক্, বাজে কথায় ঝগড়া ক'রো না, মাগীটাকে কি ক'রে জব্দ করা যায়, একটা উপায় ঠিক কর দেখি।

রাধানাথ সরিয়া বসিয়া কহিল, উপায় বাতলালেই বা কি হবে? ঘরের বিভীষণদের না তাড়ালে কিছু হবে না।

কহিলাম, তার মানে?

মানে তো বুঝতেই পারছ। হয় ওদের ছাড়, না হয় আমাদের এখানে এসো না।

সাভিমানে গাঙ্গুলী মশায়কে কহিলাম, আপনারও কি তাই মত? গাঙ্গুলী মশায় চুপ করিয়া রহিলেন। বলিলাম, বেশ, তা হ'লে আমি উঠি, আপনারা পরামর্শ করুন। উঠিবার উপক্রম করিতেই গাঙ্গুলী মশায় হাতে ধরিয়া বসাইয়া কহিলেন, আরে, ব'স না ভায়া। রাধানাথের আজ রাগ হয়েছে, ওর কথা ছেড়ে দাও।

কহিলাম, সব কথা ছেড়ে দিলে চলে না। ওর মাত্রাজ্ঞান বড় কম। সেদিন দেখুন না, থানাতে কি কাণ্ডটাই করলে! আপনাদের যে দরখাস্ত নাকচ হয়েছে, বলতে গেলে ওর দোষেই হয়েছে। আপনার মত তো বললেই পারত, পরে দোষ, ও রকম ক'রে পালিয়ে যাবার কি দরকার ছিল?

রাধানাথ তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, আমার অবস্থায় পড়লে সব অধমকেই পালাতে হ'ত। কি রকম পেটের অসুখ! ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করগে না!

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, এস. ডি. ও. সাহেব কিছু বলছিলেন নাকি?

গম্ভীরভাবে কহিলাম, হ্যাঁ, ঐ ধরনের কথাই বলছিলেন। আর সত্যি কথাই তো, সরকারের ওপর দরদ না দেখালে সরকারই বা দরদ দেখাবেন কেন?

গাঙ্গুলী মশায় চিন্তিতমুখে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, সত্যি; কথাটা উল্টাইবার জন্য রাধানাথ কহিল, বুড়ীটার কপালে অনেক দুঃখু আছে দেখছি, শুধু ইহকালে নয়, পরকালেও।

কহিলাম, ইহকালের দুঃখু তো তিনি স্বীকার করেন না দেখলাম।

মানে?

নিজের মুখেই তো বললেন, খুব সুখে আছেন, কোথাও যেতে চান না।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, তাই নাকি? এত দেখে শুনেও বুড়ীর জ্ঞান হচ্ছে না?

রাধানাথ কহিল, বুড়ী কি দেখতে শুনতে পায় যে, বুঝবে? ভাবছে, ভারি সুখে আছি, ওদিকে যে পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাচ্ছে, মুসলমানীর হাতে জল খেয়ে।

প্রতিবাদ করিলাম, ও কি কথা! ভদ্রমহিলার নামে যা-তা ব'লো না রাধানাথদা।

রাধানাথ মুখ ভেংচাইয়া কহিল, ওঃ, দরদের সীমা নেই দেখছি যে! দারোগা সাহেবের সঙ্গে নটখটির কথা কে না জানে গাঁয়ে! দিনরাত আটটা বাজতে না বাজতে ওর বাড়িতে যাওয়া, রাত এগারোটা পর্যন্ত আড্ডা দেওয়া, গাঁয়ে কে না দেখেছে! দারোগা সাহেবের স্ত্রী পর্যন্ত শুনেছে সেই কথা।

কহিলাম, তাই নাকি?

রাধানাথ কহিল, শুনবে না! বাউরী মেয়েগুলো ওদের বাড়িতে চাকরানীর কাজ করে, তারা সব শুনে বলেছে গিয়ে।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, দারোগাবাবুকে কিছু বলে নি?

চোখ ডাগর করিয়া রাধানাথ কহিল, বলে নি আবার! রাতদিন

ঝগড়া কচকচি চলছে বাড়িতে। একটা কিছু কাণ্ড না হয়ে যায়। আমাদের হিন্দু স্ত্রী তো নয় যে, সব মুখ বুজে সহ্য করবে। দৃঢ়কণ্ঠে কহিলাম, কিন্তু এ কথা তো সম্পূর্ণ মিথ্যা। ধমকের সুরে রাধানাথ কহিল, দেখ মাস্টার! বেশি চালাকি ক'রো না, সব জান তুমি।

সব জানি ব'লেই বলছি, সরোজিনী চতুর হতে পারে বটে, কিন্তু তার চরিত্রের কোন দোষ নেই।

গাঙুলী মশায় ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন যে, তিনি আমার সহিত একমত নহেন। রাধানাথ, গাঙুলী মশায়ের সমর্থনে উৎসাহিত হইয়া কহিল, চরিত্রের দোষ নেই! তাই একজনে শানছে না, আর একজনকে জুটিয়েছে! সকৌতুকে কহিলাম, সে আবার কে?

রাধানাথ নাক উঁচাইয়া কহিল, কেন? আজিজ সাহেব। সেও যে জুটেছে আজকাল। শেষে শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই বেধে না যায়।

কহিলাম, আজিজ সাহেব একদিনই তো ওর বাড়িতে এসেছিল এস. ডি. ও. সাহেবের সঙ্গে। তাও নিজে আসে নি, এস. ডি. ও. সাহেব ধ'রে নিয়ে এসেছিলেন।

ঘাড় নাড়িয়া মুখ বিকৃত করিয়া রাধানাথ কহিল, আজ্ঞে না, তার পরদিন তো এসেছিল নেমন্তন্ন খেতে।

সবিস্ময়ে কহিলাম, নেমন্তন্ন!

ঘাড় কাত করিয়া চোখ মুদ্রিতপ্রায় করিয়া রাধানাথ কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, নেমন্তন্ন। তোমাদের শ্রীল শ্রীযুক্তা সরোজিনী দেবী শুম্ভ নিশুম্ভ দুজনকেই নেমন্তন্ন খাইয়েছিলেন। ঘাড় সোজা করিয়া মুচকি হাসিয়া কহিল, তিনকড়ের দলের ছেলেরা বলে, শ্রীমতী সরোজিনী দেবী। কটমট করিয়া তাকাইয়া কহিল, দেবী থেকে যেদিন বেগম সাহেবা বনবে, সবার চোখ ফুটবে সেদিন।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, কাল নাকি মাগীটা আজিজ সাহেবের বাড়ি পালকি ক'রে বেড়াতে গিয়েছিল ?

রাধানাথ উপরে ও নীচে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হ্যাঁ তো। আজিজ সাহেব পালকি পাঠিয়ে দিয়েছিল। শুধু মাগীই যায় নি, মন্থর মেয়েটাও গিয়েছিল।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, যেটাকে তিনকড়ের ঘাড়ে চাপাচ্ছে ?

রাধানাথ কহিল, হ্যাঁ, আজিজ সাহেবের মেয়ের সঙ্গে নাকি ধর্ম-মা পাতানো হচ্ছে। হাসিয়া কহিল, ধর্মনাশ হ'লেই মা হবে, তারই গোড়া-পত্তন আর কি। আর ওদিকে যিনি ধর্ম-জামাই হবেন, তিনি যদি ধর্ম-শাশুড়ীকে ধ'রে টানাটানি করেন, তখন বুঝবে মজাটা।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, কে ?

রাধানাথ কহিল, আজিজ সাহেবের ভাইপো, ওই যে সেদিন সভায় এসেছিল। কি রকম চোয়াড়ে চেহারা দেখলেন ওর ? সব পারে ও। ওর সঙ্গেই আজিজ সাহেবের মেয়ের বিয়ের সব ঠিকঠাক যে।

গাঙ্গুলী মশায় বিষাদগম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, আমরা বেঁচে থাকতেই গাঁয়ের এই অধঃপতন আরম্ভ হ'ল, আমরা ম'রে গেলে কি যে হবে, কে জানে !—বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

রাধানাথ সান্ত্বনার সুরে কহিল, কি করবেন, গাঁয়ের যে একতা নেই। না হ'লে দেখুন না, ওদের জব্দ করবার জন্যে একঘরে করা হ'ল তো গাঁয়ের ছোকরারা ওদের ধারে দাঁড়াল, মাস্টারের মত গণ্যি-মান্যি লোক ওদের সাহায্য করতে লাগল। গাঁয়ে একতা থাকলে এক-ঘরে হয়েও মন্থ চক্রবর্তী মেয়ের বিয়ে দিতে পারে, না, ওই মাগীটা চোখের সামনে যা-তা করতে সাহস করে ?

গাঙ্গুলী মশায় চিন্তাকুল মুখে কহিলেন, সত্যি।

রাধানাথ সঙ্কোচে বলিতে লাগিল, এই দেখুন না, আপনার কথা-মত তিনের দলের ছোঁড়াগুলোর বাড়িতে বাড়িতে যেয়ে ওদের বাপ-জ্যেঠাদের বলতে গেলাম, তিনের বিয়েতে ছেলেগুলোকে খেতে মানা ক'রে দাও, না হ'লে সব একঘরে হ'তে হবে, তা সবাই কি বললে জানেন ? বললে, ছেলেরা কোথায় কি করছে, তা সমাজের দেখবার দরকার কি ? বললাম, ছেলেগুলি তো কচি খোকা নয়, যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, সামাজিকভাবে মনু চক্রবর্তীর বাড়িতে খেলে সামাজিক দণ্ড নিতে হবে।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, কি জবাব দিলে সব ?

জবাব দিলে, ঠিক বাচতে গাঁ উজোড় হবে, তখন তোমরাই এক-ঘরে হয়ে যাবে।

গাঙ্গুলী মশায় মুখ কালো করিয়া আর একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

১৭

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় গাঙ্গুলী মশায়ের বাড়ি গেলাম না, যাইতে ইচ্ছা করিল না। রাধানাথ নিশ্চয়ই এতক্ষণে জুটিয়াছে সেখানে, দেখিবামাত্র ঝগড়া শুরু করিবে। কাজেই, যে আধ-পাকা রাস্তাটি পুরা পাকা রাস্তা হইতে বাহির হইয়া আমাদের স্কুলের সামনে দিয়া রাঙামাটি পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, সেই রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলাম। অচিরে গ্রাম ছাড়াইয়া বাহিরে আসিলাম। আসিতেই চোখে পড়িল, দুই পাশে সদ্য-কর্ষিত মাঠের শ্রেণী দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত; এই এক-টানা ধূসরতার মধ্যে মাঝে মাঝে সবুজের ছোপ, চাষারা ধানের চারা

তৈয়ারি করিয়াছে; সামনের দিকে দূরে পাশাপাশি ছোট ছোট গ্রামগুলি—চাঁদাই, চপাই, মান্দারবুনি। চপাই গ্রামে আজিজ সাহেবের বাড়ি আমাদের গ্রাম হইতে তিন মাইল।

সন্ধ্যার পরেই ফিরিলাম। হাতল-হীন সোনার কাস্তের মত শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ পশ্চিম-আকাশে উঠিয়াছে। তাহারই ম্লান আলোকে আকাশ, প্রান্তর, দূর দিগন্ত-রেখা, গ্রামান্তের সারি সারি বাঁশের ঝাড়, দীঘির পাড়ে তালগাছের শ্রেণী রহস্যময় রূপ ধারণ করিয়াছে। দেখিয়া বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল। হঠাৎ মনে হইল, জীবনটা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। কৈশোরে ও যৌবন-প্রারম্ভে কত কর্মহীন মধ্যাহ্নে ও নিদ্রাহীন নিশীথে কল্পনার তুলি দিয়া মনের পটে ভাবী জীবনের যে বিচিত্রবর্ণ ছবি আঁকিয়াছিলাম, বাস্তব জীবনের সঙ্গে তাহার বিন্দুমাত্র মিল হইল না; মানসী প্রিয়ার বদলে মাত্র স্ত্রী, উচ্চ রাজপদের বদলে মাস্টারি, দেশব্যাপী খ্যাতি ও সম্মানের বদলে একটি নেহাত পল্লীগ্রামে চাষাভূষাদের মধ্যে স্বল্প প্রতিপত্তি। তবু এই লইয়াই তো জীবনের অর্ধেকটা কাটাইয়া দিলাম। প্রথম প্রথম মাঝে মাঝে অসন্তোষের কাঁটা ফুটিত, ভাগ্য ও ভগবানের বিরুদ্ধে মনে বিদ্রোহ জাগিত; আজকাল মন অনেকটা পোষ মানিয়াছে, ডাইনে ও বামে বাড়ির আঘাত খাইয়া খাইয়া নিরীহ শান্ত বলদের মত বাঁধা রাস্তা ধরিয়া চলিতে শিখিয়াছি। হঠাৎ সামনে কড়া ও চড়া কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল, কে? থমকিয়া দাঁড়াইয়া চাহিয়া দেখিলাম, দুইটা লোক আমার দিকে আসিতেছে। গ্রামের সীমানার মধ্যে ঢুকিয়াছি, কাজেই চোর-ডাকাত যে আক্রমণ করিবে, তাহার ভয় নাই; করিলেও সঙ্গে মূল্যবান কিছুই নাই, তাহা ছাড়া হাঁকাহাঁকি করিলে লোকজন আসিয়া পড়িবে। কাজেই সাহসের সহিত দাঁড়াইয়া রহিলাম। লোক দুইটা কাছাকাছি

আসিতেই দুই চক্ষের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়া তাহাদিগকে চিনিতে চেষ্টা করিলাম। সামনের লোকটা কাছে আসিয়াই কহিল, কে? মাস্টারবাবু? চিনিলাম, আজিজ সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র সত্তর সাহেব। পরিধানে গাঢ় লাল ও নীল রঙের ঘর-কাটা লুঙ্গি, গায়ে রঙিন গেঞ্জি। আমাকে দর্শন-দান করিল কেন? হাত করিবার বিদ্যাটা এখনই প্রয়োগ করিতে শুরু করিবে নাকি?

জবাব দিলাম, হঁ্যা।

সত্তর একেবারে গা ঘেঁষিয়া আসিয়া, দুই হাতে গলা জড়াইয়া ধরিয়া শিথিল কণ্ঠে কহিল, আপনাকে যে গরু-খোঁজা করছিলাম এতক্ষণ, কোথায় ছিলেন বলুন দেখি?—বলিয়া ঠিক মুখের সামনে মুখটা আনিয়া স্থির করিয়া দিল।

মুখ হইতে মদের তীব্র গন্ধ নাকে ঢুকিয়া পেটের ভিতরটা পাক দিয়া উঠিল। গলা হইতে হাত দুইটা ছাড়াইতে চেষ্টা করিয়া কহিলাম, বেড়াতে গিয়েছিলাম।

ডান হাত তুলিয়া লইয়া বাম হাত দিয়া গলাটা আরও ঘনভাবে সাপটাইয়া ধরিয়া সঙ্গী লোকটাকে সম্বোধন করিয়া টানিয়া টানিয়া বলিতে লাগিল, রে রমজান! আমার কথাই ঠিক তো? তুই বলছিলি কোথায় ফুর্তি করতে গেছে এই সাঁঝ রেতে। তা আবার পারে? মাস্টারবাবু যে!—বলিয়া ঠোঁট দুইটায় চাড়া দিয়া হাসিবার ভঙ্গী করিল।

কহিলাম, ছেড়ে দিন, রাত হয়ে গেল, বাড়িতে কাজ আছে আমার।

শুনিয়া সত্তর হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল, যেন ভারি একটা রসিকতা করিয়া ফেলিয়াছি:

একটু পরেই হাসি থামাইয়া, ঘাড়টি ডাইনে বামে নাড়িয়া, চোখ দুইটাতে চাড়া দিয়া কহিল, আমারও তো কাজ আছে মাস্টারবাবু। না হ'লে এই সন্ধ্যে রেতে কেউ একটা মন্দ মাস্টারের কাছে আসে, অ্যাঁ?—বলিয়া আমার কাঁধের উপর ডান হাতটা আবার চাপাইয়া মুখের কাছে মুখ আনিয়া আবার পূর্ববৎ হাসিবার ভঙ্গী করিল। হাত দুইটা একটু আলগা মনে হইতেই চট করিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া কহিলাম, কি কাজ আছে বলুন, আমার সময় নেই।

সত্তর নিজের হাত দুইটা কোমরের দুই পাশে রাখিয়া বুক চিতাইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কি বললে? সময় নেই? আমারও সময় নেই মাস্টারবাবু। কত ফুর্তি মাঠে মারা যাচ্ছে, বল দেখি, অ্যাঁ?

কহিলাম তা হ'লে বাজে কথায় সময় নষ্ট না ক'রে কাজের কথাটা ব'লে ফেলুন।

সত্তর চোখ দুইটা একবার বুজিল, ঠোঁট দুইটায় একবার চাড়া দিল, তারপর কহিল, বলছি, কিন্তু এখানে নয়, আর একটু এগিয়ে চলুন।

লোকটার মতলব কি? কোন খুন-জখম করিবে নাকি? কিন্তু জ্ঞানত কোন অপরাধ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ভীতকণ্ঠে কহিলাম, আবার এগিয়ে যাওয়া কেন? এখানেই বলুন না।

সত্তর শিথিলকণ্ঠে টানিয়া টানিয়া বলিতে লাগিল, প্রাণের কথা কি যেখানে সেখানে বলা যায়, মাস্টারবাবু? একটু গোপনে বলতে হয়। সঙ্গের লোকটাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, এই বে রমজান, একটু আগিয়ে একটা নিরিবিলি জায়গা দেখ্ না। কদমগাছের তলা হ'লে সবসে ভাল।—বলিয়া বেয়াড়া সুরে গাহিয়া উঠিল, কদম্বতলে বসিয়া বিরলে (বিন্দে) বলিব প্রাণেরই কথা।

কহিলাম, ও আবার কি হচ্ছে?

সত্তর কহিল, বুঝতে পারছ না মাস্টারবাবু? তোমাদের কেষ্ট বিন্দেদূতীকে বলছে, সখী গো! ওই কদমগাছের তলায় ব'সে আমার প্রাণের কথা বলিগে চল। আমার কাঁধে থাবা মারিয়া কহিল, তুমি বিন্দেদূতী। নিজের বুকে চাপড় মারিয়া কহিল, আমি কেষ্ট। ডান হাতটা তুলিয়া কহিল, আর তোমার—

বাধা দিয়া কহিলাম, বুঝেছি, কিন্তু আমি কোথাও যাব না, যা বলবার এখানেই বলুন।

সত্তর হাঁক দিল, রমজান! মাস্টার যায় না যে। আয় তো-চ্যাংদোলা ক'রে নিয়ে যাই।

রমজান কাছে আসিয়া আমার দিকে চোখ ঠারিয়া কহিল, চলুন না বাবু, কিছু ভয় নেই আপনার। কি বলবেন শুনেই চ'লে আসবেন।

পদব্রজে যাওয়াই শ্রেয় মনে করিলাম। সত্তর ও রমজান আমার পিছু পিছু আসিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে একটা সাঁকোর কাছে আসিয়া পৌঁছিলাম, রাস্তার দুই পাশ ইট ও সিমেণ্ট দিয়া উঁচু করিয়া বাঁধানো। কহিলাম, এইখানে বসলে হয় না?

সত্তর কহিল, এখানে কদমগাছ কই?

কহিলাম, কদমগাছ নেই এ তল্লাটে।

সত্তর ধমকের সুরে কহিল, কে বললে নেই? রমজান!

রমজান কহিল, ঠিক বলেছেন উনি, এখানেই বসুন।

তাই বসি, তা হ'লে তুই স'রে যা এখান থেকে। রমজান দূরে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দুইজনে পাশাপাশি বসিলাম। সত্তর কহিল, সেদিন সেই যে মেয়েটিকে দেখলাম, ও আপনার বোন, নয়?

কহিলাম, নিজের বোন নয়, এমনই 'দাদা' ব'লে ডাকে।

ও, পাতানো। তা হোক। চোখ মটকাইয়া কহিল, বেশ দেখতে,

নয়? যেমন রঙের জৌলুস, তেমনই আঁটসাঁট বাঁধন, বয়সও কাঁচা। চুপ করিয়া রহিলাম। সত্তর ভ্রূ দুইটা কুঁচকাইয়া মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়া কহিল, তা মেয়েটার আজিজ সাহেবের সঙ্গে এত দহরম-মহরম কেন বল দেখি? সাদি করবে নাকি ওকে?

জবাব দিলাম, জানি না।

সত্তর কড়া গলায় কহিল, জান না? কিন্তু এই কথাটা জেনে রাখ, ওসব চলবে না। আমি জল-জীয়ন্ত বেঁচে থাকতে, আমার চোখের সামনে ওই পঞ্চাশ বছরের বুড়ো যে ওই বসরাই গোলাপকে ছিঁড়ে নিয়ে গলায় পরবে, তা হবে না।—বলিতে বলিতে উত্তেজনায় উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর দুই মুষ্টিবদ্ধ হাত দিয়া বুকে একসঙ্গে এক জোড়া কিল মারিয়া কহিল, বরং জান দোব, তবু যাকে প্রাণ চায়, তাকে পরের হাতে তুলে দিতে পারব না।—বলিয়া বাম হাত বুকে রাখিয়া ডান হাতটা তুলিয়া, আমার দিকে কটমট করিয়া তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আমিও উঠিয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিলাম। করিতেই আমার দুই কাঁধে দুই হাতে চাপ দিয়া আমাকে বসাইয়া কহিল, যাচ্ছ কোথা? আরও কথা আছে আমার।—বলিয়া হাত দুইটা পিছনে ঝুলাইয়া ও বুক্ত করিয়া পায়চারি করিতে শুরু করিয়া দিল। আমি ভয়ে ভয়ে কহিলাম, আর কি বলবার আছে বলুন, রাত হয়ে গেল যে।

থমকিয়া দাঁড়াইয়া সত্তর কহিল, একটা কাজ করতে পার?

কহিলাম, কি?

সত্তর হাতছানি দিয়া ডাকিয়া কহিল, এখানে এস।

বসিয়া রহিলাম। কড়া গলায় ডাকিল, এস। উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কহিল, কাছে এস। ভয়ে ভয়ে কাছে গেলাম। যাইতেই আমাকে

জড়াইয়া ধরিয়া, উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া সত্তর কহিতে লাগিল, মাস্টার! আমার প্রেয়সীর পাতানো দাদা, প্রাণের মাস্টার! আমার বুকের ভেতরটা জ্ব'লে যাচ্ছে মাস্টার, তাকে না দেখতে পেলে আমি বাঁচব না মাস্টার।—বলিয়া আমার কাঁধে মাথা রাখিয়া কোঁপাইয়া কোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কি করিয়া এই মাতালের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইব, তাহার উপায় সম্বন্ধে আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলাম। কহিলাম, ছেড়ে দিন, উপায় বাতলে দিচ্ছি।

ছাড়িয়া দিয়া সত্তর কহিল, কি উপায় বল মাস্টার। আজই তাকে একটি বার দেখবার উপায় আমাকে বাতলে দাও। তুমি যত টাকা চাও, আমি দোব।

কহিলাম, দেখা তো আজ হবে না।

আঁতকাইয়া উঠিয়া সত্তর কহিল, দেখা হবে না? আর্তকণ্ঠে ডাক দিল, রমজান! রমজান কাছে আসিতেই কহিল, শুনছিস, কি বলছে মাস্টার? বলছে, দেখা হবে না আজ। তা হ'লে আমি বাঁচব? রমজান ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, বাঁচিবে না। সত্তর দুই চোখ ডাগর করিয়া কহিল, তবে মাস্টার? হিন্দু মুসলমানের প্রাণের দুঃখ বোঝে না ব'লেই আমাদের এত রাগ তোমাদের ওপর, তাই এত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, এত মারামারি, বুঝলে? চুপ করিয়া রহিলাম। সত্তর বলিতে লাগিল, আমি মুসলমান কিনা, তাই আমার ওপর দরদ হচ্ছে না তোমার। সেদিন কোথাকার কে একটা হাকিমকে হিন্দু ব'লেই সরাসরি অন্দরে ঢুকিয়ে দিলে। এই একচোখোমি যতদিন না তোমাদের যাবে, ততদিন হিন্দু-মুসলমানে মিল হবে না।—বলিয়া চোখ বুজিয়া মাথাটা বার দুই নাড়িল, তারপরে চোখ খুলিয়া রাগত স্বরে কহিল, আজিজ সাহেবের বাড়ি পাঠিয়ে দাও, আর আমার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিতে

পারবে না? আমার এই চাঁছা-পোঁছা চেহারার চেয়ে ওর ভালুকের মত চেহারা তোমাদের পছন্দ হ'ল?

কহিলাম, দেখা হ'লে কি করবেন আপনি?

কি করব? খপ করিয়া আমার হাত ধরিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিল, হাত ধ'রে আমার প্রাণের ব্যথা তাকে জানিয়ে আসব। (হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া) এমনই ক'রে ব'সে, (আমার করতল চুম্বন করিয়া) এমনই ক'রে চুম খেয়ে বলব, পিয়ারী! আমার প্রাণ, মান, ধন, সম্পত্তি, আমার চামড়ার কারবার পর্যন্ত, সব তোমার পায়ে সঁপে দিচ্ছি, তুমি আমার হও।—বলিয়া আমার মুখের দিকে ঢুলু-ঢুলু চোখে চাহিয়া রহিল।

হঠাৎ বুদ্ধি খেলিল, কহিলাম, উঠুন, আমি যা বলি শুনুন। ওইসব যদি ইচ্ছে থাকে তো আমাকে দিয়ে হবে না। মেয়েটি মন্টু চক্রবর্তীর নিজের বোন, ওর কথা ও খুব শোনে, মরতে বললে মরে, বাঁচতে বললে বাঁচে, ওকে গিয়ে ধরুন। ও-ই সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে। উঠিয়া দাঁড়াইয়া সত্তর কহিল, মন্টু চক্রবর্তী কে? আমি কহিলাম, ওই যে ভদ্রলোক মেয়েটির পক্ষ থেকে সেদিন যুদ্ধের চাঁদা দিলে, আপ্যায়িত ক'রে সবাইকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেল, বাড়ির ভেতর থেকে মেয়েটিকে ডেকে নিয়ে এল।

ভ্রূ নাচাইয়া সত্তর কহিল, তাই তো, আমার ওর কথা মনে পড়ে নি। মিথ্যে একটা বাজে লোকের সঙ্গে সময় নষ্ট করলাম। কড়া গলায় কহিল, এতক্ষণ না ব'লে চুপ ক'রে ছিলে কেন? কেন মিথ্যে এতক্ষণ সময় নষ্ট করলে?—বলিয়া রুখিয়া আসিবার উপক্রম করিতেই রাস্তার মাঝখানে সরিয়া দাঁড়াইয়া রমজানের দিকে তাকাইলাম। সে কহিল, বাবুর বোধ হয় মনে পড়ে নি, ওকে ছেড়ে দিয়ে চক্রবর্তীর ওখানেই

চলুন। আমাকে কহিল, চক্রবর্তীর বাড়ি আমাদের দেখিয়ে দেবেন চলুন।

সত্তর লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চলিতে লগিল। আমি ও রমজান পিছু পিছু যাইতে লাগিলাম। সত্তর কতকটা আগাইয়া যাইতেই রমজানকে কহিলাম, রমজান, কাজটা ভাল হচ্ছে কি?

রমজান কহিল, কি করব বাবু? এখন কি কিছু হুঁশ আছে, একদম পাগল। সারাদিন মদ গিলেছে আজ। কোন কথা বললে শুনবে না, উল্টে মারধর করতে আসবে।

কহিলাম, কিন্তু এটা ভদ্রলোকের বাড়ি তো। মামলা-মকদ্দমায় প'ড়ে যাবে শেষে।

রমজান ভীতভাবে কহিল, সত্যি, কি করব বলুন দেখি?

কহিলাম, ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাড়ি নিয়ে যাও।

রমজান হাঁক দিল, শুনছেন?

সত্তর থমকিয়া দাঁড়াইয়া সাড়া দিল, কি? পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া কহিল, তাড়াতাড়ি আয় না, পিছিয়ে পড়ছিস কেন?

রমজান কহিল, একবার শুনুন, কি বলছেন ইনি।

সত্তর কহিল, কি বলছে?

রমজান কহিল, বলছেন, চক্রবর্তী আজ বাড়িতে নেই, আজিজ সাহেবের সঙ্গে জেলায় গেছে।

সত্তর রাস্তার উপরেই বসিয়া পড়িল। কাছে যাইতেই কহিল, আজ বুড়ো জেলায় গেছে, নয়?

রমজান ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হ্যাঁ।

আমার দিকে তাকাইয়া সত্তর কহিল, চক্রবর্তী যে ওর সঙ্গে গেছে, তা জানলে কি ক'রে?

কহিলাম, আমি নিজের চোখে দেখেছি।

লাফাইয়া উঠিয়া তাড়িয়া আসিয়া কহিল, দেখেছ তো বল নি কেন, অ্যাঁ?

রমজান সামলাইয়া লইয়া কহিল, কি করবেন উনি, মনে ছিল না বোধ হয়।

টকটকে লাল চোখের তারা দুইটা চরকির মত ঘুরাইয়া মুখ ভেংচাইয়া সত্তর ধমকের সুরে কহিল, মনে ছিল না! মনে থাকে না কেন? মাস্টারি কর কি ক'রে?

রমজান কহিল, তবে আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে? বাড়ি চলুন আজ। কাল চক্রবর্তী ফিরলে ব্যবস্থা করা যাবে। আমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, চ'লে যান আপনি।—বলিয়া চোখের ইঙ্গিত করিল। আমি দ্রুতপদে স্থান ত্যাগ করিলাম এবং কতকটা রাস্তা আসিয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিলাম, রমজান সত্তরকে পাকা রাস্তা হইতে নামাইয়া মাঠের দিকে ধরিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেছে।

দেহ ও মন দুইয়ের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল হইয়া উঠিয়াছে। ডলাই-মলাইয়ের চোটে মাথা হইতে কোমর পর্যন্ত পাকা ফোড়ার মত টনটন করিতেছে; কাঁধের কাছে জামাটা চোখের জলে ও মুখের লালায় ভিজিয়া গিয়াছে; সারা দেহে মদের তীব্র গন্ধ। বাড়িতে গিয়া গৃহিণীর কাছে কি কৈফিয়ৎ দিব, তাহা ভাবিয়া কূল-কিনারা পাইতেছি না। তা ছাড়া ওই পাষণ্ডটার উপরে রাগে ও ঘৃণায় মনের ভিতরটা জ্বালা করিতেছে। কি পাপিষ্ঠ বলুন দেখি! একজন ভদ্রমহিলার প্রতি পাশবিক মনোভাব একজন ভদ্রলোকের কাছে প্রকাশ করিতে তো বিন্দুমাত্র লজ্জিত হয়ই নাই, তাহার উপর এই দুষ্কর্মে সাহায্য করিবার জন্য তাহাকে টানাটানি, অপমান ও ভয়-প্রদর্শন! কি মনে করে ইহারা?

হিন্দুর মেয়ের মান-মর্যাদা মাটির মূল্যে নামিয়া গিয়াছে নাকি? না, মা বোন ও স্ত্রীদের সম্ভ্রম ও সতীত্ব রক্ষা করিবার সামর্থ্য বাঙালী হিন্দু হারাইয়া ফেলিয়াছে? সরোজিনীর উপর রাগ হইল। কেন সে নিজেকে এত সুলভ করিতেছে? আজিজ সাহেবের বাড়ি যাইবার তাহার কি প্রয়োজন ছিল? যাহাদের মন হইতে নারীদেহের প্রতি পশু-সুলভ নির্বিচার লোভ শিক্ষা ও সংস্কৃতির জারক-রসে এখনও নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায় নাই, তাহাদের সামনে দাঁড়াইবার তাহার কি প্রয়োজন? লেখাপড়া শিখিয়া আপ-টু-ডেট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া কি? যদি নিপীড়ন করে, ধর্ষণ করে, আত্মরক্ষা করিতে পারিবে কি? তাহার পুরুষ আত্মীয় ও বন্ধুরা—মনু চক্রবর্তী, তিমু ও তাহার দলবল তাহার মর্যাদাহানির প্রতিশোধ লইতে পারিবে কি? পারিবে না। সকলে দিন কয়েক হৈ-চৈ করিবে, বাস্ফোট ও বাগাড়ম্বর করিবে, পুলিস ডাকিবে, সরকারের কাছে দরবার করিবে ও কান্নাকাটি করিবে। কিন্তু একজন অসভ্য, অশিক্ষিত সাঁওতাল-পুরুষের মত নারীর প্রতি অপমান ও অত্যাচারের নিজের হাতে প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া ছুটিবে না। আমি কি করিলাম? লেখাপড়া শিখিয়া সভ্য হইয়াছি, সুনাম রক্ষা করিবার জন্য সর্বদা সন্ত্রস্ত হইয়া আছি, তাই ওই পাষণ্ডটাকে সঙ্গে সঙ্গে চড় কষাইয়া দিয়া তাহার অন্যায় চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতে পারিলাম না, চুপ করিয়া ভয়ে ভয়ে পলাইয়া আসিলাম। শুধু আমারই কি এই অবস্থা? শিক্ষিত সভ্য সমগ্র হিন্দুসমাজের পুরুষদের এই অবস্থা। প্রতিদিন হিন্দুনারীর প্রতি অমানুষিক অত্যাচার স্বচক্ষে দেখিয়া বা তাহার কাহিনী সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া আমরা ক্রোধে ও ক্ষোভে আগুন হইয়া উঠি। কিন্তু ওই পর্যন্তই। পর-মুহূর্তেই প্রচণ্ড দীর্ঘনিশ্বাসে অন্তর্বাষ্প বিমুক্ত করিয়া দিয়া সিগারেট

ধরাইতে বসি অথবা কর্মান্তরে বা প্রসঙ্গান্তরে প্রস্থান করি। আমাদের মধ্যে যাহারা 'আমরা তরুণ, আমরা সবুজ' বলিয়া আস্ফালন করে, পায়জামা ও হাত-কাটা হাফ-কোট পরিয়া কম্‌রেড সাজিয়া, 'বিশ্বের যুবক এক হোক, বিশ্বের শ্রমিক এক হোক, বিশ্বের ছাত্র এক হোক' ইত্যাদি বুলি বলিয়া হুঙ্কার ছাড়ে, তাহারাও তাই। ইহারা কুঠিতে ও কারখানায়, কলেজে ও স্কুলে, অকারণে বা স্বল্প কারণে ধর্মঘট করিয়া বা করাইয়া, তারুণ্য-কণ্ডুয়ন নিবৃত্তি করে, কর্তৃপক্ষদিগকে মারধর করিয়া বা করিবার ভয় দেখাইয়া, মাস্টার ও প্রফেসারদের অপমান করিয়া, কর্তব্য ও নিয়ম-নিষ্ঠ সহকর্মী বা সহতীর্থদের নির্যাতন করিয়া বীরত্ব প্রদর্শন করে, কিন্তু মা-বোনদের মর্যাদা রক্ষা করিবার কালে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের দোহাই দিয়া নির্বিকার দাঁড়াইয়া থাকে। না হইলে, দিনের পর দিন ধর্ষিতা নারীর ক্রন্দন বাংলার আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে, আদালত-গৃহ হইতে হাকিমের চক্ষের সম্মুখে, পাষণ্ডের দল পশুর মতন হতভাগিনীদের ছিনাইয়া লইয়া গিয়া মাংসপিণ্ডের মত লোফালুফি ও কাড়াকাড়ি করিতেছে, তাহা শুনিয়া ও দেখিয়া তাহাদের তরুণ রক্ত তিলমাত্র তাতিয়া উঠে না তো! কাজেই যে সমাজের পুরুষেরা মেষ হইতেও ভীরু, পাষাণের চেয়েও প্রাণহীন, সেই সমাজের মা-বোনদের সতর্ক হইয়া চলা উচিত। তাহাদের বোঝা উচিত, এ দেশে সম্ভ্রম, সতীত্ব ও ধর্ম আমরণ বজায় রাখিতে হইলে পুরুষ-মুখাপেক্ষিতা ছাড়িয়া, হয় তাহারা নিজেরা শক্তিময়ী হইয়া উঠুক, না হয় অন্দরের ভিতরে অন্দর গাঁথিয়া সেখানে লুকাইয়া থাকুক, অথবা বোরখার উপরে বোরখা আঁটিয়া নিজেদের দুর্নিরীক্ষ্য করিয়া তুলুক।

১৮

দিন চার পরে—সকালবেলায় বৈঠকখানার সামনে হাঁক শোনা গেল. মাস্টার, ও মাস্টার, বেরোও না হে !

তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, মণীন্দ্র। আমাকে দেখিয়া কহিল, ওহে, তোমার সঙ্গে একটা দরকার আছে, শোন দেখি।

কহিলাম, এখানে দাঁড়িয়ে কেন ? ঘরে এসে ব'সে যা বলবার বল। হাতের ছাতাটা লাঠির মত উঁচাইয়া মণীন্দ্র কহিল, মাস্টার কিনা, সময়ের মূল্য তো বোঝ না, অনেক কাজ আমার—

কহিলাম, যত কাজ তোমার, জানা আছে, এস তো।—বলিয়া ঘরের ভিতরে আসিয়া বসিলাম।

মাস্টারি করলে যে বুদ্ধি-সুদ্ধি থাকে না—লোকে বলে, মিথ্যে নয়। আমার কাজ নেই তো গাঁয়ে কার কাজ আছে, শুনি ? এতবড় একটা এস্টেটের ম্যানেজারি, তার ওপর মাথার ওপরে মেয়ের বিয়ে।—বলিতে বলিতে মণীন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া চেয়ারে বসিয়া টেবিলে পা দুইটা তুলিয়া দিয়া কহিল, এক কাপ চা খাওয়াতে পার ? খাই নি যে তা নয়। তবে বউমার হাতের চায়ের মত মিষ্টি চা গাঁয়ে আর কেউ তৈরি করতে পারে না, সরোজিনী পর্যন্ত না। বাড়িতে ঢুকিয়া চায়ের জন্য বলিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, মন্নুদা চেয়ারে ঠেস দিয়া ঢুলিতেছে। তন্দ্রা না ভাঙাইয়া আবার বাড়ির ভিতরে গেলাম এবং চা লইয়া যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন মন্নুদার রীতিমত নাক ডাকিতে শুরু করিয়াছে। চায়ের পেয়ালাটি টেবিলে নামাইয়া মন্নুদাকে নাড়া দিতেই সে দুই রক্ত-চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া রুক্ষস্বরে কহিল, কি ? কহিলাম, চা খাবে না, ঘুমুচ্ছ যে এই সকালবেলায় ? মন্নুদা সোজা হইয়া বসিয়া মাথা নোয়াইয়া চায়ে

চুমুক দিয়া কহিল, আঃ! ভারি ভাল লাগছে ভায়া। প্রশ্ন করিলাম, কাল রাত্রে ঘুমোও নি নাকি? মণীন্দ্র জবাব না দিয়া প্লেটে চা ঢালিয়া কয়েক প্লেট খাইয়া কহিল, না।

কেন?

গরুর গাড়িটা চাল-ডাল-নুন-মসলা-তরিতরকারি-হাঁড়ি-বেড়ি-কড়াই-গামলাতে এমনই ঠাসাই হয়েছিল যে, সোজা হয়ে ব'সে থাকাই যায় না তো ঘুমুব কি?

মানে?

আরে, ফুটির বিয়ের জন্যে জিনিসপত্র কিনতে গিয়েছিলাম যে, কাল রাত্রে গরুর গাড়িতে ক'রে সব নিয়ে ফিরলাম।

কবে বিয়ে?

আজই রাত্রে। তাই তো নেমন্তন্ন করতে বেরিয়েছি, আর তোমার মত অকর্মার পাল্লায় প'ড়ে আটকে গেছি। আজ রাত্রে তোমার নেমন্তন্ন সরোজের ওখানে। ওইখানেই বিয়েটা হচ্ছে কিনা। তবে একেবারে খাওয়ার জন্যেই যেও না, একটু সকাল-সকাল যেও। আমার অবশ্য লোকের অভাব নেই, দারোগাবাবু আর আজিজ সাহেবের কৃপায় সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তা হ'লেও একটু দাঁড়িয়ে দেখো-শুনো আর কি।

আর কাকে কাকে নেমন্তন্ন করলে?

ভ্রূ নাচাইয়া মণীন্দ্র কহিল, কেন? গাঁয়ের সবাইকে। আমার কর্তব্যে আমি ত্রুটি করব কেন? যার ইচ্ছে হয় যাবে, না হয় না যাবে। খাওয়ার লোকের অভাব নেই। তবে খাবারের যে ফিরিস্তি দিয়েছি, অনেকেই যাবে ব'লে মনে হচ্ছে। ওঃ, তোমাকে দেওয়া হয় নি, না?—বলিয়া ফতুয়ার পকেট হইতে একটি মোড়ক-করা লাল রঙের চিঠি বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া কহিল, তোমার চিঠি।

কহিলাম, ওরে বাবা! বিয়ের চিঠি ছাপিয়েছ দেখছি যে!

দুই চোখ বড় করিয়া মণীন্দ্র কহিল, ছাপাব না? যে-সে লোকের মেয়ের বিয়ে নাকি? পাঁচশো চিঠি ছাপিয়েছি। গাঁয়ের সবাইকে এক-একখানা ক'রে দিয়েছি, প'ড়ে দেখ না।

খুলিয়া পড়িতে লাগিলাম। সর্বোপরি লেখা রহিয়াছে, প্রজাপতয়ে নমঃ, তাহার নীচেই একটি প্রসারিতপক্ষ প্রজাপতির ছবি, তারপর সবিনয় নিবেদন করা হইয়াছে—গঙ্গাধর চট্টরাজের পুত্র তিনকড়ি চট্টরাজের সহিত মণীন্দ্র চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ফুল্লরা দেবীর শুভ-বিবাহ হইবে। তারপর সবান্ধবে সকলকে বিবাহে যোগদান করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। সর্বশেষে জানানো হইয়াছে যে, লৌকিকতার পরিবর্তে কন্যা-জামাতার জন্য আশীর্বাদই নিমন্ত্রণকর্তার প্রার্থনীয়।

মণীন্দ্র এতক্ষণ একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল, পড়া শেষ হইতেই কহিল, উল্টো পিঠটা পড়। উল্টাইয়া দেখিলাম, ভোজ্য ও পেয়ের লম্বা ফিরিস্তি দেওয়া হইয়াছে। লবণ ও জল হইতে আরম্ভ করিয়া লুচি পোলাও, মাছ মাংস, সন্দেশ রসগোল্লা, মিহিদানা সীতাভোগ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মণীন্দ্র মুচকি হাসিয়া কহিল, কি রকম দেখছ? কেউ না-গিয়ে পারবে? ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সব নাক ডুবিয়ে খেয়ে আসবে, দেখো।

ভারী গলায় কহিলাম, আমি কিন্তু খেতে পারব না।

মণীন্দ্র পরম বিস্ময়ের সহিত কহিল, সে কি হে? তোমার আবার এসব—। বাধা দিয়া কহিলাম, আমি বিয়েতে যোগ দোব, যা করতে-কর্মাতে বলবে করব, কিন্তু—। বাধা দিয়া মণীন্দ্র কহিল, দেখ মাস্টার, বোকামি ক'রো না। এ তোমার পাড়াগাঁয়ের ভোজ নয়, আর সদী পদী দামী ক্ষেমী যার-তার হাতের রান্নাও নয়। সব জিনিষ শহর থেকে

আনা হয়েছে, আর হালুইকর রাঁধুনীও এসেছে সেখান থেকে। যদি না খাও তো পস্তাবে শেষে।

চুপ করিয়া রহিলাম। মণীন্দ্র ঝাঁজের সহিত কহিল, বাড়িতে যে কি খাও, তা জানা আছে। জীবনে একবার আমার ঘাড় দিয়ে মুখটা বদলে নিতে পারতে, তবে অদৃষ্টে আবার থাকা চাই তো! না হ'লে এমন সুযোগ পেয়েও এমন মতিচ্ছন্ন!

বাধা দিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিলাম, যা-ই খাওয়াও, আমি আজ খেতে পারব না। দলাদলিতে কোন পক্ষে থাকা আমার উচিত নয়। আজ যেমন তোমার বাড়িতে খাচ্ছি না, সেদিন তেমনই গাঙুলী মশায়ের বাড়িতে খাই নি। অন্যদিন বল তো ডাল-ভাত খেয়ে আসতে পারি।

মণীন্দ্র কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, তাই ক'রো। মোদ্দা আজ কিন্তু যাওয়া চাই, না হ'লে সরোজিনী দুঃখু করবে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, বেশ, আজ না খাও, পরশু খেতে তো আপত্তি নেই?

কহিলাম, পরশু আবার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার আছে নাকি?

মাথায় ঝাঁকানি দিয়া মণীন্দ্র কহিল, তা আর নেই? বড় বড় লোক সব খাবে পরশু—এস. ডি. ও. সাহেব, দারোগাবাবু, আজিজ সাহেব, আর তার হবু জামাই সশুর সাহেব।

কহিলাম, আজিজ সাহেবদের আবার কেন?

বাঃ রে! আজিজ সাহেবকে নেমন্তন্ন করব না? কি সাহায্য করেছে বল দেখি! ও না থাকলে এস. ডি. ও. সাহেব কি এত খাতির করত? তা ছাড়া বিয়েতেও কম সাহায্য করে নি। জিনিসপত্তর কিনে দিয়েছে, আনবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। যত মাছ লাগবে, সব নিজের

পুকুর থেকে ধরিয়ে দিচ্ছে।—বলিয়া কিছুক্ষণ দম লইয়া কহিল, তা ছাড়া নতুন আত্মীয়তাও হয়েছে ওর সঙ্গে যে।

বিস্ময়ের ভান করিয়া কহিলাম, সে আবার কি ?

কেন ? জান না তুমি ? আজিজ সাহেবের মেয়ের সঙ্গে সরোজ ধর্ম-মেয়ে পাতিয়েছে।

গম্ভীর মুখে কহিলাম, দেখ মনুদা, মুসলমানদের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতা করা ভাল হচ্ছে কি ?

কপাল কুঁচকাইয়া মণীন্দ্র কহিল, মন্দটা কি শুনি ? আপাতত ত্রিশ-চল্লিশ টাকার মাছ পাওয়া যাচ্ছে। তা ছাড়া লোকজনের সুবিধে। পরে আরও কত উপকার পাওয়া যাবে ওর কাছ থেকে। ওহে, তোমাদের মত হেঁজি-পেঁজি লোক নয়, হাকিমরা একবারে ওর মুঠোর মধ্যে।—বলিয়া ডান হাতটা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া আমার নাকের কাছে ধরিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ওসব তোমাদের মাস্টারী মাথায় আসবে না। সাত চাল ভেবে কাজ করে মনু চক্রবর্তী। তার একটা চালের তাৎপর্য বুঝতে তোমাদের মত রামা-শ্যামাদের আধ-কপালে ধ'রে যাবে।

দম লইয়া কহিল, চলি তা হ'লে, অনেক কাজ ; তোমার পাল্লায় প'ড়ে অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেল। মোদ্দা যেও কিন্তু। তারপর চোখ মটকাইয়া কহিল, সকলের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে না হয় লুকিয়ে ব'সে এক পাত খেয়ে আসবে এখন, কি বল ?—বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল।

বিকালে স্কুল হইতে ফিরিবার পর পত্নী কহিলেন, আজ পদ্ম এসে কান্নাকাটি করছিল।

কহিলাম, কেন ?

পত্নী কহিলেন, কি করবে ? ছেলে ঝগড়া করছে দিনরাত।

সবিস্ময়ে কহিলাম, কে? প্রকাশ?

স্ত্রী ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, হ্যাঁ।

কহিলাম, প্রকাশ তো ও রকম ছেলে নয়, ছেলে তো ভাল।

কিন্তু সরোজিনীর পাল্লায় পড়েছে কিনা।

মানে?

সেই যে দুদিন মূর্ছার সময়ে সরোজিনীকে দেখতে গিয়েছিল, তারপর থেকেই কেমন ওর মন বিগড়ে গেছে। মেয়েটা মন্ত্র-তন্ত্র কিছু জানে বোধ হয়, না হ'লে তোমার মত—

বাধা দিয়া প্রশ্ন করিলাম, প্রকাশ করছে কি?

দিন দুবেলা সরোজিনীর বাড়ি যাচ্ছে। পদ্ম কত মানা করেছে, দিব্বি দিয়েছে, গালাগালি দিয়েছে, পায়ে মাথা পর্যন্ত ঠুকেছে, কিছুতেই শুনছে না। আজ ওই নিয়ে মা-বেটায় ধুম ঝগড়া হয়ে গেছে।

কহিলাম, গেলেই বা, তাতে পদ্মর অত ঝগড়া করবার কি আছে?

তুমি বলবে বইকি; একই পথের পথিক কিনা! যাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসি, সে যদি অগ্রাহ্যি করে, তাতে মেয়েমানুষের যে কি হয়, তা তারাই বোঝে। তোমরা বুঝবে না। এই ধর, পদ্ম যখন তিনকড়ির বিয়েতে যেতে মানাই করেছে, তখন প্রকাশের যাবার দরকার কি?

কহিলাম, তা হ'লে তিনকড়ির বিয়েতে যাওয়ার জন্যেই আজকের ঝগড়া?

পত্নী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, হুঁ, তাই তো।

কহিলাম, পদ্মর ভারি অন্যায়। বন্ধুর বিয়েতে যোগ না দিয়ে কেউ পারে?

স্ত্রী ধমক দিয়া কহিলেন, বন্ধুর জন্যে নয়, একদিন চাঁদমুখ না দেখে থাকতে পারেন না, তাই।

সবিস্ময়ে কহিলাম, কার? সরোজিনীর?

পত্নী ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, না।

অধিকতর বিস্ময়ের সহিত কহিলাম, তবে কার? ফুটির?

পত্নী এবারও ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, না।

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া কোনমতে কহিলাম, তবে?

পত্নী মুচকি হাসিয়া কহিলেন, মিণ্টার।

আকাশ হইতে পড়িয়া কহিলাম, সত্যি?

পত্নী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, হ্যাঁ, সত্যি, বাউরীপাড়ার সবাই চোখে দেখেছে।

ওরা দেখবে কি ক'রে?

ওই দিকেই যে রোজ রাত্রে বেড়াতে যায় দুজনে। হাত-ধরাধরি ক'রে সাতঘেটে পুকুরের পাড়ে পাশাপাশি ব'সে থাকে; মিণ্টা নাকি আবার গান গায়।

কহিলাম, দূর, ওসব মিথ্যে গুজব।

পত্নী গম্ভীর হইয়া কহিলেন, মিথ্যে, না, সত্যি, পরে টের পাবে। হাত-ধরাধরি ক'রে বেড়িয়ে আর গা-ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে ব'সেই তো ওরা নিরস্ত হবে না, একটা কিছু অঘটন ঘটাবেই। তখন জানতে পারবে সবাই। চুপ করিয়া রহিলাম। পত্নী কহিতে লাগিলেন, পদ্ম সরোজিনীর পেছনে লেগেছিল ব'লেই বোধ হয় ও শোধ নিচ্ছে। কিন্তু কড়ুই-রাঁড়ীর একমাত্র ছেলেকে কেড়ে নিয়ে যে শোধ নিতে পারে, সে মেয়েমানুষ নয়, রাক্ষুসী।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, পদ্মর কান্না যদি আজ দেখতে তো চোখের জল রাখতে পারতে না। চুপ করিয়া থাকিয়া উচ্ছ্বসিত করুণার আলোড়ন কিঞ্চিৎ সামলাইয়া কহিলেন, বলছে, গাঁয়ে থাকবে

না, একে তো ঢেঁকি মেয়ে, সবাই যে মুখের সামনে ঠাট্টা-টিটকিরি করবে, তা ও সহ্য করতে পারবে না।

ওর আবার যাবার জায়গা কোথায়? শ্বশুরঘর তো দামোদরের গর্ভে।

পত্নী নাকী সুরে কহিলেন, ওর যে এক ভাশুর আছে, সোনামুখীর কাছে কোন্ এক গাঁয়ে এসে বাস করছে, সেইখানে থাকবে বলছে।

প্রকাশ মত দিয়েছে?

খুব। বলছে, যেখানে ইচ্ছে চ'লে যাও, আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তোমার। তাই তো পদ্মর দুঃখ, যে ছেলে আজ পর্যন্ত মায়ের আজ্ঞা ছাড়া জল পর্যন্ত খায় নি, এক পা কোথাও যেতে হ'লে মাকে জিজ্ঞাসা করত, মার কাছে ছাড়া আজ পর্যন্ত কোথাও শোয় নি, সেই ছেলের মুখে ওই কথা! জাদু না জানলে কেউ অমন ক'রে মন বিগড়ে দিতে পারে? তাই তো ভয় হচ্ছে, তুমি যে রকম—

বাধা দিয়া কহিলাম, বীরু আচায্যি জানে?

পত্নী ঠোঁট উল্টাইয়া কহিলেন, কে জানে! একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, ওরা তো মেয়ে-বেচা ঘর। প্রথম বার বিয়ে দিয়ে নগদ হাজার টাকা পেয়েছিল। তার ওপর বিধবা মেয়েকে ঘরে আটকে গয়না-গাঁটিগুলোও সব হাতিয়েছে। নগদ দাম পেলে আর একবার বিয়ে দিতে ওর আপত্তি কিসের?

কহিলাম, প্রকাশ হাজার টাকা দেবে? পনরো টাকা মাসে মাইনে পায়—

টাকা দেবে তোমার সরোজিনী। গাঙুলী বুড়োকে জব্দ করবার জন্যে দুশো টাকা যুদ্ধের চাঁদা দিলে, আর পদ্মকে জব্দ করবার জন্যে টাকা খরচ করবে না? তা ছাড়া নগদ টাকাই বা খরচ করতে হবে

কেন? বাড়ি-বন্ধকী দলিলটা যদি ফিরিয়ে দেয় তো বীরু আচায্যি শুধু বিধবা মেয়েটাকে কেন, আইবুড়ো ছোট মেয়েটাকে সুদ্ধু ফাউ ধ'রে দেবে।

সবিস্ময়ে কহিলাম, তুমি এত খবর জানলে কি ক'রে?

মুচকি হাসিয়া পত্নী কহিলেন, সব জানি। বাড়িতে আটক থাকলে কি হবে, বাইরে কোথায় কি হচ্ছে, কে কি করছে, সব খবর আমাদের কানে এসে পৌছয়।

কৃত্রিম ভয়ের সহিত কহিলাম, লোকের মনের খবরও টের পাও নাকি?

পত্নী খাড় নাড়িয়া সহাস্যে কহিল, হুঁ, সব টের পাই। বিশেষ ক'রে তোমার মনের খবর। যখনই কারও কথা ভাব, তখনই বুঝতে পারি। গম্ভীর হইয়া কহিলেন, তাড়াতাড়ি নাও, আমাকে একবার যেতে হবে।

প্রশ্ন করিলাম, কোথায়?

গোবিন্দ-ঠাকুরঝি এসে অনেক ক'রে ব'লে গেল, বর বেরোবার সময় একবার যেতে। রাত্রে আজ রান্না-টান্না করব না, তোমার তো নেমন্তন্ন আছে।

কহিলাম, থাকলেই বা, আমি গিয়ে বিয়ে দেখেই ফিরে আসব।

বিস্ময়ের সহিত পত্নী কহিলেন, কেন? হরেক রকমের খাবারের আয়োজন করেছে, খেয়ে আসবে না? গাঁয়ের সবাই খাবে।

দৃঢ়কণ্ঠে কহিলাম, না। আমি এত পেটুক নয় যে, যাকে সমাজ থেকে পতিত করা হয়েছে, তার বাড়িতে সামাজিকভাবে খেয়ে আসব।

গৃহিণী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন, সামাজিকভাবে খেতেই বুঝি দোষ, এমনই যখন-তখন খেতে দোষ নেই?

কহিলাম, না।

গৃহিণী ভ্রূ কুঁচকাইয়া কহিলেন, কিন্তু সরোজিনী কি ছেড়ে দেবে তোমাকে? এত ভালবাসা!

কহিলাম, ভালবাসা নয়, ভক্তি।

ঘাড় নাড়িয়া পত্নী কহিলেন, ভালবাসা গাঢ় হ'লেই ভক্তি। তা যাই হোক, ও যদি খেতে বলে?

বীরত্বব্যঞ্জক স্বরে কহিলাম, তা হ'লেও খাব না, স্পষ্ট ব'লে দোব, খাওয়া চলবে না।

পত্নী হাসিয়া কহিলেন, তা তুমি পারবে না। মুখ ফুটে বলা দূরে থাক্‌, সরোজিনী যদি ইশারায় একবার বলে তো শুধু খাওয়া কেন, এঁটো পাত চাটতে ব'সে যাবে তুমি।

সতেজে কহিলাম, পাগল হয়েছ নাকি? কি মনে করেছ তুমি? সরোজিনী পায়ে ধরলেও খাব না আমি।

পত্নী মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। কাজেই ভারী গলায় কহিলাম, ওসব বাজে কথা যাক, রাতের খাবার তৈরি ক'রে তবে যেখানে হোক যেও। মুড়ি-টুড়ি গিলতে পারব না আমি।

পত্নী আমার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, আজ্ঞে হুজুর, খাবার তৈরি করা হয়েছে, তুমি যে ওখানে খাবে না, তা আগেই জানতাম।

কি ক'রে জানলে?

সকালে মনু চক্রবর্তীকে বলছিলে, শুনেছিলাম যে।

সব কথা শুনেছিলে?

মৃদু হাস্য সহকারে ঘাড় নাড়িয়া পত্নী কহিলেন, হুঁ, সব কথা।

বিকালে গাঙ্গুলী মশায়ের বাড়িতে হাজির হইলাম। চিন্তিত

মুখে গালে হাত দিয়া বসিয়া ছিলেন। অবস্থাটা অনেকটা কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শেষভাগে দুর্যোধনের মত দেখাইল। আমাকে দেখিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। কাছে যাইতেই কহিলেন, মন্মথ চক্রবর্তীর ওখানে নেমন্তন্ন নেই ?

বসিয়া কহিলাম, আছে।

জিজ্ঞাসা করিলেন, যাবে না ?

কহিলাম, যাব একবার দেখতে, খাব না।

হুঁ।—বলিয়া গাঙ্গুলী মশায় প্রচণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, রাধানাথকে দেখছি না ?

ক্রুদ্ধকণ্ঠে গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, আসে নি দুদিন, কি মতলব কে জানে ! হয়তো ভেতরে ভেতরে—। বলিয়া চুপ করিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে কহিলেন, ওর ভগ্নীপতিটি ও-দলের মস্ত চাঁই কিনা। ও-ই নাকি বিয়ের পুরোহিত।

সান্ত্বনা দিয়া কহিলাম, না, ইচ্ছে থাকলেও চক্ষুলজ্জায় পারবে না। তা ছাড়া মাতুল মশায়টি তো এখনও ওর বাড়িতেই রয়েছে।

কিঞ্চিৎ উৎসাহিত হইয়া গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, সে কথা আর ব'লো না। এখান থেকে নড়তে চাইছে না। চব্য-চোষ্য আহার চলছে দুবেলা, দিন দুসের দুধ, সিকি তোলা আফিং। জমিদারির ভাগ বসাতে গিয়ে রাধানাথ বেশ ফ্যাসাদে পড়েছে।

কহিলাম, রাধানাথ স্পষ্ট ব'লে দিক না—আসল কাজই যখন হ'ল না, এবার স'রে পড়ুন।

তা বলতে পারছে কই ? লোভটা একেবারে ছাড়তে পারছে না কিনা। তা ছাড়া বুড়ো অনেক ধাপ্পা মেরেছে, বড় বড় জজ-ম্যাজিস্ট্রেট

ওর ছাত্র, ওর কথায় সব ওঠে বসে, তাই তাড়াতে সাহস করছে না, পাছে কোন ফ্যাসাদে ফেলে দেয়।

কহিলাম, প্রবোধ গাঙ্গুলীর ভাগনেকে আসবার জন্তে যে চিঠি লিখেছিলেন, তার কি হ'ল?

বিরক্তিতে সারা মুখ কুঁচকাইয়া গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, সে বেটা ম'রে গিয়েছে মাসখানেক আগে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, ভায়া, পড়তা যখন খারাপ চলে, তখন পাকা গুটিও কেঁচে যায়।

উঠিয়া দাঁড়াইতেই গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, ওখানেই যাচ্ছ নাকি?

কহিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, খেও-দেও না, কি দরকার গোলমালের মধ্যে গিয়ে? দেখে-শুনেই স'রে প'ড়ো, আর পাড়ার কে কে খেলে একটু নজর রেখো।

রাস্তায় ডাক্তারবাবুর সহিত দেখা হইল। বেশ সাজিয়া-গুজিয়া চলিয়াছেন, পরিধানে ধোপদুরস্ত ধুতি ও পাঞ্জাবি, পায়ে পাম্প-শু। সঙ্গ লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় চলেছেন মশায়?

ডাক্তারবাবু কহিলেন, এই যে! মন্থু চক্রবর্তীর বাড়ি; ওঁর মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন করেছেন কিনা।

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলাম, বলেন কি? মন্থু চক্রবর্তীর নিমন্ত্রণে চলেছেন? বন্ধুবিচ্ছেদ হবে না তো?

ডাক্তারবাবু ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, তার মানে? বন্ধু আবার কে? কেন, রাধানাথ?

ডাক্তারবাবু সক্ষোভে কহিলেন, দেখুন মাস্টার মশায়, আপনার কাছ থেকে এ কথা শুনব আশা করি নি। আমি বিদেশী, তার ওপর

ডাক্তার। আমার এখানে বন্ধুও কেউ নেই, শত্রুও কেউ নেই, আপনারা সকলেই আমার কাছে সমান।

কহিলাম, না না, এমনই ঠাট্টা ক'রে বলছিলাম।

ডাক্তারবাবু গম্ভীর মুখে বলিতে লাগিলেন, ঠাট্টাই করুন আর যাই করুন, ডাক্তারের পক্ষে এ বড় দুর্নাম। এই দেখুন না, মন্টুবাবুর বোনের মূর্ছার সময় নিজে যেতে পারলাম না, নিজের তখন হাড়ভাঙা ডেঙ্গুজ্বর, নড়তে-চড়তে পারি নি কদিন, তাতেই বিবেক রাতদিন মনের গায়ে দাঁত বসাচ্ছে।—বলিয়া মুখে এমনই ভাব প্রকাশ করিলেন, যেন এখনও বিবেক-দংশন চলিতেছে।

মন্টুর বাড়িতে পৌছিতেই, ডাক্তারবাবুকে দেখিয়া সকলে হৈ-হৈ করিয়া ছুটিয়া আসিল, প্রকাশ সর্বাগ্রে এবং তাহার পিছু পিছু মণীন্দ্র ও নিমন্ত্রিতদের অনেকে। যতই হোক, সরকারী চাকুরে তো। তা ছাড়া আজকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিই একমাত্র সরকারের প্রতিনিধি। মন্টু কহিল, এই যে, এসেছেন সময় ক'রে। ভাবলাম—

ডাক্তারবাবু বাধা দিয়া কহিলেন, বিলক্ষণ! আসব না? আপনার মেয়ে আর আমার মেয়ে কি আলাদা?

মণীন্দ্র গর্বে ও আত্মপ্রসাদে মুখ হাঁড়ি করিয়া সকলের দিকে তাকাইয়া নিজের পদমর্যাদা সমঝাইয়া দিতে লাগিল। প্রকাশ রাস্তা দেখাইয়া কহিল, আসুন। তাহার পিছু পিছু ডাক্তারবাবু চলিলেন। আমিও বিনাবাক্যব্যয়ে অনুসরণ করিলাম, কিন্তু মনটা খুঁতখুঁত করিতে লাগিল। একটা কথা বলিয়াও কেহ আপ্যায়িত করিল না। যাহার মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছি, সরকারী চাকুরের আওতায় পড়িয়া, তাহার কাছেও নগণ্য হইয়া গেলাম। নিজের লোক, আমাকে আপ্যায়ন করিবার আবশ্যক কি?—বলিয়া মনকে বুঝাইবার

চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে প্রবোধ না মানিয়া অভিমানী বালকের মত মুখ ভার করিয়া রহিল।

বৈঠকখানার বারান্দায় একটা চেয়ারের উপরে সকলে ধরাধরি করিয়া ডাক্তারবাবুকে বসাইয়া দিল। প্রকাশ একটা খোলা সিগারেটের টিন হইতে সিগারেট দিল। কে একটা ছেলে একটা থালায় করিয়া পান আনিয়া হাজির করিল। আমিও একটা পান তুলিয়া মুখে পুরিলাম, একটা সিগারেট চাহিয়া লইয়া ধরাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকের ব্যাপারটা দেখিতে লাগিলাম। বৈঠকখানার ভিতরে একটা শতরঞ্চির উপরে গালিচা পাতা, তাহার ঠিক মাঝখানে পিঠে তাকিয়া ও দুই পাশে মখমলের বালিশ লইয়া তিনু খাড়া হইয়া বসিয়া আছে, এবং তাহাকে ঘেরিয়া তাহার অনুচরবৃন্দ কেহ বসিয়া আছে, কেহ বা শুইয়া পড়িয়াছে। উঠানের দিকে তাকাইতেই দেখিতে পাইলাম, রাধানাথ ও গাঙ্গুলী ছাড়া পাড়ার আর কেহ আসিতে বাকি নাই, এবং প্রত্যেকে শুধু নিজে আসে নাই, পুত্রকন্যাসমেত আসিয়াছে, নেহাত নিমন্ত্রণ-পত্রে বিশদভাবে লেখা ছিল না বলিয়া, স্ত্রীটিকে লইয়া আসিতে পারে নাই। ছেলেমেয়েদের মধ্যে যাহারা বালক-বালিকা পর্যায়ে পড়ে, তাহারা উঠানে ছুটাছুটি মারামারি ও চেঁচামেচি করিতেছে; এবং যাহারা নেহাত শিশু, তাহারা কেহ পিতৃক্রোড়ে, কেহ বা মাটিতে বসিয়া কান্না শুরু করিয়াছে! মন্টু চক্রবর্তী উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছে, এবং তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া কতকগুলা লোক গভীর মনোযোগের সহিত বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছে। ভাল করিয়া কান পাতিয়া শুনিতে পাইলাম, মণ্টু দুই হাতের করতল প্রসারিত করিয়া বলিতেছে, মিষ্টি দশ রকম—বোঁদে, রসগোল্লা, পানতুয়া, মতিচুর, মিহিদানা, সীতাভোগ, মণ্ডা, জিলিপি, ক্ষীরমোহন, চমচম।

শ্রোতাদের মধ্য হইতে প্রশ্ন হইল, মিহিদানা কি খাস বর্ধমান থেকে আমদানি? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর হইল, হ্যাঁ গো। খাস বর্ধমানের, লোক পাঠিয়ে আনানো হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা! যার-তার বাড়ির কাজ নয়।

সকলে সমস্বরে সমর্থন করিল, সত্যি।

কে আবার প্রশ্ন করিল, পোলাওয়ে মাংস, না, মাছ দেওয়া হয়েছে?

মণীন্দ্র উত্তর দিল, মাংস। ইয়া বড় পাঁঠা কাটা হয়েছে।—বলিয়া দুই হাত দিয়া পাঁঠার দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা নির্দেশ করিয়া কহিল, আর এতবড় দাড়ি।—বলিয়া নিজের চিবুকের নীচে ডান হাত রাখিয়া দাড়ির দৈর্ঘ্য নির্দেশ করিল।

শ্রোতৃমণ্ডলী একসঙ্গে মুখ ভার করিয়া ছলছল নেত্রে বলিয়া উঠিল, দেড়েল পাঁঠা! মাংস যে বড় কড়া হয়ে যাবে, দাঁত বসানো যাবে না।

মন্নু চক্রবর্তী হাত নাড়িয়া অভয় দান করিল, কোন ভয় নেই। শহর থেকে দুখু চাটুজ্জেকে এনেছি। পাঁঠা কেন, হাতী সেদ্ধ ক'রে দেবে।

আবার কে প্রশ্ন করিল, মাছ নেই?

মণীন্দ্র মুখ উপর দিকে তুলিয়া ঠোঁট দুইটা ছুঁচলো করিয়া কহিল, প্রচুর। ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমা প্রসারিত করিয়া কহিল, দু মণ। আজিজ সাহেবের ফকির-বাঁধের বড় বড় মাছ, তারই কালিয়া তৈরি হয়েছে, নাক ডুবিয়ে খাবে সব।

হঠাৎ বাড়ির ভিতর হইতে বাহির হইল দোলগোবিন্দ, কি যেন চিবাইতেছে। মন্নুকে হাঁকিয়া কহিল, ফাষ্টো কেলাস হয়েছে বাবাজী। এমনটি কখনও কেউ খায় নি।

সকলে পিছন ফিরিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া সাগ্রহে কহিল, কি?

দোলগোবিন্দ কহিল, পোলাও, সবাই চাখতে বললে, ওস্তাদী মুখ জানে কিনা, মায় বউমা পর্যন্ত।

সকলে একসঙ্গে ঢোক গিলিয়া প্রশ্ন করিল, কেমন হয়েছে?

দোলগোবিন্দ দুই হাতের করতল চিত করিয়া দিয়া কহিল, চমৎকার! তারপর ডান হাত নাড়িয়া কহিল, জীবনে এমনটি কখনও খাও নি। নুন, ঝাল, মিষ্টি যেন নিক্তিতে তৌল ক'রে দিয়েছে, এক তিল এদিক-ওদিক হয় নি। আর গন্ধ যা বেরিয়েছে, তাতে অগ্নিমান্দ্য-রোগীরও পেটে আগুন জ্ব'লে উঠবে।

সকলে ঠোঁট চাটিতে শুরু করিল।

মন্নুর মাথায় হাত দিয়া দোলগোবিন্দ কহিল, বেঁচে থাক বাবা মন্নু। একটা কাজের মত কাজ করলে বটে।—বলিয়া কাশিতে শুরু করিতেই সকলে সন্ত্রস্তভাবে সরিয়া দাঁড়াইল। দোলগোবিন্দ কাশি শেষ করিয়া একদলা কফ মাটিতে ফেলিল।

হাঁকিয়া কহিলাম, দাদামশায়! এখানে এসে বসুন।

আমার দিকে চাহিয়া দোলগোবিন্দ কহিল, এই যে, ভায়া এসেছ? বেশ করেছ। কাছে আসিয়া কহিল, রেখো আর পরাণের যত দুষ্টু বুদ্ধি! কি করব গাঁয়ে দলাদলি ক'রে? সবাই আত্মীয়-স্বজন মিলে মিশে এক-সঙ্গে থাকাই তো ভাল। ডাক্তারবাবুর দিকে তাকাইয়া কহিল, কি বলেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু সিগারেট টানিতে টানিতে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন।

দোলগোবিন্দ একটা চেয়ারে উবু হইয়া বসিয়া কহিল, যা খাবার আয়োজন করেছে মন্নু, বড় বড় লোকের বাড়িতেও এমনটি হয় না। ডাক্তারবাবুর দিকে চাহিয়া কহিল, তা মন্নু সিগারেটেরও ব্যবস্থা করেছে

নাকি? বাকি কিছু রাখলে না দেখছি। প্রকাশকে ডাকিয়া কহিল, তোর হাতে ওটা কিসের টিন র‍্যা?

প্রকাশ কাছে আসিয়া কহিল, সিগারেট, নেবেন নাকি একটা?

দে, খেতে কি পারব? এখুনি কাশিয়ে মারবে।—বলিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া, মুঠা করিয়া ধরিয়া টানিতেই কাশিতে শুরু করিল।

১৯

একদিন পরে। রবিবার, সকালে বৈঠকখানায় বসিয়া ছিলাম; হঠাৎ সমস্বরে গোঙানির শব্দ শুনিতে পাইয়া বাহিরে আসিতেই দেখিলাম, কতকগুলা লোক একটা পালকি কাঁধে লইয়া আসিতেছে। কাজেই, যাহা গোঙানির শব্দ বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাহা প্রকৃতপক্ষে বেহারাদের চিরাচরিত ঐক্যধ্বনি। শব্দ শুনিয়া পত্নী ও ছেলেমেয়েরা ছুটিয়া আসিল। পালকিটা সামনে আসিতেই দেখিলাম, পালকির মধ্যে বরবেশী তিনকড়ি বসিয়া ও তাহার কোলের কাছেই লাল রঙের বেনারসী-পরা আবক্ষ-ঘোমটা-টানা ফুটি। পত্নী কহিলেন, কি ভাই তিনু, ফিরছ বউ নিয়ে?

তিনু আমাদের দিকে একবার তাকাইয়া লজ্জায় মুখ নত করিল।

পত্নী কহিলেন, বেশ মানিয়েছে ফুটিকে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, দেখলে কবে?

কাল সন্ধ্যাবেলায় গিছলাম যে, সরোজিনী ডেকে পাঠিয়েছিল অনেক ক'রে। কাল তোমাকে দেখলাম না ওখানে?

বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলাম, আমি রোজই ওখানে যাই নাকি?

তাই তো শুনি। কালই যাও নি, আগে থেকে জানতে পেরেছিলে বোধ হয়।

সন্ত্রস্তভাবে কহিলাম, তোমার দিব্যি বলছি, না।

পত্নী সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, অত দিব্যি-দিলেশা করছ কেন বল দেখি? ডুবে ডুবে জল-টল খাচ্ছ নাকি?

উল্টা প্যাঁচে আটকাইয়া গিয়া ঘাবড়াইয়া উঠিলাম, কহিলাম, পাগল হয়েছ নাকি? নিজের বোনের মত—

পত্নী পরিহাসের সুর পরিত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক কণ্ঠে কহিলেন, আমারও তাই মনে হ'ল কাল, তোমাকে নিজের দাদার মতই দেখে। কাল কত দুঃখু করছিল তুমি না খেয়ে, না দেখা ক'রে চ'লে এসেছ ব'লে।

কথাবার্তার আসল ধরনটা ঠিক ধরিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

পত্নী কহিলেন, খেলেই হ'ত। সবাই তো খেয়েছে শুনলাম। তোমার যত বাহাদুরি!

কহিলাম, তা কি হয়? সকলের সামনে প্রতিজ্ঞা ক'রে তা ভাঙব কি ক'রে?

যা ইচ্ছে কর বাপু। কিন্তু আমার তো মেয়েটাকে ভাল ব'লেই মনে হ'ল। আমাকে দেখে যেন কাল হাতে স্বর্গ পেল, কোথায় বসাবে, কি খাওয়াবে, তা নিয়ে অস্থির হয়ে উঠল।

তুমি খেলে বুঝি?

বাঃ রে! খাব না কেন? তুমি যখন-তখন খেয়ে আসছ, আমারই দোষ? তা ছাড়া ও যা অপরাধ করেছে, তার চেয়ে অনেক গুরুতর

অপরাধ পাড়ার অনেকে করেছে। বলতে গেলেই কথা বাড়ে, না হ'লে কারও অজানা কিছু নেই।

মন্নু চক্রবর্তীর গলা শোনা গেল, আছ নাকি হে?

পত্নী দ্রুতবেগে অন্দরের মধ্যে অন্তর্ধান করিলেন।

কহিলাম, আছি, এস।

মন্নু আসিয়া বসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া কহিল, যাক, বাঁচা গেল। কন্যাদায় থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল। এখন, ভিণ্টের একটা ব্যবস্থা হ'লেই, বাস্। তারপর বাকি ছেলেমেয়েগুলোর ব্যবস্থা ভিণ্টের ঘাড়ে।

কহিলাম, মেয়ে-জামাই গেল দেখলাম যে।

মুখ ও চোখ আনন্দে বিস্ফারিত করিয়া মন্নুদা কহিল, দেখলে? বেশ মানিয়েছে, নয়?

কহিলাম, হুঁ। তা তোমাদের সব বিয়ের গোলমাল মিটে গেল তো?

মুখ চিন্তাকুল করিয়া মন্নুদা কহিল, কোথায় আর মিটেছে! আসল গোলমালই তো বাকি। এস. ডি. ও. সাহেব, দারোগাবাবু, এঁদের সব খাওয়াতে হবে।

কবে?

আজই বিকেলে। পাঁচটার সময়ে সাহেব আসছেন।

কে কে খাবে?

এস. ডি. ও. সাহেব, দারোগাবাবু, আজিজ সাহেব আর তার ভাইপো, তুমি, আর—

কহিলাম, আমাকে আবার কেন?

লাফাইয়া উঠিয়া মণীন্দ্র ডান হাতের তর্জনী তুলিয়া নাড়িতে

নাড়িতে সতেজে কহিল, খবরদার মাস্টার! সেদিন ফাঁকি দিয়েছ। আজ না খেলে তোমার আর মুখদর্শন করব না, বলছি।

চুপ করিয়া রহিলাম।

মন্নুদা টেবিলে দুই হাত চাপড়াইয়া সামনে ঝুঁকিয়া, আমার মুখের কাছে মুখ আনিয়া মিনতির স্বরে কহিল, সত্যি, যেও, না হ'লে সরোজ রাগ করবে। সেদিন তো তুমি খাও নি শুনে প্রায় কেঁদেই ফেলেছিল। তোমাকে—

বাধা দিয়া কহিলাম, আচ্ছা যাব, তুমি ব'স। মণীন্দ্র বসিল। কহিলাম, আর কে কে বলছিলে?

চোখ মটকাইয়া মন্নুদা কহিল, আর তোমার গাঙ্গুলী মশায়, রাধানাথ।

সবিস্ময়ে কহিলাম, সত্যি?

ঘাড় নাড়িয়া মণীন্দ্র কহিল, গিয়ে দেখবে মাস্টার, মুসলমানের পাশে ব'সে তোমাদের বকধার্মিকরা পাঁঠার হাড় চুষছে।

বিকালে পাঁচটার সময়ে সরোজিনীর বাড়িতে হাজির হইলাম। দেখিলাম, হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে। মন্নু, প্রকাশ, তিন্নুর সাঙ্গোপাঙ্গ, ডান কব্জিতে হরিদ্রাবর্ণের সূতা-বাঁধা তিন্নু পর্যন্ত ছুটাছুটি করিতেছে। আমাকে দেখিয়া মন্নুদা কহিল, ভায়া এসেছ? সাহেব এসে গেছেন থানায়। ইউনিয়ন-বোর্ডের খাতাপত্র দেখছেন। কি রকম হয়েছে, দেখ দেখি।—বলিয়া আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া বৈঠকখানার ভিতরে লইয়া গেল। দেখিলাম, চেয়ার-টেবিল সরাইয়া দিয়া আসনের বদলে একটা শতরঞ্জি ভাঁজ করিয়া লম্বালম্বি পাতা হইয়াছে; তাহার সামনে প্রত্যেক নিমন্ত্রিতের জন্য এক-এক সেট করিয়া থালা, বাটি, গেলাস সাজানো রহিয়াছে।

কহিলাম, সাহেব আসনপিঁড়ি হয়ে ব'সে খেতে পারবেন ?

মন্টুদা কহিল, সাহেবই তো বললেন, টেবিল-চেয়ারে খাব না। আসনপিঁড়ি হয়ে ব'সে ডাল-ভাত খাওয়াতে পারেন তো যাব। তারপর আমার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, কেমন, ঠিক হয় নি ?

ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, ঠিক হইয়াছে।

মন্টুদা কহিল, গাঙ্গুলী বুড়ো আর রেখো—দুজনকেই সাহেব টেনে নিয়ে আসবেন। ওদের বদমায়েসি সব বলেছি কিনা।

কহিলাম, রাধানাথকে পাবেন কোথায় ?

কেন, থানায়। সেদিন পালিয়েছিল টাকা দেবার ভয়ে। শুনেছে, হাকিম চ'টে গেছেন তার ওপরে। আজ নিজে সেধে টাকা দিতে ছুটেছে। বাবা! জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে চালাকি চলে ? তা ভায়া, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করবার সময় নয় এখন। একবার থানায় যাই, তুমি বরং বাড়ির ভেতরে কতদূর কি হ'ল একবার দেখ গিয়ে।

বাড়ির ভিতরে ঢুকিতেই সরোজিনীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, তুই ছেড়ে দে মিণ্টা, পারবি না, কেন প্রকাশের সময় নষ্ট করছিস ?

আর একটি নারীকণ্ঠ, নিশ্চয়ই মিণ্টার, আবদারের সুরে কহিল, হ্যাঁ, ভারি তো! দেখে যান না। ওঁর চেয়ে ভাল হয়েছে।

একটি পুরুষ-কণ্ঠ মোটা সুরে কহিল, হ্যাঁ, সত্যি, মন্দ হয় নি। এই প্রথম চেষ্টা তো। দিন কয়েক অভ্যাস করলেই হাত ওতরাবে।

ভিতরে যাইয়া দেখিলাম, রান্নাঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া সরোজিনী, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, মুখে হাসি, আমাকে দেখিয়াই গম্ভীর হইয়া মুখ ফিরাইল। বুঝিলাম, অভিমান হইয়াছে। অভিমানের পশ্চাতে সুনিশ্চিত স্নেহের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া পুলকিত হইয়া উঠিলাম, অথচ প্রভাতের রৌদ্রঝলমল আকাশের মত হাস্যোজ্জ্বল মুখটি যে এক

মুহূর্তে অভিমানের মেঘে ম্লান হইয়া গেল, তাহার জন্ম মনে অনুশোচনাও হইল। কাজেই মুখে আবার হাসি ফুটাইবার জন্ম কহিলাম, তোমার আয়োজন সব শেষ হ'ল ?

মুখ ফিরাইয়া কৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত সরোজিনী কহিল, ওমা! আপনি! আমি বলি কে আবার—! আপনি যে আমার বাড়িতে পা দেবেন, তা আশা করি নি।

কহিলাম, সেদিন শরীরটা খারাপ ছিল, সকালেই মন্নুদাকে তো—

বাধা দিয়া ডাগর চোখ দুইটি আরও ডাগর করিয়া সরোজিনী কহিল, আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে গেলে শরীরটা আপনার আরও খারাপ হয়ে যেত ? কণ্ঠে অশ্রুর আভাস লাগিল।

ব্যস্ত হইয়া কহিলাম, তা নয়, তুমি ব্যস্ত ছিলে, ভাবলাম, মিছিমিছি এ সময়ে—

মাথায় ঝাঁকানি দিয়া অশ্রুজড়িত কণ্ঠে সরোজিনী কহিল, হয়েছে। বোনের ওপর ভাইয়ের দরদ! বোনই কেবল ভাইয়ের জন্যে মরে।

কৃতার্থ হইলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, মন্নুদা আমাকে সঙ্গে লইয়া শহরে যাইবার কথা বলায় সরোজিনী নাকি একদিন বলিয়াছিল, যাকে-তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার দরকার নেই। মনটা দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই বুঝাইলাম, ঝুটা-আসল বিচার না করিয়া, যাহা জুটিতেছে, তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাক। কোন হরিণ-নয়নার নয়ন হইতে তোমার জন্ম খাঁটি অশ্রু ঝরিবে, এমন ভাগ্য করিয়া দুনিয়াতে আসিয়াছ নাকি ?

মুখ বাড়াইয়া কহিলাম, প্রকাশ, কি করছিস রে ?

জবাব দিল সরোজিনী, রান্না করছে।

সবিস্ময়ে কহিলাম, তাই নাকি ! প্রকাশকে উদ্দেশ করিয়া কহিলাম, এসব বিদ্যে শিখেছিস নাকি ?

প্রকাশ কহিল, হ্যাঁ, কলকাতায় শিখেছিলাম। যে ডাক্তারবাবুর কাছে থাকতাম, তিনি সব রকম মাংস-রান্না খুব ভাল জানতেন।

সরোজিনী প্রশংসার সুরে কহিল, সত্যি, ভারি চমৎকার তৈরি করছে, দাদা চেখে দেখে খুব প্রশংসা করলে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, মিণ্টা কি করছে তবে ?

সরোজিনী কহিল, মেয়েমানুষ যা করে, পুরুষের কাজে বিঘ্ন করছে।

মিণ্টা কহিল, তা বইকি ! দেখুন না কেমন করেছি, প্রকাশদাদার চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে।

কাছে গিয়া দেখিলাম, ভোলা উনুনের সামনে উবু হইয়া বসিয়া মিণ্টা মাংসের কাট্‌লেট ভাজিতেছে, প্রকাশ পাশে দাঁড়াইয়া পর্যবেক্ষণ করিতেছে। মিণ্টাকে অনেকদিন পরে ভাল করিয়া দেখিলাম, রঙ ধবধবে ফরসা নয়, কিন্তু শ্যামবর্ণ বলিতেও মন চাহে না, মুখের ও চোখের গঠন চমৎকার, সর্বাঙ্গ ভরিয়া যৌবনের প্রাচুর্য ; আগুনের আঁচে মুখখানি লাল হইয়া উঠিয়াছে ; সামনের রুক্ষ চুলগুলি স্বেদসিক্ত।

পদ্ম যাওয়ার পর হইতে প্রকাশ তাহা হইলে সরোজিনীর বাড়িতেই আড্ডা গাড়িয়াছে ! মিণ্টা তো শুনিয়াছি সারাদিন এইখানেই কাটায় এবং বিবাহ উপলক্ষ্যে বোধ হয় রাত্রিটাও এইখানেই কাটাইতেছে। কাজেই অবিরত ও অব্যাহত সাহচর্যের ফলে তাহাদের মধ্যে প্রণয়-সূত্রটি দিন দিন মোটা ও মজবুত হইয়া উঠিতেছে। সরোজিনীর যে এ ব্যাপারে সম্মতি ও সাহায্য দুই-ই আছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ রহিল না। কিন্তু কাজটি সরোজিনী ভাল করিতেছে না। শহরে লোকারণ্যের মধ্যে যাহাই হউক, পল্লীসমাজে এই অসামাজিক প্রেম কোনমতে আশ্রয়

পাইবে না। বিরোধ চারিদিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে, কুৎসা কালি ছিটাইতে থাকিবে, কলহ ও কোলাহলের অন্ত থাকিবে না, এবং শিক্ষিত-করা নব্বইজন বাঙালী যুবকের মত প্রকাশ যদি শেষ মুহূর্তে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে, তাহা হইলে মিণ্টাকে প্রাণ কিংবা মান দিয়া এই প্রেমের দাম চুকাইতে হইবে।

মোটরের শব্দ শুনিতে পাইয়া বাহিরে আসিলাম। অবিলম্বে মোটর আসিয়া পৌঁছিল। এস ডি. ও. সাহেব, মণীন্দ্র, আজিজ সাহেব ও তদীয় গুণধর ভ্রাতুষ্পুত্রটি একে একে গাড়ি হইতে নামিল। ভ্রাতুষ্পুত্রের পোশাক-পরিচ্ছদ পূর্ববৎ, মুখে পূর্ববৎ দুরন্ত ও দুর্বিনীত ভাব; আমাকে দেখিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইল। সকলকে আদর-আপ্যায়ন করিয়া বারান্দায় চেয়ারে বসানো হইল। কিছুক্ষণ পরে দারোগাবাবু, রাধানাথ ও গাঙুলী মশায় হাঁটিয়া আসিলেন। গাঙুলী মশায় ও রাধানাথ দুইজনেরই মুখ শুষ্ক ও চিন্তাকুল।

মণীন্দ্র যুক্ত হস্তে নিবেদন করিল, সব প্রস্তুত, দয়া ক'রে হাত-মুখ ধুয়ে বসলেই হয়।

সকলে সোৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শুধু গাঙুলী মশায় গালে এবং রাধানাথ পেটে হাত বুলাইতে বুলাইতে বসিয়া রহিল। দারোগা-বাবু তাহাদের দিকে তাকাইয়া সোৎসুক কণ্ঠে কহিলেন, কি হ'ল আপনাদের?

গাঙুলী মশায় যন্ত্রণা-কুঞ্চিত মুখে কহিলেন, দাঁতের বেদনা—সেই যে একবার হয়েছিল।

রাধানাথ মুখে যথাসাধ্য যন্ত্রণার ভাব ফুটাইয়া কহিল, পেটটা মোচড় দিচ্ছে, কাল থেকে পেটের অসুখ, প্রায়ই হয় কিনা এমন—আজ বার্লি খেয়ে আছি।

এস. ডি. ও. সাহেব তোয়ালে দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, কি হ'ল এঁদের ?

দারোগাবাবু মুচকি হাসিয়া কহিলেন, অসুখ হয়েছে বলছেন, এক-জনের দাঁতের আর একজনের পেটের, খাবেন না।

মণীন্দ্র কহিল, ওসব ভান, হুজুর।

গাঙ্গুলী মশায় ও রাধানাথ সমস্বরে কহিল, ভান নয় হুজুর, সত্যি ; বাড়িতে জিজ্ঞেস ক'রে পাঠান।

এস. ডি. ও. সাহেব গম্ভীর মুখে কহিলেন, বেশ, রেহাই দিচ্ছি ; কিন্তু আরও একশো টাকা ক'রে যুদ্ধে চাঁদা দিতে হবে আপনাদের। দিতে পারেন তো বাড়ি গিয়ে এনে দিন।

দাঁত ও পেটের যন্ত্রণা ভুলিয়া দুইজনে হাতজোড় করিয়া বলিয়া উঠিল, না হুজুর, যা দিয়েছি, তার বেশি এক পয়সা দিতে পারব না।

এস. ডি. ও. সাহেব গম্ভীর মুখে কহিলেন, তা হ'লে খেতে হবে। —বলিয়া একেবারে চূড়ান্ত রায় প্রকাশ করিয়া বৈঠকখানার ভিতরে ঢুকিলেন, তাঁহার পিছু পিছু ঢুকিল আজিজ সাহেব ও তস্য ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সর্বশেষে ঢুকিলেন গাঙ্গুলী মশায় ও রাধানাথ ফাঁসির আসামীর মত মুখ করিয়া। দারোগাবাবু তখনও মুখ-হাত ধুইতে লাগিলেন।

আজিজ সাহেব ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র এক পাশে বসিল, তাহাদের পাশেই বসিলেন এস. ডি. ও. সাহেব, একখানা আসন বাদ দিয়া গাঙ্গুলী মশায় ও রাধানাথ পর পর বসিল। মন্নুদা আমাকে ডাকিয়া কহিল, মাস্টার, তুমিও ব'সে যাও না এই সঙ্গে। লবণ ও লেবুর থালাটা তুলিয়া লইয়া কহিলাম, পরে খাব এখন।

মন্নুদা গর্জিয়া উঠিল, পরে আবার কেন ? এখন কি হ'ল ?

ত্রস্তভাবে কহিলাম, পাগল নাকি! একসঙ্গে সবাই বসলে চলে? —বলিয়া চোখের ইঙ্গিত করিলাম।

মণীন্দ্র শান্ত হইয়া কহিল, আচ্ছা, একসঙ্গে খাব দুজনে।

ইতিমধ্যে দারোগাবাবু মুখ-হাত ধুইয়া আসিয়া এস. ডি. ও. সাহেব ও গাঙুলী মশায়ের মাঝখানের আসনটিতে বসিয়া আচারনিষ্ঠ ও আচারভ্রষ্ট দুই শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিলেন। প্রকাশ, তিমু ও তাহার দলবল খাদ্যদ্রব্য বহন ও পরিবেশন করিতে লাগিল। মণীন্দ্র জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি মুরুব্বিয়ানা করিতে লাগিলাম, এবং রাধানাথ ক্ষণে ক্ষণে আমার দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে কাশিতে কাশিতে দোলগোবিন্দ আসিয়া হাজির হইল। আমার দিকে তাকাইয়া কহিল, কি ব্যাপার আজ? মোটর দেখলাম—

কাছে গিয়া চাপা গলায় কহিলাম, এস. ডি. ও. এসেছেন, খাচ্ছেন ওখানে।

দোলগোবিন্দ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, তাই নাকি! হুজুর খেতে এসেছেন! মন্থু আচ্ছা কাণ্ড করলে যা হোক। আর কে কে?

কহিলাম, গিয়ে দেখুন না।

দোলগোবিন্দ উঠিয়া গিয়া গলবস্ত্র হইয়া দরজার সামনে দাঁড়াইয়া যুক্তহস্তে ভক্তি-গদগদ স্বরে কহিল, হুজুর, নমস্কার।

এস. ডি. ও. সাহেব খাইতে খাইতেই প্রতি-নমস্কার করিলেন।

তারপর গাঙুলী মশায় ও রাধানাথের দিকে তাকাইয়া দোলগোবিন্দ দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া কহিল, বাবাজীরাও ব'সে গেছ দেখছি।

তিমু কাছে গিয়া ফিসফিস করিয়া কহিল, ওখানে দেখুন গিয়ে।—বলিয়া জানালার দিকে মুখের ইশারা করিল।

দোলগোবিন্দ জানালার কাছে আসিয়া দেখিয়া কহিল, আঁ্যা, ভাই-সাহেবরা পর্যন্ত! দাঁড়াও, একবার আসি ভাই।—বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

তারপর পাড়ার প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরা একে একে আসিয়া হাজির হইতে লাগিল। প্রত্যেকে এস ডি. ও. সাহেবকে নমস্কার জানাইয়া, একবার ভোজনরত গাঙ্গুলী মশায় ও রাধানাথকে এবং জানালার কাছে গিয়া আজিজ সাহেব ও তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখিয়া লইয়া প্রস্থান করিতে লাগিল। রাধানাথকে ও গাঙ্গুলী মশায়কে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, তাঁহারা যেন কণ্টকাসনে বসিয়া তপ্ত অঙ্গার চিবাইতেছেন।

আহারাদি শেষ হইলে এস. ডি. ও. সাহেব মণীন্দ্রকে কহিলেন, যাঁর এত খেলাম, তাঁকে একবার ধন্যবাদ না জানিয়ে বিদায় নিলে নেমক-হারামি হবে। মন্টুবাবু, একবার খবর দিন মিসেস গাঙ্গুলীকে।

মণীন্দ্র কহিল, আজ্ঞে, এখুনি ডেকে আনছি।

অচিরে দরজার সামনে শ্রীমতী গাঙ্গুলীর আবির্ভাব ঘটিল, ইতিমধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া বিধি-সঙ্গত সাজসজ্জা করিয়াছে, মাথায় স্বল্প অবগুণ্ঠন। এস. ডি. ও. সাহেবের আজ আর হাফ-প্যাণ্টের হাঙ্গামা ছিল না। ভদ্র বাঙালীর বেশ—ধুতি, পাঞ্জাবি, পায়ে পেটেণ্ট লেদারের লপেটা। নমস্কার করিয়া কহিলেন, খুব খাইয়েছেন, ধন্যবাদ।

সরোজিনী লজ্জিত হাস্যে মুখখানি অপরূপ করিয়া তুলিল। সত্তর সাহেবের দুই চোখে ক্ষুধার্ত নেকড়ের দৃষ্টি জ্বলিয়া উঠিল। আজিজ সাহেব হাসিল, কিন্তু দাড়ির সুনিবিড় মেঘ ভেদ করিয়া সে হাসি বাহিরে ফুটিল না। দারোগাবাবু ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া হাত

কচলাইতে লাগিলেন। রাধানাথ ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে আকাশের দিকে এবং গাঙুলী মশায় চিন্তাব্যাকুল মুখে ভূপৃষ্ঠের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

এস. ডি. ও. সাহেব কহিলেন, আপনার কথা আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পত্নী শ্রীমতী মিত্রকে বলেছি। তিনি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান। তা ছাড়া আরও অনেকে চান। চলুন না একদিন ওখানে।

সরোজিনী বাম পায়ের বুড়া আঙুল দিয়া মাটি খুঁটিতে খুঁটিতে নত মস্তকে কহিল, যাব একদিন, কাজও একটু আছে। গেলে আপনাদের শ্রীমতীদের সঙ্গে নিশ্চয় দেখা ক'রে আসব।—বলিয়া একবার মুখ তুলিয়া পর-মুহূর্তেই নামাইল।

এস. ডি. ও. সাহেব বিদায় লইলে একে একে সকলে বিদায় লইলেন, গাঙুলী মশায় ও রাধানাথ সর্বাগ্রে, তারপর দারোগাবাবু, তারপর আজিজ সাহেব ও সত্তর সাহেব। আমি ও মণীন্দ্র বাড়ির ভিতরে ঢুকিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে সত্তর সাহেব আবার ফিরিয়া আসিল।

মণীন্দ্র আগাইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিছু ফেলে গেছেন নাকি?

ঘাড় নাড়িয়া সত্তর কহিল, না, একটু দরকার আছে এখানে।—বলিয়া আমার দিকে তাকাইতেই, আমি মুখ ফিরাইয়া লইয়া অন্যমনস্কতার ভান করিলাম।

মণীন্দ্র ব্যস্ত হইয়া কহিল, কি দরকার, বলুন?

সত্তর কহিল, আপনার বোনকে একবার ডেকে দিন দেখি।

মণীন্দ্র ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, কেন? তার সঙ্গে আপনার—মানে, সে তো—

সত্তর ধমকের সুরে কহিল, জরুরী দরকার আছে। শিগগির ডেকে দিন। সন্ধ্যে হয়ে আসছে।

মণীন্দ্র ভয়ে ভয়ে কহিল, কি দরকার শুনতে পারি না?

সত্তর কহিল, খুব পারেন, একটা উপহার দিতে চাই।

মণীন্দ্র একবার আমার দিকে তাকাইল, তারপর তাহার দিকে তাকাইয়া আমতা আমতা করিয়া কহিল, উপহার! তাকে?

সত্তর ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, যে মেয়েটির বিয়ে হ'ল তাকে।

বিস্ময় ও আনন্দে চোখ ও মুখ বিস্ফারিত করিয়া মণীন্দ্র কহিল, ওঃ, ফুটিকে। তাই বলুন।

দক্ষিণ করতল প্রসারিত করিয়া কহিল, তা দিয়ে যান আমাকে, আমারই তো মেয়ে।

এবার সত্তর সাহেব ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, আপনার মেয়ে নাকি? তবে যে—

মন্টু কহিল, এ বাড়িতে বিয়ে হ'ল, এই তো? আমার বোনই আমার মেয়ের বিয়ে দিলে কিনা।

সত্তর কহিল, ওঃ, তাই। আমি ভেবেছিলাম—

ভেবেছিলেন, আমার বোনের মেয়ে। ঠিকই ভেবেছিলেন। আমার মেয়েকে আমার বোন মেয়ের মতই ভালবাসে। তা আপনার যা দেবার আছে দিয়ে ফেলুন, দেরি ক'রে লাভ কি? ওদিকে সন্ধ্যে হয়ে আসছে।

সত্তর সাহেব পকেটে হাত ঢুকাইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

মণীন্দ্র কহিল, আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? ভাবছেন মেরে দোব, মেয়েকে দোব না। বেশ। ওই তো মাস্টার রয়েছে, ও তো সাক্ষী থাকছে। তা ছাড়া, বাপ হয়ে মেয়ের জিনিস কেউ মেরে দিতে পারে মশায়?

এই সময়ে তিনু বাড়ির ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহাকে ডাক দিয়া মণীন্দ্র কহিল, এস তো বাবা তিনু একবার এখানে। তিনু কাছে যাইতেই মণীন্দ্র কহিল, একে দিন।

সত্তর ঘাড় নাড়িয়া দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, ওকে দোব না।

মণীন্দ্র দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিল, ওকেও দেবেন না? ও যে আমার জামাই, ওই দেখুন, ডান হাতে হলদে সুতো বাঁধা রয়েছে।

সত্তর সাহেব অগত্যা পকেট হইতে একটি নীল রঙের ছোট বাক্স বাহির করিয়া তিনুর হাতে দিয়া কহিলেন, আংটি, দেবেন আপনার বউকে আমার নাম ক'রে।—বলিয়া পিছন ফিরিয়া গটগট করিয়া বাহির হইয়া গেল।

মণীন্দ্র বাক্সটি তিনুর হাত হইতে লইয়া খুলিয়া আংটিটি বাহির করিয়া, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া কহিল, সোনার ভাল জিনিস, ফুটির আঙুলে বড় হবে ব'লে মনে হচ্ছে, তা তুমিই প'রো বাবাজী।

২০

সেদিন ভোরে জানালার বাহির হইতে ডাক শুনিয়া, জাগিয়া উঠিয়া দেখিলাম, প্রকাশ জানালার সামনে দাঁড়াইয়া আছে।

বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, প্রকাশ! এমন সময়ে ডাকছিস?

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রকাশ কহিল, একবার আসুন, একটু দরকার আছে। বৈঠকখানার দরজা খুলিতেই প্রকাশ ঘরে ঢুকিয়া একটা চেয়ারে বসিল। আমিও আর একটা চেয়ারে বসিয়া বার দুই হাই তুলিয়া কহিলাম, কি ব্যাপার বল্ দেখি?

প্রকাশ চিন্তাকুল মুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, মিণ্টাকে ধ'রে নিয়ে গেছে ।

বিস্ময়বিহ্বল কণ্ঠে কহিলাম, সে কি ! কে ?

প্রকাশ জবাব দিল, কে নিয়ে গেছে জানি না, তবে কোথায় নিয়ে গেছে, কোথায় রেখেছে, সব দেখে এসেছি ।

কি ক'রে দেখলি ?

আমিও পিছু পিছু গিয়েছিলাম ।

তুই জানতে পারলি কি ক'রে ?

প্রকাশ জবাব দিল না, বুঝিলাম, জবাব দেওয়ার পক্ষে বাধা আছে।

প্রশ্ন করিলাম, কোথায় নিয়ে গেছে ?

প্রকাশ উত্তর করিল, চপাই ।

কহিলাম, সে তো মুসলমানের গাঁ, কোথায় রেখেছে তা হ'লে ? কোন মুসলমানের বাড়িতে নাকি ?

প্রকাশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না ! মুসলমান-পাড়ার ঠিক বাইরেই এক ঘর বেনে আছে, তার বাড়ির পাশেই একটা খামার-বাড়িতে।

ব্যাপারটা কতকটা বুঝিতে পারিলাম। সত্তরের কাজ। সরোজকে চুরি করিতে আসিয়া ভুল করিয়া মিণ্টাকে লইয়া গিয়াছে।

গম্ভীর হইয়া কহিলাম, দেখ্ প্রকাশ, আমাকে সব কথা খুলে বল্। কিছু গোপন করিস নি। আমি যে তোর মামার বন্ধু, সে কথা ভুলে গিয়ে মনে কর্, আমি তোর একজন বন্ধু। সব কথা জানতে পারলে একটা কিছু ব্যবস্থা করতে পারব ব'লে মনে হয়।

প্রকাশ মাথা নীচু করিয়া ভাবিতে লাগিল।

কহিলাম, ভাববার কিছু নেই, দ্বিধা করবারও কিছু নেই। আগাগোড়া সব কথা আমাকে বুঝিয়ে বল্।

প্রকাশ শুষ্ক মুখে কহিল, কি বলব বুঝতে পারছি না।

কোমল কণ্ঠে কহিলাম, বুঝতে পারছিস না? আচ্ছা, আমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তুই এক-একটা ক'রে জবাব দে। আচ্ছা, তোর সঙ্গে মিণ্টার কি সম্পর্ক?

প্রকাশ নীরব রহিল।

কহিলাম, চুপ ক'রে সময় নষ্ট করিস নি প্রকাশ। এর ওপর সব নির্ভর করছে।

লজ্জিত মুখে প্রকাশ কহিল, মিণ্টাকে ভালবাসি।

প্রশ্ন করিলাম, মিণ্টাও কি তোকে ভালবাসে?

হ্যাঁ।

এই ভালবাসা-বাসির পরিণাম জানিস তো?

জানি। আত্মীয়-স্বজন সবাই আমাকে ত্যাগ করবে, সমাজে আমার স্থান হবে না, হয়তো এ দেশ ছেড়ে আমাদের চ'লে যেতে হবে।

তা হ'লে?

প্রকাশ দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, তা হ'লেও আমি মিণ্টাকে বিয়ে করব। আত্মীয় স্বজন সমাজ আমার চাই না। আমি ওকে নিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে বাস করব। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, মাসীমা আমাদের সাহায্য করবেন বলেছেন।

ঔৎসুক্যের সহিত কহিলাম, মাসীমা—মানে, সরোজিনী?

প্রকাশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হ্যাঁ।

প্রশ্ন করিলাম, পদ্মর যাওয়ার পর থেকেই তুই সরোজিনীর ওখানে খাচ্ছিস আছিস তো?

প্রকাশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হ্যাঁ।

শোওয়া হয় কোথায়?

ওঁদের বৈঠকখানায়।

মিণ্টার সঙ্গে কাল তোর কখন শেষ দেখা হয়?

প্রকাশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, রাত দুটোর সময়ে।

সবিস্ময়ে কহিলাম, রাত দুটোয় দেখা হ'ল কি ক'রে? ওদের বাড়িতে রাত্রে খাওয়া-দাওয়া শেষ হয় কখন?

দশটার সময়। রাত্রি এগারোটার মধ্যে সবাই শুয়ে পড়ে। ফুটির বিয়ের আগের দিন থেকেই মিণ্টা রাত্রে মাসীমার কাছেই শুচ্ছিল। মুখ নীচু করিয়া লজ্জা-জড়িত স্বরে কহিল, মাসীমা ঘুমোলে আমার কাছে আসত।

সবিস্ময়ে কহিলাম, রোজ?

মাথা নামাইয়া রাখিয়াই ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' জানাইল।

কহিলাম, তুই কি মিণ্টার ওপরে কোন অনধিকার-চর্চা, মানে—

প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া প্রকাশ কহিল, আজ্ঞে না, আমরা গল্প করতাম, ভবিষ্যতের সম্বন্ধে পরামর্শ করতাম।

কহিলাম, কাল দুটোর সময়ে মিণ্টা তোর কাছ থেকে যায়, তারপর?

আমি বৈঠকখানার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। ও যেমনই দরজার কাছে গেছে, অমনই জন চারেক লোক এসে ওকে জড়িয়ে ধরলে। ও চীৎকার করবার চেষ্টা করতেই একটা লোক ওর মুখে গামছা গুঁজে দিয়ে মুখ-চোখ বেঁধে দিলে।

তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকলি তো?

প্রকাশ লজ্জিতভাবে কহিল, কি করব? চার-পাঁচজন লোক, হাতে লাঠি; একা তাদের সঙ্গে পারব না বুঝতে পারলাম। তাই থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে সব দেখতে লাগলাম।

তারপর কি হ'ল ?

তারপর ওকে কাঁধে ক'রে যেখানে তিহুরা কুস্তির আখড়া করেছে, সেইখানে নিয়ে গেল। সেখানে একটা পালকি নামানো ছিল। তাতে ওকে চাপিয়ে পালকির দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে ওরা পালকিটা কাঁধে ক'রে ব'য়ে নিয়ে চলল। আমি কতকটা দূরে থেকে পেছনে পেছনে যেতে লাগলাম।

তারপর ?

তারপর, মাঠের আল-পথ দিয়ে ওরা পালকি নিয়ে চলল। আমিও পিছু পিছু চললাম। তারপর যখন চপাইয়ে পৌঁছুলাম, রাত তখন প্রায় তিনটে। গাঁয়ের বাইরে দিয়ে তারা চলল। শেষে আজিজ সাহেবের বাড়ির কাছে এসে ওরা থামল।

পরম বিস্ময়ের সহিত কহিলাম, আজিজ সাহেবের এই কাণ্ড নাকি ?

ঘাড় নাড়িয়া প্রকাশ কহিল, আজ্ঞে না, আমিও প্রথমটা তাই ভেবেছিলাম বটে। ওদের মধ্যে একজন গলা-খাঁকারি দিতেই আজিজ সাহেবের বাড়ি থেকে ওর ভাইপো বেরিয়ে এল; এসে বললে, এনেছিস ? ঠিক মাল তো ? একজন জবাব দিলে, আলবৎ ঠিক। রমজান নিজে বাড়ি দেখিয়ে দিয়েছে। আর একজন লোক, বোধ হয় রমজান, বললে, হ্যাঁ, কিছু ভুল হয় নি। আপনি কাল দেখে নেবেন নিজের চোখে। সত্তর একটা চাবির গোছা রমজানের হাতে দিয়ে বললে, নিয়ে যা। বৈঠকখানার কুঠরিতে চাবি দিয়ে রেখে দিবি, তাড়াতাড়ি যা, সকাল হয়ে আসছে। খুব সাবধানে যাবি, যেন কেউ জানতে না পারে। বেনেবুড়ীর হাতে চাবিটা দিবি, আর ভাল ক'রে সমঝিয়ে দিবি, যেন ভাল ক'রে খাওয়ায়-দাওয়ায়, আর সাবধানে যাওয়া-আসা করে। ব'লে দিবি, যদি ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে পারে তো, ওর সর্বনাশ করব।

তারপর ?

ওরা সন্তরের খামার-বাড়ি সামনে পালকিটা নামাল। ওই বাড়িটার ধারে-কাছে বেনে-বুড়ীর কুড়েঘরটা ছাড়া আর কোন বাড়ি-ঘর নেই, কাজেই ওখানে চেঁচালেও কেউ শুনতে পাবে না। তারপর ওরা মিণ্টাকে বের করলে। তখনও বোধ হয় মিণ্টার ভাল ক'রে চেতনা হয় নি। মিণ্টাকে কাঁধে ক'রে ওরা খামার-বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল। ওরা ঘর বন্ধ ক'রে চ'লে যাবার পর, আমি চ'লে এলাম।

দুইজনেই চিন্তামগ্ন হইয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে কহিলাম, প্রকাশ, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, বেশ ভেবে-চিন্তে জবাব দে।

প্রকাশ ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, বলুন।

কহিলাম, যদি ওরা মিণ্টার ওপর কোন অত্যাচার করে, তা হ'লেও তুই মিণ্টাকে বিয়ে করবি তো ? না, তখন স'রে দাঁড়াবি ?

প্রকাশ দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, মিণ্টার ওপর সহজে অত্যাচার করতে পারবে না। ভারি শক্ত আর সাহসী মেয়ে ও। তবে জোর-জবরদস্তি ক'রে যদি কোন অত্যাচার করে, তা হ'লেও আমি ওকে ত্যাগ করব না।

ভাবের বশে বলছিস, না, ভেবে বলছিস ?

প্রকাশ কহিল, ভেবেই বলছি মামা। তখন থেকে এই কথাই ভাবছি। ভেবে দেখেছি, তার কোন অপরাধ নেই। অপরাধ আমার। আমি তাকে রক্ষা করতে পারলাম না কেন ? তাকে রক্ষা করবার জন্যে প্রাণ দিতে পারলাম না কেন ?

কহিলাম, প্রকাশ, শুধু তোর অপরাধ নয়, আমাদের সমস্ত বাঙালী হিন্দুর অপরাধ। আমরা দিন দিন দুর্বল কাপুরুষ হয়ে যাচ্ছি। চোখের

সামনে মা বোন স্ত্রীর ওপর অত্যাচার দেখলেও আমাদের রক্ত গরম হয় না, আমাদের মস্তিষ্ক ও মেজাজ বেগড়ায় না, আইন-কানুন বাঁচিয়ে, উচিত-অনুচিত বিচার ক'রে কাজ করবার ক্ষমতা হারাই না। আমরা সভ্যতা পেয়েছি, কিন্তু পৌরুষ হারিয়েছি। ভাবালুতা সংবরণ করিয়া কহিলাম, সরোজিনী জানতে পেরেছে ?

প্রকাশ কহিল, বোধ হয়, না। সকালে জানতে পারবেন নিশ্চয়ই।

কহিলাম, সকালে তো সবাই জানতে পারবে। যাক, তুই আর কোথাও যাস নি, এখানেই এখন ঘুমোবি তো ঘুমো। সকালে খেয়ে-দেয়ে সোজা ডাক্তারখানায় চ'লে যাবি, ওদিকে তোর যাবার দরকার নেই। যা করবার, যা বলবার সব ভার আমার ওপরে ছেড়ে দে। কিন্তু আর একবার মিণ্টার সম্বন্ধে সেই কথাটা শুনে নিতে চাই।

প্রকাশ আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

কহিলাম, মিণ্টার প্রতি তোর কর্তব্য করতে তুই কোন অবস্থাতেই পেছপা হবি না তো ?

প্রকাশ দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, না। আমার পায়ে হাত দিয়া কহিল, আপনি আমার গুরুজন। আপনার পায়ে হাত দিয়ে বলছি, মিণ্টার যাই হোক, আমি তাকে স্ত্রী ব'লে গ্রহণ করব, ওর ওপর আমার স্নেহ ও শ্রদ্ধার কোন দিন বিন্দুমাত্র অভাব হবে না।

প্রকাশের কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, গর্বিত হইলাম। পদ্মর ছেলে প্রকাশ! হারাণের ভাগিনেয় প্রকাশ! আমার ছাত্র প্রকাশ! আমাদের গ্রামের ছেলে প্রকাশ! পদ্ম কোন দিন তাহার মূল্য বুঝিবে না, হারাণ বুঝিবে না, গ্রামের কেহ বুঝিবে না—শুধু আমি, ছাত্র ও মাস্টারী জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে বাংলা দেশের ছেলেদের মনের খবর কিছু জানি বলিয়া বুঝিলাম। প্রকাশ আজ দৃঢ়কণ্ঠে যে প্রতিশ্রুতি আমাকে

দিল, যদি তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারে, তাহা হইলে সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় ও কর্ত্তব্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠায় বাংলা দেশের শত-করা নব্বইজন সভ্য-ভব্য শিক্ষিত শহুরে ছেলে এই ম্যাট্রিকুলেশন-পাস একটা ছোট ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডার, পাড়াগেঁয়ে প্রকাশ হালদারের পায়ের কাছে দাঁড়াইতে পারিবে না।

বেলা আটটার সময়ে বৈঠকখানায় বসিয়া ছিলাম। হঠাৎ প্রবোধ গাঙ্গুলীর বাড়ির দিক হইতে একটা সোরগোল শুনিতে পাইলাম, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির মধ্যে সদু-দিদিমার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ও নাতবউ! শুনেছ মজার খবর ?

নাতবউ কহিলেন, আসুন দিদিমা। এই সকালে ?

দিদিমা কহিলেন, হ্যাঁ লো। সাত সকালেই এলাম, ভাবলাম, টাটকা খবরটা দিয়ে যাই নাতবউকে।

কি খবর দিদিমা ?

বীরু আচাযি্যর বিধবা মেয়েটাকে পাওয়া যাচ্ছে না। যেমন ধিঙ্গী মাগীর খপ্পরে তুলে দিয়েছিল মেয়েকে, তেমনই ফাঁপরে পড়েছে। মেয়ে তো গেলই, এখন প্রাশ্চিত্তির যোগাড় করুক। দম লইয়া কহিলেন, সোমত্ত মেয়েটাকে সব জেনে শুনে কি ক'রে মাগীর কাছে শুতে পাঠালি !

নাতবউ প্রশ্ন করিলেন, মিণ্টা বুঝি ওখানেই শুত ?

সদু-দিদিমা কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া নাতবউকে কি গোপন বার্তা জানাইলেন, শুনিতে পাইলাম না। তবে নাতবউয়ের একটি প্রশ্নের উত্তরে শুনিতে পাইলাম, হ্যাঁ লো, হ্যাঁ, আমাদের পেকাশের সঙ্গে— পদ্মর বেটা, হাত-ধরাধরি ক'রে মেম-সাহেবের মত হাওয়া খেতে যাওয়া, কত গান, কত নাটক !

নাতবউ কহিল, কিন্তু প্রকাশ তো কোথাও যায় নি।

দিদিমা সক্ষোভে কহিলেন, পাগলী! ও কোথায় যাবে? ওকে কি মনে ধরেছে? পনরো টাকা মাইনের কম্পাণ্ডার। শাসালো কাপ্তেন পেয়েছে আর ওর মুখে নাথি মেরে সটকেছে।

তারপর আবার ফিসফাস করিয়া দুইজনে কি কথাবার্তা হইল।

তারপর কিঞ্চিৎ জোর গলায় দিদিমা বলিয়া উঠিলেন, হ্যাঁ লো, হ্যাঁ। ওই যে দেড়েল মিন্সে আসে গাঁয়ে মাঝে মাঝে। তোরা দেখিস নি, বউমানুষ দেখবি কি ক'রে? তারই ভাইপো, অনেক টাকা-পয়সা, কদিনই এই পাড়ায় ঘুরঘুর করছে। আমিই দেখলাম একদিন স্বচক্ষে, লম্বা-চওড়া দশাসই চেহারা। ভাবলাম, কাকা ভাইপো দুজনেই ভাগাভাগি করবে। দ্রৌপদীর পাঁচজন ছিল, ওর না হয় দেখিৎ দুজন। কিন্তু দেখছি, তা নয়, কাকাটিকে নিজে নিয়ে, ভাইপোটিকে মিণ্টাকে দিয়েছে।

নাতবউ কহিল. বসবেন না?

দিদিমা ব্যস্তভাবে কহিলেন, না ভাই, সময় নেই, অনেক ঘর ঘুরতে হবে। সবাইকে খবরটা দিয়ে আসি। যতদিন বুড়ী বেঁচে আছে, ততদিন সব খবর পাবি, ম'রে গেলে কি হবে ভগবান জানেন।—বলিয়া দিদিমা টহল সারিবার জন্য প্রস্থান করিলেন।

জামা-কাপড় ছাড়িবার জন্য বাড়ির ভিতরে যাইতেই পত্নী কহিলেন, শুনেছ?

জানাইলাম, হ্যাঁ।

পত্নী কহিলেন, কি কাণ্ড হচ্ছে গাঁয়ে! বামুনের মেয়ে হয়ে মুসলমানের ঘরে গেল! ছি ছি!

কহিলাম, কে বললে তোমাকে?

কেন, সদু-দিদিমা ব'লে গেলেন এক্ষুনি।

কহিলাম, বাজে কথা। কেউ চোখে দেখেছে কি? ওসব যা-তা কথা যার-তার সঙ্গে আলোচনা ক'রো না।

কোথায় গেল তবে?

জলে ডুবে আত্মহত্যাও তো করতে পারে।

স্বীকৃতি-সূচক ঘাড় নাড়িয়া পত্নী কহিলেন, তা সত্যি। পরক্ষণেই সন্দেহের সুরে কহিলেন, তা শুধু শুধু জলে ডুবতে যাবে কেন?

বাড়িতে ঝগড়া-ঝাঁটি করেছে হয়তো। বীরু আচায্যি তো ওর গয়না-গাঁটি সব মেরে দিয়েছে। মিণ্টা হয়তো ফিরে চেয়েছে। আর বীরু আচায্যি যেরকম লোক, স্বার্থে আঘাত লাগলে অত বড় মেয়েকেও মারধর করতে তার বাধবে না। তা ছাড়া বিধবা তো। এমনিই তাদের জীবনে দুঃখ-কষ্টের অবধি নেই।

গৃহিণী চিন্তিত মুখে চুপ করিয়া রহিলেন। আমাকে জামা-কাপড় পরিতে দেখিয়া কহিলেন, কোথায় যাচ্ছ?

কহিলাম, যাই একবার, দেখে আসিগে ব্যাপারটা কি?

যাচ্ছ বটে, কোন হাঙ্গামায় থেকো না, বুঝলে?

উপদেশমত কার্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

বীরু আচায্যির বাড়ির সামনে রীতিমত হাট বসিয়া গিয়াছে। গ্রামের ইতর ভদ্র সকলেই হাজির হইয়াছে। সকলের মুখই কৌতুক ও আনন্দে উজ্জ্বল, মজাদার আলোচনায় মুখর। সদু-দিদিমার প্রচার-কার্যের ফলে সকলেরই বিশ্বাস হইয়াছে যে, মিণ্টা মুসলমানের সঙ্গে বাহির হইয়া গিয়াছে, এবং আলোচনার ধারা সেই খাতেই বহিতেছে মনে হইল।

কতকগুলি যুবক (তিনুর টর্চ-লাইট সমিতির মেম্বাররা নহে) এক

জায়গায় জটলা করিয়া বিড়ি ফুঁকিতে ফুঁকিতে মিণ্টার রূপ ও যৌবনের তারিফ করিতেছিল। তাহাদেরই একজন হৃদয়াবেগের তাড়নায় বলিয়া উঠিল, আমরা সব থাকতে, মাইরি, দেবতার নৈবিদ্যি কুকুরে মেরে দিলে!

একজন কহিল, প্রকাশটা তবু নাড়তে-চাড়তে পেয়েছে, আমাদের ভাগ্যে কিছুই জুটল না, মাইরি!

ভিড় ঠেলিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিলাম। উঠানে মেয়েদের ভিড়; মেয়েদের মধ্যে বিধবার সংখ্যাই বেশি। তাহাদের মধ্যে আলোচনাও পুরুষদের চেয়ে কোন অংশে কম শ্রুতিসুখকর নহে। তবু তাহাতে কান না দিয়া পাশ কাটাইয়া আগাইয়া গেলাম। দেখিলাম, শোবার ঘরের দাওয়ায় দেওয়ালে ঠেস দিয়া, মাথায় হাত রাখিয়া, বীরু আচায্যি বসিয়া আছে। আশেপাশে পাড়ার দুই-চারিজন মুরুব্বি লোক উবু হইয়া বসিয়া আছে। আমাকে দেখিয়া বীরু আচায্যি কহিল, এসেছ? ব'স।—বলিয়া একটা ছেলেকে ডাকিয়া কহিল, একটা আসন পেতে দে। আমার খাতির দেখিয়া মুরুব্বিরা আমার দিকে তাকাইয়া চোখ পাকাইল।

বসিতেই বীরু কহিল, শুনেছ সব?

ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, হ্যাঁ।

বীরু কহিল, কিছু জানতাম না, রাত্রে ওখানে শোয় কিনা।

বরাবরই নাকি?

বীরু ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না না, এই বিয়ের কদিন। গাঙুলী-গিন্নী বললে, একা সব পেরে উঠব না, মিণ্টা দিন কয়েকের জন্যে আমার এখানেই থাকুক। আমি আর 'না' বলতে পারলাম না। এই কদিন ও ওখানেই খেত শুত, তবে যখন-তখন বাড়ি আসত, কাছেই তো বাড়ি। কালও সন্ধ্যের সময় এসেছিল।

প্রশ্ন করিলাম, কখন জানতে পারলে?

সকালে, কি জন্তে ওকে ডেকে পাঠাতেই। আমাদের বাড়ি থেকে ব'লে পাঠালে, মিণ্টা তো আসে নি, ওখানেই তো আছে। শুনেই গাঙুলী-গিন্নী ব'লে পাঠালে, ওখানেও নেই। আমি বাড়িতে ছিলাম, শুনে আঁতকে উঠলাম। তারপর ঘর-বাড়ি পুকুর-ঘাট তন্নতন্ন ক'রে খুঁজলাম, মামার বাড়িতে লোক পাঠালাম, কোথাও পেলাম না।

একজন মুরুব্বি প্রশ্ন করিল, গাঙুলীদের বাড়ি খোঁজা হয়েছে তো?

বীরু কহিল, সব খোঁজা হয়েছে। হঠাৎ কাঁদিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, মাকে কোথাও পাওয়া যায় নি।

মুরুব্বিরা তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিতে লাগিল, পৃথিবীতে কেহ কাহারও আপনার নয়। সকলে নিজ নিজ ভাগ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে, নিজ নিজ ভাগ্যফল ভোগ করে। মিণ্টার যদি কিছু অঘটন ঘটিয়াই থাকে, তাহা তাহার নিজের ভাগ্যদোষেই ঘটিয়াছে; তাহাতে বীরুর কোন হাত নাই, দুঃখ করিবারও কোন কারণ নাই। তাহার খোঁজ করিবারই বীরুর প্রয়োজন ।কসের? মেয়েমানুষ যখন একবার ঘরের বাহিরে পা দিয়াছে, তাহাকে তো আর ঘরে লওয়া চলিবে না, সর্পদষ্ট অঙ্গুলির মতই তাহাকে ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে। অতএব বীরু আচায্যি আর বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া প্রায়শ্চিত্তের জন্য একটি লম্বা-চওড়া ফর্দ করুক। গ্রাম-সুদ্ধ সকলকে একটি প্রকাণ্ড ভোজ না দিলে, সেই পাপিষ্ঠার সহিত সম্পর্কজনিত যে দোষ ঘটিয়াছে, তাহার স্খালন হইবে না।

রান্নাঘরের দাওয়ায় পড়িয়া বীরু আচায্যির স্ত্রী সুর করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছিল, ও মাগো! কোথায় গেলি মাগো? কি অভিমানে প্রাণ বিসর্জন দিলি মাগো!

সদু-দিদিমা ইতিমধ্যেই হাজির হইয়াছিলেন, তিনি বুঝাইলেন, প্রাণ-ট্রান বিসর্জন দেয় নি লো, ঠিক বেঁচে আছে। আজকালের মধ্যেই খবর পাবি।

বীরু আচায্যির স্ত্রী ক্রন্দনের সুরেই জবাব দিল, না গো। আমার মায়ের যে গঙ্গাজলের মতন স্বভাব গো। কারও দিকে কখনও মুখ তুলে তাকাত না গো। সে যে বড় লজ্জাশীলে গো।

মেয়েদের ভিড়ের মধ্য হইতে কে কহিল, লজ্জাশীলে!

হঠাৎ রাধানাথের গলা শোনা গেল, এই, তোরা এখানে কি করছিস সব? যা, নিজের নিজের বাড়ি চ'লে যা। বলিতে বলিতে বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া চারিদিকে তাকাইয়া কহিল, এখানেও সব জুটেছে! মেয়েদের উদ্দেশ্যে কহিল, তোমরা এখানে সব কি করছ বল দেখি? কাজকর্ম নেই? যাও, সব বাড়ি যাও। এখুনি দারোগা-পুলিস আসবে, পালাতে পথ পাবে না তখন।

ত্রস্ত রমণীকণ্ঠের মিলিত ধ্বনি উঠিল, ওলো! তাই নাকি লো! চল্, চল্ তবে। মেয়েদের ভিড় কমিতে শুরু করিল।

রাধানাথ আসিয়া পৌঁছিতেই বীরু হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

রাধানাথ মেঝের উপর চাপিয়া বসিয়া কহিল, কেঁদে কি আর করবে? ওই মাগীর সঙ্গে যখনই ঘনিষ্ঠতা করেছ, তখনই বুঝেছি, একটা বিপদ ঘটবেই। কোনও চিন্তা নেই। ওই প্রকাশ ছোঁড়াটারই কাণ্ড; মাগীটার সঙ্গে যোগ-সাজস ক'রে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। দারোগাকে খবর দেওয়া হয়েছে। এসে এখুনি টেনে বার করবে, দেখো।

বীরু আচায্যির স্ত্রী দাদাকে দেখিয়াই প্রথমে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া

উঠিয়াছিল। তারপর শোকোচ্ছ্বাস সামলাইয়া এতক্ষণ চুপ করিয়া রাধানাথের কথা শুনিতেছিল; কথা শেষ হইবামাত্র আবার শুরু করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিল, না গো। মাকে আর জীবন্ত পাওয়া যাবে না গো। সে যে আমার তেমন মেয়ে নয় গো, তোমরা সাতঘেটে পুকুরে জাল ফেলাও গো, তা হ'লেই মাকে পাওয়া যাবে গো।

রাধানাথ হাঁকিয়া কহিল, না না, আমি বলছি, ওদের কাজ। ওই মাগীকে পাকড়াও ক'রে ধরলেই সব বেরিয়ে পড়বে। আর ওই প্রকাশটাকেও ঘা কতক দিতে হবে।

একজন কহিল, গাঙুলী-গিন্নীর কাছে একবার গেলে হয় না? সবাই মিলে বুঝিয়ে বললে-টললে—

বাধা দিয়া রাধানাথ কহিল, না না, আমি আর ও-বাড়িতে পা দিচ্ছি না। মাগী যা ধড়িবাজ, হয়তো কি একটা বিপদে ফেলে দেবে। তোমরা যেতে চাও তো মাস্টারকে সঙ্গে নিয়ে যাও। ওর সঙ্গে খু-উ-ব ভাব।—বলিয়া চোখ দুইটা উল্টাইয়া ঘাড়টা কাত করিয়া দিল। তাহার মুখভঙ্গী দেখিয়া সকলেই, এমন কি বীরু পর্যন্ত, হাসিয়া উঠিল, কেবল আমি গম্ভীর হইয়া রহিলাম।

কে আসিয়া খবর দিল, দারোগাবাবু এসেছেন।

রাধানাথ লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, এস হে সব।

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, দারোগাবাবু, লছমন সিং, মন্টু চক্রবর্তী, গাঙুলী মশায়, তিনু ও তাহার দলবল দাঁড়াইয়া আছে। জনতা দূরে সরিয়া গিয়া অর্ধ-বৃত্তাকারে দাঁড়াইয়াছে।

আমাকে দেখিয়া দারোগাবাবু কহিলেন, আপনি কতক্ষণ এসেছেন?

কহিলাম, প্রায় আধ ঘণ্টা।

ডাকিয়া কহিলেন, শুনুন, একটা কথা আছে। একটু সরিয়া গিয়া ফিসফিস করিয়া কহিলেন, গাঙুলী মশায় বলছেন, প্রকাশবাবু সরোজিনী দেবীর সঙ্গে যোগ-সাজস ক'রে মেয়েটাকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন। আপনার কি মনে হয়?

কহিলাম. আপনি ওই ভাবেই খোঁজ-খবর করুন। আমার বক্তব্য পরে বলব।

রাধানাথ আমার মুখের দিকে এতক্ষণ কটমট করিয়া তাকাইয়া ছিল। দারোগাবাবু মুখ ফিরাইতেই নিজ বুকে হাত দিয়া কহিল, হুজুর! মেয়েটি আমার নিজের ভাগ্নী। আমার একটি বক্তব্য আপনাকে শুনতে হবে।

দারোগাবাবু কহিলেন, বলুন।

আমার মনে হয়, শুধু আমার কেন, গাঁ-সুদ্ধ সকলেরই বিশ্বাস, প্রকাশ হালদারের এই কাজ, আর প্রবোধ গাঙুলীর বিধবাও এর মধ্যে আছে।

দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রকাশবাবু কোথায়?

রাধানাথ কহিল, সেও গা-ঢাকা দিয়েছে বোধ হয়।

তিনুর দলের একজন কহিল, প্রকাশদাদা ডাক্তারখানায় রয়েছেন, আমি দেখে এলাম।

দারোগাবাবু কহিলেন, বেশ, কেউ তা হ'লে তাকে ডেকে আনুক।

রাধানাথ কহিল, ওর বাড়িটা খুঁজে দেখতে হবে।

কেউ তো নেই ওখানে।

ওখানেও লুকিয়ে রাখতে পারে।

দারোগাবাবু ভ্রূ কুঁচকাইয়া কহিলেন, হারাণবাবুর ভাগ্নে তো?

সকলে ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' জানাইল।

দারোগাবাবু কহিলেন, হারাণবাবু কোথায় গেছেন ?

জবাব দিল রাধানাথ, শ্বশুরবাড়ি গেছে। তার বোনও এখানে নেই। ছেলের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে পালিয়েছে।

দারোগাবাবু কহিলেন, ঝগড়া কেন ?

রাধানাথ কহিল, প্রবোধ গাঙ্গুলীর বাড়ি আনাগোনা করা পছন্দ করত না। ছোঁড়াটা রাতদিন ওইখানেই প'ড়ে থাকে কিনা আজকাল।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন! একটু বসবার ব্যবস্থা করা দরকার।

মণীন্দ্র কহিল, চলুন না আমাদের ওখানে।

রাধানাথ কহিল, না না, একটা চেয়ার বরং এখানে নিয়ে আসুক।

দারোগাবাবু কহিলেন. এত হাঙ্গামার দরকার কি ? ওখানেই চলুন। সরোজিনী দেবীকেও দু-চার কথা জিজ্ঞাসা করতে হবে। ওঁর বাড়িটা বোধ হয় সব খোঁজা হয়েছে ?

রাধানাথ কহিল. কি ক'রে জানব হুজুর ? ওরা নিজেরাই খুঁজেছে, আপনারও একবার নিজে খানাতল্লাসি ক'রে দেখা দরকার।

সরোজিনীর বৈঠকখানার বারান্দায় গিয়া সকলে বসিলাম। চৌকিদারের পিছু পিছু প্রকাশ আসিয়া হাজির হইল।

দারোগাবাবু গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া তাহাকে কহিলেন, বসুন।

প্রকাশ মলিন মুখে একটা চেয়ারে বসিল।

দারোগা ভারী গলায় কহিলেন, সব শুনেছেন ?

প্রকাশ ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' জানাইল।

দারোগাবাবু কহিলেন, আপনার বাড়িতে কে আছে এখন ?

প্রকাশ ক্লান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, কেউ নেই।

ওখানে লুকিয়ে-টুকিয়ে রাখেন নি তো?

প্রকাশ ম্লান মুখে চাহিয়া রহিল।

দারোগাবাবু কহিলেন, একবার বাড়িটা খুঁজে দেখতে হবে।

প্রকাশ চাবির গোছাটা পকেট হইতে বাহির করিয়া কহিল, খুঁজে দেখুনগে।—বলিয়া চাবির গোছাটা দারোগাবাবুর দিকে আগাইয়া দিল।

দারোগাবাবু কহিলেন, আমি নিয়ে কি করব? আপনি লছমন সিংয়ের সঙ্গে যান, ঘর খুলে সব দেখানগে।

প্রকাশ তিমুকে ডাকিয়া তাহার হাতে চাবি দিয়া কহিল, ভাই, একবার সঙ্গে যাও, ওঁরা বাড়ির ভেতরটা দেখবেন। খুলে সব দেখিয়ে দাওগে।

তিমু, লছমন সিং, জন দুই চৌকিদার, আরও অনেকে চলিয়া গেল।

দারোগাবাবু কহিলেন, সরোজিনী দেবীকে দু-চার কথা জিজ্ঞাসা করতে হবে এ সম্বন্ধে। মনুবাবু, একবার খবর দিন।

মণীন্দ্র চলিয়া গেল।

রাধানাথ কহিল, হুজুর, বাড়িটাও একবার খুঁজে দেখা দরকার।

দারোগাবাবু গর্জিয়া উঠিলেন, আপনি অনেকক্ষণ থেকে ফ্যাচফ্যাচ করছেন, কি করতে হবে, না-হবে আমি জানি। আপনি চুপ ক'রে থাকুন।

রাধানাথ চুপ করিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

মণীন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া কহিল, আসুন দারোগাবাবু।

দারোগাবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে কহিলেন, আসুন মাস্টার মশায়। দুইজনেই ভিতরে গেলাম। তিনজন চৌকিদার তিনখানা চেয়ার বৈঠকখানা হইতে বহিয়া লইয়া আসিয়া উঠানে পাতিল। আমরা

বসিতেই বারান্দায় সরোজিনীর আবির্ভাব ঘটিল। ইহার মধ্যেই স্নান সমাপন করিয়াছে, পরনে কালা-পাড় শান্তিপুরী ধুতি ও শেমিজ; পিঠ-ছাওয়া একরাশ কালো কোঁকড়ানো চুলের উপর স্বল্প অবগুণ্ঠন, মুখের ভাব গম্ভীর ও বিষণ্ণ, আমাদের দেখিয়াই যুক্ত-কর কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিল।

কাছে আসিতেই দারোগাবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, বসুন।

সরোজিনী কহিল, না, বসব না, পূজো-আচা শেষ হয় নি এখনও, যা বলবার দাঁড়িয়েই ব'লে যাই।

দারোগাবাবু বসিয়া কহিলেন, আপনাকে দু-চারটে কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে।

সরোজিনী কহিল, করুন।

মিণ্টা মেয়েটি আপনার এখানেই ছিল?

সরোজিনী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হ্যাঁ।

এখানে থাকত কেন?

বিয়ের কদিন কাজ-কর্মে সাহায্য করবার জন্যে ওর বাবাকে ব'লে ওকে এখানে রেখেছিলাম। বিয়ের পরদিনই বাড়ি গিয়েছিল। কিন্তু বাবার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে আবার ফিরে এল। কালও সন্ধ্যের সময় বাড়ি গিয়েছিল, কিন্তু বাড়িতে পা দেওয়া মাত্র ওর বাবা নাকি গালাগালি ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

কারণটা কি শুনেছেন?

সরোজিনী কহিল, হ্যাঁ।

কি?

সরোজিনী কহিল, একটা কারণ যা শুনেছি, তা এই—বীরু আচায্যির ঘর-বাড়ি আমার কাছে বাঁধা আছে। বীরু আচায্যি মিণ্টাকে বলেছিল,

বিয়ের দিন গোলমালের মধ্যে কোন রকমে আমার কাছ থেকে চাবি নিয়ে বাক্স খুলে ওর বন্ধকী দলিলটা যেন চুরি করে।

বিস্ময় ও কৌতূহলের সহিত দারোগাবাবু কহিলেন, তাই নাকি! তারপর?

মিণ্টা এসেই আমাকে ব'লে দিলে ওর বাবার কথা। পরদিন বাড়ি যাবামাত্র ওর বাবা দলিল চাইলে। মিণ্টা স্পষ্ট জানিয়ে দিলে যে, ওসব কাজ করতে ও পারবে না। বীরু আচায্যি ওকে বললে, না পারলে চলবে না, দলিল হাতে ক'রে ও যেন ফের ওর বাড়ি ঢোকে। বিয়ের পরদিনও মিণ্টা এখানে থেকে গেল। পরের দিন, মানে কাল, এখানে কাজ ছিল, তাই ওকে ছাড়ি নি। কাজকর্ম সেরে ও বাড়ি যায়, বীরু আচায্যি ওকে দেখবামাত্র খুব অপমান ক'রে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। ওখান থেকে ফিরে এসে মিণ্টা খুব কাঁদতে লাগল, আমি ওকে বুঝিয়ে বললাম, ওর কোন চিন্তা নেই, বীরু আচায্যির দলিল আমি এখনই ফিরিয়ে দোব। তখন ও চুপ করলে।

তারপর?

রাত্রে দুজনে একসঙ্গে শুয়েছিলাম। কদিন রাত-জাগা চলছে, শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ি। সকালে দেখি, মিণ্টা নেই, দরজা খোলা। ভাবলাম, বাড়ি গেছে। ভাঁড়ার-ঘরের চাবিটা ওর কাছে ছিল, তাই ওর কাছে চেয়ে পাঠাতেই ওর মা ব'লে পাঠালে, ও ওখানে যায় নি। তাতেই জানতে পারলাম, ও কোথায় চ'লে গেছে।

দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কি মনে হয়?

সরোজিনী কহিল, ওর বাবা কদিন ধ'রে ওর ওপরে যা দুর্ব্যবহার করেছে, তাতে মনের কষ্টে আত্মহত্যা করা ওর পক্ষে অসম্ভব নয়। তবে রাগ ক'রে কাছাকাছি কোন আত্মীয়স্বজনের বাড়ি পালিয়েও যেতে পারে।

দারোগবাবু কহিলেন, আর আপনাকে বিরক্ত করব না। উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, আপনার বাড়িটা বেশ ক'রে খুঁজে দেখেছেন তো?

সরোজিনী গম্ভীর ও অপ্রসন্ন মুখে কহিল, আমরা তো দেখেছি, আপনারাও দেখতে পারেন।

দারোগাবাবু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, না না, আপনি দেখেছেন যখন, তখন আর আমাদের দেখবার কি দরকার? বেশ, আমরা তা হ'লে চলি। নমস্কার।

বাহিরে আসিবামাত্র লছমন সিং আসিয়া কহিল, বাড়ি তন্নতন্ন ক'রে খোঁজা হ'ল, ওখানে নেই।

চেয়ারে বসিয়া দারোগাবাবু বীরু আচার্যকে তাহার বক্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন। বীরু আমাকে যাহা বলিয়াছিল, তাহাই পুনরাবৃত্তি করিল। তারপর দারোগাবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, আমি চলি এখন, আপনারা খোঁজ-খবর পান তো খবর দেবেন। আমরাও চেষ্টা করব। প্রকাশবাবু, চলুন আমার সঙ্গে। আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, মাস্টার মশায়, আপনিও আসুন, একটু দরকার আছে। —বলিয়া রাধানাথের ক্রোধ-বহ্নিতে ইন্ধন যোগ করিয়া কহিলেন, কেউ যে চুরি ক'রে লুকিয়ে রেখেছে, তার কোন প্রমাণ নেই। আত্মহত্যা করতে পারে, কোন আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে পালিয়েও যেতে পারে। আপনারা, গাঁয়ের যে যে পুকুরে মেয়েটি যেত, সেখানে জাল ফেলাবার ব্যবস্থা করুন, আর আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে লোক পাঠিয়ে খবর নিন।

থানায় পৌঁছিয়া দারোগাবাবুকে সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলাম, প্রকাশের সহিত মিণ্টার সম্পর্ক, মিণ্টার নৈশ অভিসার এবং প্রকাশ স্বচক্ষে যাহা কিছু দেখিয়া আসিয়াছে, সবই। দারোগাবাবু বিস্ময়ে ও

পুলকে পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চিত হইতে লাগিলেন এবং শেষে কহিলেন, আর কিছু বলতে হবে না, সব বুঝেছি। আপনি এর পর যেতে পারেন। আমি সব ব্যবস্থা করব।

কহিলাম, এখনই যাবেন নাকি ?

পাগল ! ঠিক সন্ধ্যের পর যাব। বামালসুদ্ধ আসামীকে পাকড়াও করব।

কহিলাম, দারোগাবাবু, আমার একটা অনুরোধ কিন্তু আপনাকে রাখতে হবে।

কি বলুন ?

মামলা-মকদ্দমা যাতে না হয়, তা দেখবেন। আজিজ সাহেবকে নিয়ে এমনই ব্যবস্থা করবেন, যাতে সব আপোসে মিটে যায়, না হ'লে মেয়েটাকে নিয়ে টানাটানি হ'লে সে ভারি কেলেঙ্কারি হবে।

চোখ মটকাইয়া দারোগাবাবু কহিলেন, কোন চিন্তা নেই আপনার। মেয়েকে আজ রাত্রেই ফিরে পাবেন। সত্তরকেও এমনই ঠাণ্ডা ক'রে দোব যে, জীবনে যেন এমন কর্ম আর না করে। তবে মেয়েটি ফিরে এসে কারও কাছে কোন কথা যেন প্রকাশ না করে। তা হ'লেই আর কোন গোলমাল হবে না। তবে একটা কথা— ।—বলিয়া দারোগাবাবু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, মেয়েটি ফিরে এলে ওর কি ব্যবস্থা হবে ?

কহিলাম, প্রকাশ ওকে বিয়ে করবে।

দারোগাবাবু সবিস্ময়ে কহিলেন, সত্যি ? একে বিধবা, তার ওপরে মুসলমানে ধ'রে নিয়ে গেছে, তা সত্ত্বেও প্রকাশবাবু বিয়ে করবেন ?

কহিলাম, প্রকাশ আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে।

দারোগাবাবু কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া প্রকাশের উদ্দেশে কহিলেন, আপনার সৎসাহস ও সততায় ভারি সন্তুষ্ট হলাম প্রকাশবাবু।

হিন্দুদের মধ্যে আপনার মত ছেলে খুব কমই দেখেছি। মেয়েটির জন্যে আপনার কোন চিন্তা নেই। খুব সম্ভব দিনের বেলায় তার ওপর কোন অত্যাচার হবে না। সন্ধ্যের আগেই আমরা তাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসব, আপনি এসব কথা আর কাউকে বলবেন না। আর মেয়েটিকেও ব'লে দেবেন, সেও যেন কাউকে কিছু না বলে।

ফিরিয়া আসিবার পথে প্রকাশকে বলিলাম, আবার এখন ডাক্তার-খানায় যেতে হবে নাকি ?

প্রকাশ চিন্তাকুল মুখে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, ডাক্তারবাবুর কাছে এক দিনের ছুটি নিয়ে এসেছি।

তবে চল্ আমার ওখানেই। খেয়ে-দেয়ে ঘুমোবি। আজ আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই।

২১

সেই দিন শেষরাত্রে কান্নার শব্দে জাগিয়া উঠিলাম। বারান্দায় বাহির হইয়া আন্দাজে বুঝিলাম, কান্নার শব্দটা বীরু আচায্যির বাড়ির দিক হইতে আসিতেছে। মিণ্টা বোধ হয় ফিরিয়া আসিয়াছে ; তাই অপহৃতা কন্যাকে ফিরিয়া পাইয়া কন্যাহারা জননী আনন্দে কান্না শুরু করিয়া দিয়াছে। বৈঠকখানায় আসিয়া দেখিলাম, প্রকাশও বৈঠক-খানার বারান্দায় দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছে। আমাকে দেখিয়া কহিল, ফিরে এসেছে বোধ হয়। একবার যাবেন না ?

কহিলাম, চল্। জামাটা প'রে আসি।

পৌঁছিয়া দেখিলাম, পাড়ার অনেকে আসিয়া জুটিয়াছে ; ভোরের ঘুম এখনও ভাল করিয়া ছাড়ে নাই, কাজেই সবাই রাস্তার উপরে বসিয়া

পড়িয়া চোখ মুছিতেছে ও হাই তুলিতেছে। বীরু আচায্যির সদর-দরজার সামনে যে বড় পাথরটা সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হয়, মিণ্টা তাহার উপরে গালে হাত দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে ; সারা-দেহে সুগভীর ক্লান্তি : মুখে সুনিবিড় দুঃখ ও নিরাশার ছায়া ; চুল রুক্ষ ও বিশৃঙ্খল : দুই চোখ হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিতেছে। সামনে দাঁড়াইয়া বীরু আচায্যি আস্ফালন করিয়া বলিতেছে, চ'লে যা এখান থেকে। কেন এসেছিস ? যেখানে ছিলি, সেইখানেই মরগে।

মিণ্টা একবার মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আবার মুখ নামাইল। শুনিলাম, বাড়ির মধ্যে বীরুর স্ত্রী বিনাইয়া বিনাইয়া উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতেছে, কেন ফিরে এলি কালামুখী ? আমি যে মনকে বুঝিয়েছিলাম গো—যে সাতঘেটের জলে ডুবে মরেছিস, কাল ভেসে উঠবি, তারপর পুড়িয়ে দিলেই জ্বালা-যন্ত্রণা চুকে যাবে গো ; কেন মরলি না গো ; কেন ফিরে এসে সারাজীবন জ্বালাতে এলি গো ?

বীরু আচায্যি তাড়িয়া গিয়া কহিল, উঠে যা বলছি। এখনও ব'সে আছিস কি করতে ? চারিপাশের লোকগুলাকে দেখাইয়া কহিল, এদের সামনে ঢঙ ক'রে ব'সে থাকতে লজ্জা করছে না তোর ? তুই কি ভাবছিস, তোকে ঘরে নিয়ে আমি সমাজে একঘরে হব ? যা. উঠে যা আমার সামনে থেকে।

এবার অশ্রুভরা চোখ দুইটি বীরুর মুখের পানে তুলিয়া মিণ্টা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, কোথায় যাব ? কোথায় যাবার জায়গা আছে আমার ?

বীরু দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া কহিল, আমি কি জানি ? যেখানে ইচ্ছে যা। আমার ঘরে তোর জায়গা হবে না, আমি স্পষ্ট ব'লে দিচ্ছি।

প্রকাশ কহিল, মামা ! আমি ওকে ডেকে আনি।

তাহার মাথায় হাত দিয়া কহিলাম, যা।

ঠিক সেই মুহূর্তে ভিড় ঠেলিয়া সরোজিনী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মিণ্টার কাছে গিয়া গম্ভীরমুখে দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, মিণ্টা! এখানে ব'সে থাকতে হবে না, এস আমার সঙ্গে।

মিণ্টা আর্তকণ্ঠে কহিল, মাসীমা! নেবেন আমাকে আপনি? তারপর টলিতে টলিতে উঠিয়া আসিয়া শঙ্কাতুর শিশু যেমন ভাবে দুই ব্যাকুল বাহু দিয়া মাকে জড়াইয়া ধরে, ঠিক তেমনই ভাবে সরোজিনীকে জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার বুকে মাথা রাখিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সরোজিনী তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া পরম স্নেহের সহিত কহিল, চুপ কর মিণ্টা, চল, বাড়ি যাই।—বলিয়া তাহাকে ধরিয়া ধরিয়া লইয়া চলিল। প্রকাশ আগাইয়া গিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া সরোজিনী কহিল, প্রকাশ, তুমিও এস।

পিছনে লোকগুলা হাসি ও টিটকারিতে মুখর হইয়া উঠিল।

বেলা আটটার সময়ে দারোগাবাবুর কাছে গেলাম। ঘুমাইতেছিলেন, হাই তুলিতে তুলিতে উঠিয়া আসিলেন। বসিতেই জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হ'ল কাল?

শ্লেষ্মা-জড়িত কণ্ঠে দারোগাবাবু কহিলেন, সে অনেক ব্যাপার।—বলিয়া চেয়ারে ঠেস দিয়া অর্ধমুদ্রিত নয়নে সিগারেট টানিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে একটা শেষ টান দিয়া দগ্ধাবশিষ্ট সিগারেটটাকে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, সংক্ষেপে বলি শুনুন।—সন্ধ্যের পরে ঠিক জায়গায় হাজির হলাম। বাড়ির দরজা বন্ধ ছিল। দরজায় ধাক্কা দিলাম। প্রথমে খুললে না। হাঁকাহাকি করতেই দরজাটা খুলে দিয়েই প্রথমটা রুখে এল। তারপর লাল-পাগড়ি দেখতেই একেবারে নেতিয়ে পড়ল। বাড়ির ভেতরে গিয়ে দেখলাম, উঠনে মদের বোতল গ্লাস আর

আনুষঙ্গিক উপকরণ প'ড়ে রয়েছে ; মদ খাওয়া চলছিল বুঝলাম, একা নয়, আরও দুজন, তারা অবশ্য একটু সুবিধে পেয়েই সটকাল। তারপর যে ঘরটায় তালা ঝুলছিল, সেই ঘরটা খুলতে বললাম, কিছুতে খুলতে চাইলে না ; হাতকড়ি বার করতেই খুলে দিলে। ঘরে ঢুকে দেখলাম, মেয়েটি ঘরের এক কোণে ভয়ে জড়সড় হয়ে ব'সে আছে ; আমার পোশাক দেখেই, আমি যে তাকে উদ্ধার করতে গেছি, বোধ হয় বুঝতে পারলে ; উঠে এসে আমার পায়ের কাছে লুটিয়ে প'ড়ে কাঁদতে লাগল। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে চুপ করিয়ে, আজিজ সাহেবকে ডেকে পাঠালাম। তিনি তো সব দেখে-শুনে রেগে খুন। ছোকরাকে এই মারেন তো এই মারেন। অনেক কষ্টে থামালাম। বললেন, ধ'রে নিয়ে যান ওকে ; শাস্তি হোক ওর। শেষে ছোকরাটা মেয়েটির পায়ে হাত দিয়ে মাপ চেয়ে গুনে গুনে সাত হাত নাকে খত দিতে তবে ঠাণ্ডা হলেন। কাছেই একটা হিন্দুর বাড়ি ছিল, মেয়েটিকে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। আজিজ সাহেব নিজে তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন, বললেন।

কহিলাম, ছোঁড়াটাকে একটু শায়েস্তা ক'রে দিয়ে এলেন না ?

মুচকি হাসিয়া দারোগাবাবু কহিলেন, শায়েস্তা ! ও আর আপনার শুনে কাজ নেই। তবে এইটুকু জেনে রাখুন, সাত দিনের মধ্যে ও আজিজ সাহেবের মেয়েকে বিয়ে করবে, আর অন্তত যতদিন আমি এখানে থাকব, ততদিন আর চুলবুল করবে না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, মেয়েটি ফিরে এসেছে তো ?

কহিলাম, হ্যাঁ।

কি বলেছে ?

শুনলাম, বলেছে, যখন নিয়ে গিয়েছিল, তখন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম ; একটা ঘরে সারাদিন বন্ধ ক'রে রেখেছিল। রাত্রে যখন পাঠিয়ে

দেয়, তখন অন্ধকার, তাই কে নিয়ে গিয়েছিল, কোথায় নিয়ে গিয়েছিল, কিছু বুঝতে পারি নি।

দারোগাবাবু ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, ঠিক বলেছে। কাউকে কিছু বলতে আমি মানা ক'রে দিয়েছিলাম। আমি একবার আজ বিকেলে লোক-দেখানো গিয়ে দু-চার কথা জিজ্ঞাসা ক'রে আসব। তারপর, একটা সুবিধেমত ফাইনাল রিপোর্ট দিয়ে দিলেই সব চুকে-বুকে যাবে।

কহিলাম, ওর বাবা বাড়িতে জায়গা দেয় নি ওকে।

বিস্মিতকণ্ঠে দারোগাবাবু কহিলেন, কোথায় আছে তা হ'লে ?

মিসেস গাঙ্গুলীর বাড়িতে।

দারোগাবাবু সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাইয়া কহিলেন, নিজের বাবা যাকে স্থান দিলে না, উনি তাকে আশ্রয় দিলেন ? সত্যি বলছি মাস্টার মশায়, ও-রকম মহৎ ও উদার প্রকৃতির মেয়েমানুষ খুব কম দেখা যায়, অন্তত আমি কোন দিন চোখে দেখি নি।—বলিয়া ভাবাধিক্যে তদ্গত-চিত্ত হইয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ পরে সামলাইয়া উঠিয়া কহিলেন, প্রকাশবাবুর মতলব এখনও ঠিক আছে তো ?

এখনও তো আছে দেখছি। ওকেও সরোজিনী বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেছে।

দারোগাবাবু ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, উনি যখন পাকড়েছেন, তখন ওঁর আর নিস্তার নেই, ঘাড়ে নিতেই হবে।

জোর ক'রে খাড়ে চাপিয়ে লাভ নেই। ঘাড় থেকে ফেলে দিতে কতক্ষণ ! সারাজীবন তো সরোজিনী ওদের পাহারা দিতে পারবে না।

দারোগাবাবু গম্ভীর মুখে কহিলেন, তা বটে। অনেকক্ষণ চিন্তিতভাবে বসিয়া থাকিয়া কহিলেন, মেয়েটিকে যতটুকু দেখেছি, তাতে মনে হ'ল, খুব ভাল। শুধু সুন্দরী বলছি না. সৎ-সমাজের বাইরে আপনারা

মেয়েদের জন্যে যে স্থান নির্দিষ্ট ক'রে রেখেছেন, সেখানে ওকে মানাবে না। যদি আপনারা ওর কোন ব্যবস্থা করতে না পারেন, তা হ'লে আমাকে বলবেন। আমি ওকে, যেখানে মানাবে ঠিক সেইখানে, আশ্রয় পাবার ব্যবস্থা ক'রে দোব।

নমস্কার করিয়া চলিয়া আসিলাম। প্রবোধ গাঙ্গুলীর বাড়ির কাছে আসিয়া দেখিলাম, বাড়ির সামনে একটা পালকি নামানো রহিয়াছে। তাহার কাছে দাঁড়াইয়া রাধানাথ, অনুকূল-মামা, পাড়ার আরও দুই-চারজন লোক তর্ক-বিতর্ক করিতেছে।

আমাকে দেখিয়া রাধানাথ কহিল, কোথায় গিয়েছিলে হে সকাল-বেলায়? থানায় বুঝি? খুব যে আনাগোনা করছ? ব্যাপারখানা কি?

কহিলাম, দারোগাবাবুর কাছে গিয়েছিলাম, খবরটা নিয়ে এলাম।

মুখ-চোখ বাঁকাইয়া রাধানাথ কহিল, তোমার এত মাথাব্যথা কিসের বল দেখি? তার তো মুরদে কুলোল না। ব'সে ব'সে সরকারের টাকা খাচ্ছে, আর ফপরদালালি ক'রে বেড়াচ্ছে, কোন দিন তো কিছুর কিনারা করতে দেখলাম না।

অনুকূল মুরুব্বিয়ানার সহিত কহিল, আমাদের দেশ হ'লে ওপরওয়ালাদের কাছে কত লেখালেখি হ'ত।

রাধানাথ সায় দিয়া কহিল, লিখিয়ে-পড়িয়ে লোক এখানে থাকলে তো। ছুটকো-ছাটকা দু-একজন যা আছে, তারা ওর পায়ের কাছে প'ড়ে লেজ নাড়ছে রাত দিন।—বলিয়া আমার দিকে কটাক্ষক্ষেপ করিল।

অনুকূল মুখ হাঁড়ি করিয়া গম্ভীরকণ্ঠে কহিল, সত্যি। না হ'লে যে ব্যাপারটা এখানে হয়েছে, সোজা ব্যাপার নাকি? একটা ভদ্রলোকের মেয়েকে, বিশেষ ক'রে বামুনের ঘরের বিধবাকে, ধ'রে নিয়ে

গেছে, তার একটা তদারক পর্যন্ত হ'ল না? আমাদের দেশ হ'লে এতদিন লেখার চোটে ম্যাজিস্ট্রেট-জজ পর্যন্ত থরথর ক'রে কেঁপে উঠত,—নারীরক্ষা-সমিতি, অবলা-বান্ধব-সমিতি, যেখানে যা আছে, সব ছুটে আসত।

রাধানাথ বুক ঠুকিয়া কহিল, ঠিক, ঠিক বলেছেন। তাই তো হ'ত। দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া কহিল, আর এখানে কি হচ্ছে? সব জড়-ভারত। ঠুঁটো জগন্নাথের মত সব ব'সে আছে।—বলিয়া আমার দিকে কটমট করিয়া তাকাইল।

হঠাৎ মাতুলের হাত জাপটাইয়া ধরিয়া কহিল, হেই মামা! লিখে দেন তো একটা দরখাস্ত, সব বেটাকে একবার দেখি।

প্রবোধ গাঙ্গুলীর মাকে, প্রকাশ ও মণীন্দ্র ধরাধরি করিয়া বাহির করিয়া আনিল। পিছনে সরোজিনী। দেখিবামাত্র সকলে চুপ করিয়া গেল; মাতুল ও রাধানাথ কতকটা সরিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। আমি কাছে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলাম।

বৃদ্ধা পালকির কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া কহিল, থাম। বউমা কই? আসে নি সঙ্গে?

সরোজিনী কাছে গিয়া একেবারে বৃদ্ধার বুক ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল।

বৃদ্ধা তাহার মাথায় হাত দিয়া কহিল, এই যে মা আমার। কম্পিত স্বরে টানিয়া টানিয়া বলিতে লাগিল, মনে দুঃখ ক'রো না মা। আমি দিন কয়েকের জন্যে যাচ্ছি। তুমি মেয়েটার একটা ব্যবস্থা ক'রে ঘর-দোর শুদ্ধ ক'রে খবর পাঠিও; তা হ'লেই আবার আসব। দৃষ্টিহীন ভাবলেশহীন ঘোলাটে চক্ষু দুইটি কম্পিত জনতার এ-পাশ হইতে ও-পাশ পর্যন্ত বুলাইয়া দিয়া কহিল, হিন্দু বিধবা, মরতে বসেছি, এই সময়ে আর অনাচার সহ্য হবে না।—বলিয়া ঘাড়টি নাড়িতে লাগিল।

সরোজিনী প্রণাম করিতেই বৃদ্ধা তাহার মাথায় হাত দিয়া কহিল, বেঁচে থাক, ধর্ম বজায় রেখে চ'লো মা। তারপর সরোজিনী উঠিয়া দাঁড়াইতেই, হাতড়াইয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমু খাইয়া কহিল, কিছু দুঃখ ক'রো না, তুমি আমার পেটের মেয়ে হ'লেও এই করতাম, আর একা তো তোমাকে থাকতে হবে না, মন্নুরা সব রয়েছে—

বৃদ্ধাকে ধরাধরি করিয়া পালকিতে চড়াইয়া দিতেই বেহারারা পালকি তুলিয়া লইয়া রওনা হইয়া গেল। রাধানাথ ও মাতুল পালকির পিছনে পিছনে চলিল।

সরোজিনী আমাকে দেখিয়া গম্ভীর মুখে কহিল, দাদা, আসুন।

মন্নু, প্রকাশ ও আমি সরোজিনীর পিছু পিছু বাড়ি ঢুকিলাম।

ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম, মিণ্টা বারান্দার এক প্রান্তে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, মুখখানি বিষণ্ণ ও মলিন। ইহার মধ্যে স্নান করিয়াছে, পরিধানে সরোজিনীরই একখানি নরুন-পাড় ধুতি।

সরোজিনী একখানা আসন পাতিয়া দিতেই জুতা খুলিয়া বসিলাম। মণীন্দ্র ও প্রকাশ উঠানে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রশ্ন করিলাম, তোমার শাশুড়ীকে খবর দিলে কে?

তিক্ত হাসি হাসিয়া সরোজিনী কহিল, খবর দেবার আবার লোকের ভাবনা!—বলিয়া রান্নাঘরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। রান্নাঘরের বারান্দায় মণীন্দ্রের স্ত্রী পুত্রকন্যা-পরিবৃতা হইয়া বসিয়া ছিল।

সরোজিনী কহিল, দাদা, বউদিদিরাও যাবে বলছে।—বলিয়া ওষ্ঠ ও ভ্রূ একবার কুঞ্চিত করিল।

মণীন্দ্রের দিকে তাকাইয়া কহিলাম, তাই নাকি মন্নুদা?

মণীন্দ্র আমতা আমতা করিয়া কহিল, মানে দু-চার দিনের জন্যে আর কি। একটা কিছু ব্যবস্থা হ'লেই আবার ফিরে আসব সব। ব্যাপারটা

ভারি অসামাজিক কিনা, শেষে প্রাশ্চিত্তির হাঙ্গামায় প'ড়ে যেতে হবে। তবে ভিণ্টেটাকে রেখে যাচ্ছি।

সরোজিনী তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, কাউকে রেখে যাবার দরকার নেই, ছেলেপিলের হাঙ্গামা আমার সহ্য হবে না এখন।

মণীন্দ্র চোখ দুইটা ডাগর করিয়া কহিল, আরে! হাঙ্গাম কিসের? আমি দুবেলা আসব, রাত্রে শোব এসে।

সরোজিনী প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না না, সব নিয়ে যাও, কাউকে এখানে থাকতে হবে না।—বলিয়া রান্নাঘরের দিকে আর একবার অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া মিণ্টাকে ডাকিয়া কহিল, মিণ্টা, এস।

মিণ্টা ধীরপদে নতমুখে আসিয়া কাছে দাঁড়াইতেই কহিল, চল, একটু ঘুমোবে চল।

প্রকাশকে কহিল, প্রকাশ, শোন, একটা কথা আছে। প্রকাশ ও মিণ্টাকে সঙ্গে লইয়া সরোজিনী দোতলায় চলিয়া গেল।

মনু কাছে আসিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, দেখ কাণ্ড! ছুঁড়ী চলল ঘুমোতে আর ছোঁড়া চলল বুঝি মাথায় হাত বুলোতে! এই সব দেখতে পারে কোন সতী-সাবিত্রী মেয়েমানুষ? তোমার বউদিদি তো হাঁপিয়ে উঠেছে, বলছে, একদণ্ড থাকব না এ বাড়িতে, এখনই নিয়ে চল।

চুপ করিয়া থাকিলাম।

মণীন্দ্র আরও কাছে সরিয়া আসিয়া কণ্ঠস্বর মৃদুতর করিয়া কহিল, ভিণ্টেটাকে কোন রকমে রেখে যেতে হবে। না হ'লে যে রকম রেগেছে, হয়তো পকাটাকেই পুষ্যি নিয়ে সব লিখে দেবে।

দোতলার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কহিল, কি রকম হ্যাওটো ছেলের মত পায়ে পায়ে ঘুরছে, দেখেছ? বদ মতলব আছে হারামজাদার। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, হবে না কেন? কার ভাগ্নে?

মামাই কম হানা দিয়েছিল? মা কালীর কৃপায় যদি সরলো তো ভাগনে এসে জুটেছে। মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, মুশকিলে ফেলেছে যা হোক।

সরোজিনী আসিয়া হাজির হইতেই মণীন্দ্র স্বাভাবিক ভাব ধারণ করিল। রান্নাঘর হইতে একটা মেয়ে প্যানপেনে স্বরে কহিল, বাবা, চল, রোদ হয়ে যাচ্ছে যে।

মণীন্দ্র কহিল, আমি আসি তা হ'লে ওদের রেখে। এখনই ঘুরে আসছি। ভিণ্টেটাকে তা হ'লে রেখেই যাই। ভারি ন্যাওটো কিনা তোমার। না দেখলে হেদিয়ে যাবে।

সরোজিনী কহিল, না না, এখন যাক।

মণীন্দ্র কিঞ্চিৎ আশান্বিত হইয়া কহিল, বেশ। এখন চলুক তা হ'লে। কান্নাকাটি করলে নিয়ে আসব কিন্তু। ভারি ঝোঁকী ছেলে কিনা। একবার ঝোঁক ধরলে থামানো যায় না। তা ছাড়া পিসীমা-অন্ত প্রাণ, এক দণ্ড না দেখলে অস্থির হয়ে পড়ে।—বলিতে বলিতে রান্নাঘরের দিকে প্রস্থান করিল।

কিছুক্ষণ পরে মণীন্দ্ররা চলিয়া গেল। সরোজিনী কহিল, কোথায় গিয়েছিলেন সকালে?

কহিলাম, দারোগাবাবুর কাছে। মিণ্টা ফিরে এসেছে, ব'লে এলাম। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সরোজিনীকে কহিলাম, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ব'স না।

সরোজিনী কহিল, না, বসব না, রান্না-বান্না করতে হবে তো। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সরোজিনী কহিল, দারোগাবাবু কিছু হদিস করতে পেরেছেন?

চাপিয়া গিয়া কহিলাম, তা জিজ্ঞাসা করি নি। কথাবার্তার মোড়টা

ঘুরাইয়া দিবার জন্য কহিলাম, তিন্থর চেলারা যে আগে পাহারা দিত, আজকাল দেয় না ?

সরোজিনী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

মৃদু হাসিয়া কহিলাম, রাগ করেছে বোধ হয়, তিন্থর বিয়ে দিয়ে দিলে, আর ওদের—

সরোজিনী মৃদু হাসিয়া কহিল, এতগুলির ব্যবস্থা কি ক'রে করি বলুন ? ফুটি তো মাত্র একটি। তাও আর একটির ব্যবস্থা কোন রকমে করছি।

আন্দাজে কথাটার অর্থ বুঝিয়া, না-বোঝার ভান করিয়া কহিলাম, মানে ?

প্রকাশ মিণ্টাকে বিয়ে করবে বলেছে।

কৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত কহিলাম, সে কি ! তা হ'লে তো সমাজ, এমন কি গ্রামও ছাড়তে হবে ওদের।

সরোজিনী গম্ভীরমুখে কহিল, তা হবে। আর হ'লেও, ওদের যাতে কোনও অসুবিধে না হয়, তার ব্যবস্থা আমি করব।

কহিলাম, গাঁয়ের লোক তা হ'লে তোমার ওপর আবার চ'টে যাবে, তোমার শাশুড়ীও রাগ করবেন।

সরোজিনী গম্ভীরমুখে কহিল, কি করব বলুন ? মেয়েটাকে ভাসিয়ে দেবার মত উদারতা আমার নেই। আমার গুরুদেব কি বলেন, জানেন ? পৃথিবীতে মানুষ আসে দুদিনের জন্যে আনন্দ করতে, যে যতটা পার আনন্দ লাভ কর, আনন্দ দান কর। কাউকে আনন্দ-লাভ থেকে বঞ্চিত করবার মত পাপ আর নেই।

কহিলাম, আমি তো বুঝলাম, ওরা তা বুঝবে না।

সরোজিনী তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, না বুঝলে আমার কিছু এসে যাবে না। তা ছাড়া আমিও—। বলিয়াই চুপ করিয়া গেল।

আমি কহিলাম, আজ বিকেলে দারোগাবাবু আসবেন।

ঔৎসুক্যের সহিত সরোজিনী কহিল, কেন?

কহিলাম, মিণ্টাকে দু-চার কথা জিজ্ঞাসা করবেন। মিণ্টা তো কিছু জানতে পারে নি বলছে, নয়?

সরোজিনী কহিল, হ্যাঁ, তাই তো বলছে।

সেই দিন সন্ধ্যায় গাঙুলী মশায়ের বাড়ি গিয়া দেখিলাম, বৈঠকখানায় একা বসিয়া আছেন; মাথাটি ন্যাড়া, মুখের গোঁফ দাড়ি পরিষ্কার করিয়া চাঁছা; ভ্রূ দুইটি কোন রকমে টিকিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রায়শ্চিত্ত করলেন বুঝি?

গাঙুলী মশায় ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, হ্যাঁ। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, ম্লেচ্ছের সঙ্গে ব'সে খাওয়া—প্রায়শ্চিত্ত করলেও এর পাপ যায় না। এতবড় একদলা গোবর খেয়েছি। ডান হাতের আঙুলগুলি বাঁকাইয়া দলার আয়তন জ্ঞাপন করিলেন। তারপর কহিলেন, আসছে ভাদ্র মাসে ত্রিবেণীতে গিয়ে গঙ্গাস্নান ক'রে আসব, তর্পণটাও সেরে আসব।

কহিলাম, রাধানাথ প্রায়শ্চিত্ত করলে না?

করবে তো বলেছিল আজ।

কহিলাম, বুড়ীকে তো ওরা সকালে নিয়ে এসেছে আজ।

হুঁ।—বলিয়া গাঙুলী মশায় গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ পরে কহিলেন, একটা খোরপোষের মামলা কাঁদবে বোধ হয়।—বলিয়া সখেদে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

কহিলাম, মন্নুরাও তো ও-বাড়ি থেকে চ'লে এসেছে।

গাঙুলী মশায় ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, জানি। ভালই করেছে। কোন হিন্দুর ছেলেরই তো ও-মাগীটার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। ওর বাড়ি যাওয়া-আসা করাও উচিত নয়। আবার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, একটা মেয়েকে নষ্ট করলে, আরও কত মেয়েকে নষ্ট করবে কে জানে! ও পাপ গাঁ থেকে বিদেয় না হওয়া পর্যন্ত গাঁয়ের মঙ্গল নেই।

দিদিমা এক পেয়ালা চা লইয়া ঘরে ঢুকিলেন। আমাকে দেখিয়া কহিলেন, ওমা! তুমি আবার কখন এলে? দাদামশায়কে পেয়ালাটা দিয়া কহিলেন, তুমি একটু ব'স ভাই। তোমার জন্যেও আনছি।

কহিলাম, আমি খেয়ে আসছি, আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না।

দিদিমা কহিলেন, বাঃ রে! তা কি হয়? বুড়ো সামনে ব'সে খাবে, আর তুমি ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকবে!—বলিয়া প্রস্থান করিলেন। কিছুক্ষণ পরে দিদিমা এক বাটি চা আনিয়া আমাকে দিলেন; তারপর দাদামশায়ের সামনে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ তাঁহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া, মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন, মাথাটা কেমন দেখাচ্ছে, দেখেছ? যেন ছাড়ানো ঝুনো নারকোল। পরের বাড়িতে এক পাত খাওয়ার জন্যে এই শাস্তি! এই বুড়ো বয়েসে কেন যে এত লোভ!

গাঙুলী মশায় প্রতিবাদ করিলেন, লোভ কিসের? আমি কি ইচ্ছে ক'রে খেয়েছি?

দিদিমা ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, রাম বল। আমি কি তাই বলছি? তুমি যে নিজে খাবার লোক নও, তা কি আমি জানি না? ছুঁড়ী তোমাকে জোর ক'রে ঘাড়ে ধ'রে খাইয়ে দিয়েছে।

গাঙুলী মশায় নিরুপায়ভাবে কহিলেন, না বুঝলে কি করব? নাতি তো সব জানে। হাকিম জোর ক'রে খাওয়ালে—

দিদিমা রুষ্টকণ্ঠে কহিলেন, ও-রকম মুখপোড়া হাকিমের কাছে যাওয়া কেন ?

কি করব, চাকরি যে !

দিদিমা মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন, চাকরির মুখে ঝাঁটা ! এক পয়সা তো মাইনে নেই। ছেড়ে দাও ওই উপোসী চাকরি।

মৃদুভাবে ঘাড়টি নাড়িতে নাড়িতে দুঃখের হাসি হাসিয়া গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, ছাড়তে হবে না গিন্নী, ছাড়িয়ে দেবে। ওই আজিজ সাহেব যা উঠে প'ড়ে লেগেছে, বেশি দিন থাকতে দেবে না আমাকে।

ঢেকুর তুলিতে তুলিতে রাধানাথ আসিয়া হাজির হইল। গোঁফ-দাড়ি কামানো, মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা। গাঙ্গুলী মশায় জিজ্ঞাসা করিলেন, করলে ?

রাধানাথ কহিল, হ্যাঁ, হাঙ্গামা চুকিয়ে দেওয়াই ভাল। সকালে বুড়ীকে আনার ব্যবস্থা করতে হ'ল। তাতেই আরম্ভ করতে দেরি হয়ে গেল। শেষ হতে চারটে বাজল। এই তো খেলাম।—বলিয়া ঢেকুর তুলিল।

প্রশ্ন করিলাম, মাথা ন্যাড়া করলে না ?

রাধানাথ গম্ভীর হইয়া কড়া গলায় কহিল, না, মূল্য ধ'রে দিয়েছি। —বলিয়া মুখ ও চোখের ভঙ্গী দ্বারা আমাকে একেবারে নস্যাৎ করিয়া দিয়া গাঙ্গুলী মশায়কে কহিল, অনুকূল-মামা এখন পেছচ্ছে যে !

গাঙ্গুলী মশায় উৎসাহিত হইয়া কহিলেন, মানে ?

বলছে, অনেক খরচ, অনেক টানা-পোড়েন করতে হবে ; এমনিই অনেকদিন কামাই হয়ে গেছে। স্কুল থেকে পুরোপুরি মাইনে পাওয়া যাবে না।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, খরচপত্র টানা-পোড়েন সে তো তুমিই সব করবে বলেছ।

তা তো বলেছি ; তবু ওর তো সামনে দাঁড়ানো চাই। তা ছাড়া ও এখানে না থাকলে, বুড়ী আমার বাড়ি থাকতে চাইবে কেন ? কি রকম টেঁকী লোক জানেন তো ?

গাঙ্গুলী মশায় সায় দিয়া কহিলেন, তা তো বটেই। মহেশ গাঙ্গুলীর স্ত্রী। তা আমার কি মনে হয় জান, অনুকূল কিছু নগদ হাতে চায় হয়তো।

রাধানাথ কহিল, আমারও তাই মনে হচ্ছে। মকদ্দমা না হ'লে দিই কি ক'রে ? যদি লুকিয়ে পালায়। অথচ কিছু না দিলে যেতে চাইবে ব'লে মনে হয় না।

কহিলাম, এমনিই তো অনেকদিন বসিয়ে খাইয়েছ। তাতে তো তোমার অনেক খরচ হয়েছে। তার ওপরে কিছু নগদ দিতে আপত্তি কিসের ? নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ! খাইয়ে-দাইয়ে দক্ষিণা না দিলে চলবে কেন ?

রাধানাথ ধমকাইয়া কহিল, যে বিষয়ে কিছু বোঝ না, তাতে কথা কইতে এস না।

চুপ করিয়া রহিলাম। রাধানাথের ভাব দেখিয়া মনে হইল, গাঙ্গুলী মশায়ের সঙ্গে কোন বিষয়ে গোপন পরামর্শ করিতে চায়। কাজেই উঠিয়া চলিয়া আসিলাম।

শুক্লা ত্রয়োদশীর রাত্রি। ইহার মধ্যেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোৎস্না সারা আকাশ কানায় কানায় ভরিয়া দিয়া, উপচিয়া পড়িয়া মাঠ-ঘাট বন-বাদাড় ঝোপ-ঝাপ সব ছাইয়া ফেলিয়াছে, এবং রঙ্গমঞ্চে রূপহীনা প্রৌঢ়া অভিনেত্রী রঙ ও পাউডারের মহিমায় যেমন রূপসী যুবতী বনিয়া

যায়, আমাদের এই কুশ্রী কুৎসিত পল্লীও তেমনই জ্যোৎস্নার মায়া-প্রলেপে অপরূপ সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।

দেখিলাম, তিনু হনহন করিয়া আসিতেছে। আমাকে দেখিয়া কহিল, আপনার কাছেই আসছিলাম।

প্রশ্ন করিলাম, কেন ?

পিসীমা আপনাকে একবার ডাকছেন।

কি জন্যে ?

জানি না।

বাড়িতে ঢুকিতেই সরোজিনী সাগ্রহে কহিল, দাদা, এসেছেন ? আসুন, বসুন। শতরঞ্চি পাতা ছিল, বসিলাম। দেখিলাম, বারান্দায় প্রকাশ দাঁড়াইয়া আছে, পরিধানে গরদের ধুতি ও চাদর (খুব সম্ভব তিনুর) ; তাহারই সামনে লাল-চেলী-পরা মিণ্টা জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে।

সরোজিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিলাম, ব্যাপার কি ?

সরোজিনী হাস্যমুখে কহিল, ওদের বিয়ে আজ, গুরুদেবের সামনে ওদের মালা-বদল হবে।

সবিস্ময়ে কহিলাম, তোমার গুরুদেব এসেছেন নাকি ?

সরোজিনী কহিল, না, ওঁর ছবি রয়েছে ও-ঘরে, আসুন না, দেখবেন।

সঙ্গে গিয়া দেখিলাম, ঘরের মধ্যে একটা বড় চৌকির উপর একজন খাড়া-দণ্ডায়মান প্রৌঢ় ব্যক্তির একখানি বেশ বড় বাঁধানো ফোটো। দীর্ঘ দোহারা গঠন, মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা ; গুম্ফশ্মশ্রুহীন মুখ ; মুখে প্রশান্ত গাম্ভীর্য ; চোখে করুণা, কোমল দৃষ্টি ; পরিধানে আলখাল্লা। বয়স পঞ্চাশের বেশি বলিয়া মনে হয়।

শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসায় সরোজিনীর মুখ ও চোখ উজ্জল হইয়া উঠিল ; গদগদ কণ্ঠে কহিল, আমার গুরুদেব, প্রণাম করুন।

প্রণাম করিলাম।

গুরুদেবের ছবির সামনে ধূপদানিতে ধূপকাঠি ও ধুনুচিতেও ধূনা জ্বলিতেছে। একটি রূপার থালায় প্রচুর বেলফুল, আর একটি থালায় দুইগাছি বেলফুলের মালা। চৌকি হইতে কিছু দূরে দুইটি কম্বলের আসন সামনা-সামনি পাতা।

সরোজিনী ডাকিল, প্রকাশ, তোমরা এস। প্রকাশ ও তাহার পিছু পিছু মিণ্টা ধরে ঢুকিল। প্রকাশের মুখ গম্ভীর, ও সুদৃঢ় সঙ্কল্পে সুকঠিন। মিণ্টার মুখখানি লজ্জায় আরক্ত ও আনত। দুইজনে আসনে গিয়া বসিল। সরোজিনী কাছে গিয়া কহিল, গুরুদেবকে প্রণাম কর। দুইজনেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

সরোজিনী কহিল, সামনে গুরুদেব রয়েছেন, (আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া) ওই তোমাদের এক গুরুজন রয়েছেন। এঁদের সামনে তোমরা প্রতিজ্ঞা কর, চিরদিন দুজন দুজনকে ভালবাসবে, শ্রদ্ধা করবে, সুখে দুঃখে সমভাগী হবে।

দুইজনেই চুপ করিয়া থাকিয়া বোধ করি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল। সরোজিনী কহিল, করলে ?

দুইজনেই ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' জানাইল। সরোজিনী তাহাদের পাশে জানু পাতিয়া বসিয়া মিণ্টার হাত প্রকাশের হাতে তুলিয়া দিয়া কহিল, এর ভার তোমার হাতে দিলাম, গুরুদেবের সামনে তুমি এই ভার নিলে। চিরদিন এই ভার স্নেহের সঙ্গে, শ্রদ্ধার সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে বহন ক'রো। তারপর মালা দুইগাছি লইয়া আসিয়া দুইজনকে এক-একগাছি দিয়া কহিল, দুজনে দুজনকে পরিয়ে দাও।

মালা-বদল সমাপ্ত হইলে সরোজিনী কহিল, গুরুদেবকে প্রণাম কর। দুইজনেই প্রণাম করিল। তারপর সরোজিনী কহিল, তোমাদের মাস্টার মশায়কে প্রণাম কর।

দুইজনেই উঠিয়া আসিয়া একে একে আমাকে প্রণাম করিল। আমি তাহাদের মাথায় হাত দিয়া সত্য সত্যই আশীর্বাদ করিলাম।

বিবাহ হইয়া গেল। সরোজিনী আমাকে বলিল, চ'লে যাবেন না। বিয়ে দেখে মিষ্টিমুখ করতে হয়।—বলিয়া বর-কন্যাকে লইয়া দোতলায় চলিয়া গেল। আমি শতরঞ্জিতে বসিয়া থাকিলাম। অদূরে তিমুও চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। দুই দিন আগে তাহার বিবাহ হইয়াছে; কত ধুমধাম; কত শঙ্খ ও উলুধ্বনি; কত কোলাহল ও আনন্দ; দেবতা ও ব্রাহ্মণকে সাক্ষী করিয়া কত প্রতিজ্ঞা-বাক্য উচ্চারণ! ইহাদের বিবাহে তাহার কিছুই হইল না। শুধু নিস্তব্ধ, ধূপধুনা-সুরভিত কক্ষে একজন সাধু ও সজ্জন ব্যক্তির প্রতিচ্ছায়ার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়া ইহারা পরস্পরকে চিরদিনের জন্য গ্রহণ করিল। সমাজ এই বিবাহকে স্বীকার করিবে না, রাষ্ট্র ইহার দায়িত্ব লইবে না, কিন্তু আমি ইহাকে ঢাক-ঢোল-বাজানো সমাজ-স্বীকৃত বিবাহের চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট বলিয়া ভাবিতে পারিলাম না। যতক্ষণ নর-নারীর হৃদয়ের মধ্যে সত্যকার প্রেমের যোগ থাকে, ততক্ষণই বিবাহ সার্থক ও সত্য, সে বিবাহের মন্ত্র পড়া হউক আর নাই হউক, দেবতা ও পুরোহিত সাক্ষী থাকুক আর নাই থাকুক। কিন্তু যে মুহূর্তে প্রেমের মৃত্যু হয়, সেই মুহূর্তেই উদ্বাহ-বন্ধন উদ্বন্ধন হইয়া উঠে। সমাজ ও রাষ্ট্র যতই এক পক্ষের পিঠ চাপড়াক এবং অন্য পক্ষের প্রতি চোখ রাঙাক, বন্ধন কাটিয়া না ফেলিলে আমরণ পলে পলে শ্বাসরোধের নিদারুণ যন্ত্রণা-ভোগ ছাড়া কাহারও আর কোনও গত্যন্তর থাকে না।

সরোজিনী আসিয়া কহিল, একটু মিষ্টিমুখ করতে হবে।

তা তো করব, কিন্তু এদের উপায় হবে কি ?

সরোজিনী কহিল, কিছু ভাববেন না। গুরুদেবের সামনে যে কাজ হয়েছে, তার সব ভার তিনিই নিবেন।

কহিলাম, যদি ভবিষ্যতে এদের মনের মিল না হয়, অথচ স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বাস করার ফলে, অর্থাৎ—

সরোজিনী গম্ভীরমুখে কহিল, আপনার বক্তব্য বুঝতে পেরেছি ! একটা আইনসঙ্গত বিবাহের ব্যবস্থা পরে করব, এখন এইটে হয়ে থাক !

২২

পরের দিন স্কুলে যাওয়া-আসা ছাড়া কোথাও যাই নাই, কাহারও খোঁজ-খবর রাখি নাই। তার পরদিন সকাল আটটার সময়ে মণীন্দ্র হাজির হইল। অত্যন্ত নেতিয়ে-পড়া ভাব। কহিলাম, কি ব্যাপার ?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, সরোজরা কাল চ'লে গেল।

সবিস্ময়ে কহিলাম, কখন ?

কাল রাত তিনটেয় ?

যেখানে ছিল, সেখানেই গেল নাকি ?

ঘাড় নাড়িয়া মণীন্দ্র কহিল, না, শহরে।

আশ্বস্ত হইয়া কহিলাম, ওঃ। তোমার দীর্ঘনিশ্বাসের বহর দেখে ভাবছিলাম, বুঝি দেশ ছেড়ে চ'লে গেল। তা আগে তো শুনি নি যাবার কথা !

মণীন্দ্র কহিল, আমিও জানতাম না। আজকাল প্রকাশের সঙ্গেই সব পরামর্শ। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কাল সকালে প্রকাশ

আজিজ সাহেবের সঙ্গে জেলায় গিয়ে বাড়ি ভাড়া ক'রে, ঠাকুর-চাকর ঠিক ক'রে, একটা বাস ভাড়া ক'রে আনে।

বাস কেন?

জিনিসপত্র সব নিয়ে চ'লে গেছে যে। এখানে আর থাকবে না বোধ হয়। বাড়ি তালা-বন্ধ থাকবে।

কে কে গেছে?

সরোজিনী, মিণ্টা, প্রকাশ, আর আমার জামাতা বাবাজীটিও গেছেন বরকন্দাজ হয়ে বোধ হয়। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আমার ভিণ্টের কোন ব্যবস্থা হ'ল না।

কহিলাম, ফুন্টির বিয়ে হয়ে গেছে তো।

মণীন্দ্র কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া কহিল, তবে তো আমার চতুর্বর্গ ফললাভ হয়েছে। যা দিয়েছে, তা তো পরের ঘরে উঠেছে, আমার কি লাভ হয়েছে, শুনি? সক্ষোভে কহিল, তোমার বউদিদিটি যত নষ্টের গোড়া কিনা! বেশ হাতের বশ ক'রে নিয়ে এসেছিলাম, দিলে সব মাটি ক'রে। নে, তোর হিন্দুয়ানি নিয়ে থাক্। কোথাকার কে একটা ছোঁড়া—সেই সব মেরে দিয়ে চোখের সামনে পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে থাক।

কে?

কেন, ওই পকা, ওকেই সব দেবে, তুমি দেখে নিও। তিমু যতই পিছু পিছু ঘুরুক না, ছিটেফোঁটাও ওর ভাগ্যে জুটবে না—আমি ব'লে দিচ্ছি।—বলিয়া একদৃষ্টে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল।

কহিলাম, আজিজ সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করেছে বোধ হয়।

ঘাড় নাড়িয়া মণীন্দ্র কহিল, হুঁ, তা করেছে বইকি। ও-ই এখন ওর প্রাণের বন্ধু। কোন একটা কেলেঙ্কারি বাধিয়ে না বসে! কোন বিশ্বাস

নেই, ও সব করতে পারে। মাথার ওপর গার্জেন তো আর কেউ নেই। আমি ছিলাম একজন, তাকেও তো নামিয়ে দিলে। তা ছাড়া মেলা টাকা হাতে। প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, একটু মন রেখে চলতে পারলে সব ভিণ্টের হ'ত ভাই, তোমরা কজনে মিলে দিলে সব মাটি ক'রে।

জবাব দিলাম না।

মণীন্দ্র কতকটা সামলাইয়া লইয়া কহিল, রাধানাথ ও অনুকূল বুড়ো নাকি জেলায় গেছে খোরপোষের মকদ্দমা কাঁদবার জন্যে।

তাই নাকি?

হুঁ, কিন্তু কিছু হবে না। উকিল পেলে তো! সরোজিনী এতক্ষণ সব হাত ক'রে নিয়েছে, দেখগে।

কহিলাম, আমার মনে হয়, মকদ্দমার তদ্বিরের সুবিধের জন্যেই ওখানে গেছে। তা ছাড়া মিণ্টা—

বাধা দিয়া, সারা মুখ বিরক্তিতে কুঞ্চিত করিয়া, প্রসারিত ডান হাতটা আমার মুখের সামনে নাড়িতে নাড়িতে কহিল, ওর নাম ক'রো না, ওর নাম শুনলে আমার গায়ের রক্ত মাথায় উঠে ঘুরপাক খেতে থাকে।

কেন?

এবার পুরোপুরি উত্তেজিত হইয়া মণীন্দ্র দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া কহিল, কেন? ওই মেয়েটাই আমার শনি, ও যদি না সেদিন ফিরে আসত, তা হ'লে কি আমাদের ওখান থেকে চ'লে আসতে হ'ত, না, মকদ্দমাই হ'ত? সারা গাঁ তো একচেটে ক'রে এনেছিলাম আমি। আর কিছু-দিন গেলে ওই গাঙ্গুলী, রাধানাথ পর্যন্ত নাকে খত দিয়ে লুটিয়ে পড়ত পায়ের তলায়। ডান হাতের প্রসারিত তর্জনী নাড়িতে নাড়িতে কহিল,

অত্যন্ত বদমায়েস ওই মেয়েটা। গেলি তো আর ফিরে আসবার কি দরকার ছিল? আর ফিরে এলি তো, লোকের বাড়ি ঢুকলি কেন? তোর রূপ-যৌবন আছে, শহরে গিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করলেও একটা পেট চ'লে যেত। দম লইয়া কহিল, তা যাবে কেন? বামুনের সর্বনাশ করা চাই তো! কলিকাল যে! ধর্মাধর্ম জ্ঞান কি পৃথিবীতে আর কারও আছে?

২৩

দিন দুই পরে রাত্রি আটটার সময়ে তিনু আসিয়া দেখা করিয়া একটা চিঠি হাতে দিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, কখন এলে?

তিনু কহিল, এই আসছি।

কি খবর সব?

চিঠিতে জানতে পারবেন।—বলিয়া চলিয়া গেল।

চিঠি সরোজিনীর। লিখিয়াছে—

প্রণামন্তে নিবেদন,

দাদা! তাড়াতাড়িতে আপনার ও বউদিদির কাছে বিদায় লইয়া আসিতে পারি নাই। ছোট বোনের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

আমার স্বনামে ও স্বামীর নামে এখানকার যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি আজিজ সাহেবকে বিক্রয় করিলাম। শুধু তিনুকে কুড়ি বিঘা জমি ও বাড়িটা দিলাম। বাড়িতে সে বাস করিবে মাত্র। তা ছাড়া তাহাকে আরও পাঁচশো টাকা দিলাম—দুশো টাকা লাইব্রেরির জন্য—দুশো টাকা গ্রামের গরিব-দুঃখীদের জন্য একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য, এবং একশো টাকা গ্রামের ছেলেদের কুস্তির আখড়ার জন্য।

লাইব্রেরি ও দাতব্য চিকিৎসালয় আমার বৈঠকখানাতেই হইবে। এ সম্বন্ধে দলিলে উল্লেখ করিয়া দিয়াছি। এ দুটি যদি ভাল করিয়া চলে তো ভবিষ্যতে আরও অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থা করিব। আপনার কাছে একান্ত অনুরোধ, আপনিও এ দুটির প্রতি একটু দৃষ্টি রাখিবেন।

শুনিতেছি, রাধানাথ আমার শাশুড়ীকে উসকাইয়া খোরপোষের মামলা রুজু করিবার চেষ্টা করিতেছে। আশা করি, আজিজ সাহেবের সঙ্গে তাহাদের একটা মিটমাট হইবে। শাশুড়ী ঠাকরুণের জন্য সত্যই আমার কষ্ট হয়। তাঁহার জন্যই গুরুদেবের আদেশ অমান্য করিয়া দেশে আসিয়াছিলাম। তিনি আমাকে ত্যাগ না করিলে, আমি কোন দিন তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিতাম না। তবে তাঁহার যদি এখনও সুমতি হয়, তাহা হইলে তথাকথিত আত্মীয়-বন্ধুদের ত্যাগ করিয়া নিজের বাড়িতে তিনুর সঙ্গে বাস করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে তিনুকে উপদেশ দিয়া আসিয়াছি এবং তাঁহার সমস্ত খরচ বহন করিতে প্রস্তুত আছি।

চিরদিনের জন্য দেশ ছাড়িয়া চলিলাম। প্রকাশ ও মিণ্টাকেও সঙ্গে লইলাম। যাহাতে তাহারা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা আমি করিব। সুখ ও শান্তির আশায় দেশে ফিরিয়াছিলাম, তাহার বদলে পাইলাম দুঃখ, বেদনা, কলঙ্ক ও অপমান। সব হয়তো একদিন ভুলিতে পারিব, কিন্তু আপনাদের স্নেহ কোন দিন ভুলিব না। আপনারা আমাকে ভুলিবেন না—এ আশা করা অবশ্য আমার পক্ষে ধৃষ্টতা।

আপনি ও বউদিদি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণতা

সরোজিনী

পরের দিন মণীন্দ্রের সহিত দেখা হইতেই হাত নাড়িয়া কহিল, জামাই নয়, শত্রু। তোর পিতৃতুল্য আমি আর ভ্রাতৃতুল্য ভিণ্টে, তারা বঞ্চিত হ'ল, আর তুই হাত পেতে বাড়ি আর জমি নিলি কি ক'রে? সহ্য হবে না, দেখো। বামুনের হকের ধন কারও সহ্য হয় না। তা ছাড়া ওই বাড়িতে বাস করবে কি ক'রে? ব্রহ্মদত্যি আছে যে! আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

গাঙ্গুলী মশায়ের বৈঠকখানায় গিয়া দেখিলাম, রাধানাথ মাথায় হাত চাপড়াইতেছে। আজিজ সাহেব জমিদারি কিনিয়াছে শুনিয়া অনুকূল-মামা পলায়ন করিয়াছে। লইয়া গিয়াছে রাধানাথের মানিব্যাগ ও তৎগর্ভস্থ তিনখানা দশ টাকার নোট ও দুই টাকার রেজকি এবং রাধানাথের সদ্যক্রীত নূতন মটকার চাদরটি। রাখিয়া গিয়াছে একটি চিঠি ও তাহার নিজের ছিন্ন ও মলিন খয়ের-রঙের খদ্দরের চাদরটি। চিঠিতে লিখিয়াছে :—

কল্যাণীয় রাধানাথ বাবাজী,

মকদ্দমায় কিছু ফল হইবে না। হইলেও মজুরি পোষাইবে না। মিছামিছি এই কদিন বেকার বসিয়া থাকিয়া আমার অনেক ক্ষতি হইয়া গেল। তাহারই আংশিক ক্ষতিপূরণস্বরূপ তোমার টাকা সমেত মানি-ব্যাগটি লইয়া চলিলাম, এবং পাছে আমরা পরস্পরকে কোনও দিন ভুলিয়া যাই, এই ভয়ে স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তোমার চাদরটি লইয়া চলিলাম এবং আমারটি রাখিয়া গেলাম। ভগবান তোমার মনে শান্তি বিধান করুন।

আশীর্বাদক

অনুকূল শর্মা

পুঃ—দিদিকে তোমার আশ্রয়েই রাখিয়া গেলাম। এ বয়সে টানা-হেঁচড়া সহ্য করিতে পারিবেন না। তা ছাড়া বেশিদিন বাঁচিবেনও না।

তবে যে কয়টা দিন বাঁচিবেন, তুমিই তাঁহার ভার বহন করিও। একজন উপযুক্ত লোকের স্কন্ধে তাঁহাকে রাখিয়া যাইতেছি, ইহা ভাবিয়া অত্যন্ত নিশ্চিন্ত বোধ করিতেছি। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী—তোমার মাতুল

কহিলাম, এত অসাবধানে টাকাকড়ি রাখ কেন?

রাধানাথ খ্যাঁক করিয়া উঠিল, অসাবধান মানে? মাস্টার মানুষ যে জোচ্চোর হয়, তা জানব কি ক'রে? ওর কাছে টাকা আর চাদর রেখে পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিলাম, এসে দেখি এই ব্যাপার! ওর চাদর, আর চিঠিটা প'ড়ে, আর আমার টাকা চাদর সমেত নিজে লোপাট।

গাঙুলী মশায় কহিলেন, মকদ্দমা তা হ'লে করবে না?

রাধানাথ সক্ষোভে কহিল, মকদ্দমা মাথায় থাক্, নিজেকে সামলাব কি ক'রে, তার ঠিক নেই। খতগুলো পর্যন্ত আজিজ সাহেবকে বিক্রি ক'রে গেছে। আমার তো জানেন—? বলিয়া চক্ষের ইঙ্গিতে গাঙুলী মশায়কে বক্তব্য বুঝাইয়া দিল।

গাঙুলী মশায়ের মুখও এক মুহূর্তে শুষ্ক ও বিবর্ণ হইয়া উঠিল; কহিলেন, সত্যি! মহা বিপদ!—বলিয়া বোধ করি নিজের কোন আসন্ন বিপদের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া গেলেন।

২৪

মাসখানেক পরে প্রকাশের এক চিঠি পাইলাম। লিখিয়াছে—

আমরা নিরাপদে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, এবং মাসীমা ও মেসোমশায়ের আশ্রয়েই আছি। মেসোমশায় মানে—মাসীমার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী। মাস তিনেক আগে এঁর সঙ্গে তিন আইন মতে

মাসীমার বিবাহ হইয়াছে। মেসোমশায় এখানকার রেলওয়ে হাসপাতালের প্রধান ডাক্তার—নাম, মিঃ ব্রিজলাল ত্রিবেদী। এখানে খুব পসার, মাসে অনেক টাকা রোজগার করেন। চেহারা যেমন চমৎকার, ব্যবহারও তেমনই অমায়িক। আমাদের দুইজনকে অত্যন্ত স্নেহ ও সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। রেলওয়ে হাসপাতালে আমাকে একটি চাকরি করিয়া দিবেন বলিয়াছেন। তবে যতদিন তাহা না জুটে, ততদিন এখানে মাসীমার যে ঔষধের দোকান আছে, সেখানে কাজ করিতেছি। বেতন মাসে ত্রিশ টাকা। যতদিন হাসপাতালে চাকরি না পাই, ততদিন মাসীমার এখানেই থাকিব, পাইলে পৃথক বাসা করিব।

মিণ্টাকে তিন আইন মতে বিবাহ করিয়াছি। আমার দিক হইতে কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু মেসোমশায় জেদ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, বিবাহে সমাজের সম্মতি না লইলেও, ভবিষ্যৎ সন্তান-সন্ততির জন্য রাষ্ট্রের সম্মতি প্রয়োজন। তাই গুরুদেব নিজে বিবাহ দেওয়া সত্ত্বেও উঁহারা এই মতেই বিবাহ করিয়াছেন।

মায়ের সঙ্গে ও আপনাদের সঙ্গে বোধ হয় আমাদের আর দেখা হইবে না, এই ভাবিয়া মাঝে মাঝে মনটা কেমন করিয়া উঠে, বিশেষ করিয়া মায়ের জন্য। যে পথে চলিয়াছি, আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু তাঁহার একমাত্র পুত্র হিসাবে আমার কর্তব্য আমি কোন দিন ভুলিব না। তিনি যাহাতে কাহারও গলগ্রহ না হইয়া স্বাধীনভাবে স্বগৃহে বাস করিতে পারেন, সর্বাগ্রে আমি তাহার ব্যবস্থা করিব। মিণ্টা ও মাসীমার তাহাই মত। তাঁহার মাসিক খরচ হিসাবে আমি প্রত্যেক মাসে কিছু টাকা আপনার কাছে পাঠাইয়া দিব। আপনি মাকে বুঝাইয়া তাহা লইতে সম্মত করাইবেন। বাড়ি তৈয়ারি করিবার টাকা সংগ্রহ করিতেছি। মিণ্টা মাসীমার কাছে

ধার করিতে বলিতেছে। খুব সম্ভব তাহাই করিব, এবং টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলে আপনার কাছেই পাঠাইয়া দিব। মামা আমাদিগকে যে জায়গা দিবেন বলিয়াছেন, সেইখানে আপনি মায়ের জন্ত একটি বাড়ি তৈয়ারি করাইয়া দিবেন।

আপনি ও মামীমা আমার ও মিণ্টার প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনার স্নেহের কথা ভুলিব না। মা আসিয়াছেন কি? আপনি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবেন এবং আমার প্রণাম জানাইবেন।

প্র:

প্রকাশ

চিঠিটি গাঙুলী মশায়ের কাছে পাঠাইয়া দিয়া স্কুলে গেলাম। ফিরিয়া আসিতেই পত্নী কহিলেন, ওগো, আজ আবার চণ্ডীমণ্ডপে ডাক পড়েছে।

সন্ধ্যায় চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া দেখিলাম, গাঙুলী মশায় ও রাধানাথ একটা ছোট শতরঞ্জিতে পাশাপাশি বসিয়া আছেন; গাঙুলী মশায় তামাক খাইতেছেন। মুখের ভাব প্রফুল্ল।

আমাকে দেখিয়া কহিলেন, এস ভায়া, শুনেছ খবর?

কহিলাম, কি?

দারোগা ও ডাক্তার দুজনেই তো চলল। নতুন দারোগা আসছে, একেবারে খাঁটি কুলীন বামুনের ছেলে।

তাই নাকি?

ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, দারোগা ভারি বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল কিনা। আমাদের মত ওদের স্ত্রী তো নয়, বেগম। তার ওপর বড়লোকের বোন, লাট-সাহেবের মন্ত্রীরা পর্যন্ত ওঁর ভাইয়ের হাত-ধরা। স্বামীর বেচাল দেখে চিঠি লিখে এখান থেকে সরিয়ে নিলেন।

কহিলাম, ডাক্তারের অপরাধ ?

ডাক্তারের মাথা সেই খ্রীষ্টান মাগীই খেয়ে গেছে এস. ডি. ও.র কাছে ওর নামে নালিশ ক'রে।

মনে পড়িল, কিন্তু চুপ করিয়া রহিলাম।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, যাক, ভালই হ'ল। পেত্নীটা গাঁ থেকে সরেছে। এ ছুটোও সরলো, এর পর গাঁয়ে শান্তিতে বাস করা যাবে।

রাধানাথ কহিল, ডাক্তার তো লোক মন্দ ছিল না।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, না না ভায়া। তোমরা জান না, ভারি পেট-আলগা লোক ছিল। এর কথা তাকে, তার কথা একে ক'রে অনেক নটখটি বাধাত। যাচ্ছে, ভাল হয়েছে।

দোলগোবিন্দ কাশিতে কাশিতে আসিয়া হাজির হইতে গাঙ্গুলী মশায় ও রাধানাথ দুইজনেই গম্ভীর হইয়া উঠিল। দোলগোবিন্দ কাছে আসিয়া গাঙ্গুলী মশায়ের হস্তস্থ হুঁকাটির দিকে হাত বাড়াইতেই রাধানাথ হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল।

ছোঁবেন না, বামুনের হুঁকো।

দোলগোবিন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া কহিল, আমি কি বামুন নয়, না—

বাধা দিয়া রাধানাথ কহিল, আপনার জাত নেই। সামাজিকভাবে খ্রীষ্টানের বাড়িতে খেয়ে এলে কি কারও জাত থাকে ? আমরা প্রায়শ্চিত্ত করলাম কেন তা হ'লে ?

দোলগোবিন্দ ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, তার মানে ?

একটু পরেই শুনতে পাবেন, বসুন ওখানে।—বলিয়া রাধানাথ খালি মেঝের দিকে হাত বাড়াইয়া দোলগোবিন্দের বসিবার জায়গা নির্দেশ করিল।

একে একে সকলে আসিয়া হাজির হইল, মায় মধু চক্রবর্তী ও বীরু

আচাৰ্য্যি পৰ্যন্ত। মহিলামহলও সদলবলে উপস্থিত। দেখিলাম, পদ্মও ফিরিয়াছে, শুকমুখে সৌদামিনীর পাশে বসিয়া আছে।

গাঙুলী মশায় গম্ভীরভাবে কহিলেন, একটা চিঠি এসেছে, প্রকাশ লিখেছে।—বলিয়া চিঠিটি ফতুয়ার পকেট হইতে বাহির করিলেন। প্রকাশ লিখিয়াছে শুনিয়াই পদ্ম কহিল, কি লিখেছে দাদামশায়, আমার খোকা? কি লিখেছে দাদামশায়?

গাঙুলী মশায় তাহার কথার জবাব না দিয়া প্রকাশের চিঠির সারমর্ম নিজের ভাষায় বলিতে লাগিলেন. প্রকাশ লিখেছে যে, সরোজিনী যে এখানে এসে নিজেকে হিন্দু বিধবা ব'লে পরিচয় দিয়েছিল, তা মিথ্যে। সে এখানে আসবার আগেই খ্রীষ্টানী মতে একজন লোককে বিয়ে করেছিল।

সমস্ত সভা আৰ্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, সত্যি? তবে কি হবে?

গাঙুলী মশায় কহিলেন, সত্যি কি না এই চিঠি পড়লেই বুঝতে পারবে।—বলিয়া চিঠিটা হাত বাড়াইয়া আগাইয়া দিলেন। চিঠি পড়িবার আগ্রহ না দেখাইয়া সকলে কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

রাধানাথ কহিল, গাঁ-সুদ্ধু সকলকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। পোলাও মাংস খাবার মজাটা বোঝ সব।—বলিয়া হিংস্র আনন্দে সারা মুখ বিস্ফারিত করিয়া চোখের তারা দুইটা এদিক্‌ওদিক ফিরাইতে লাগিল।

আগামী প্রায়শ্চিত্তের ধকল ও খরচের কথা স্মরণ করিয়া সভাস্থ সকলে ম্রিয়মাণ হইয়া উঠিল এবং দোলগোবিন্দ কাশিতে কাশিতে দম আটকাইয়া চোখ-মুখ স্থির করিয়া দিল।

সৌদামিনী হাঁকিল, ওরে, দেখ্‌ রে সব, শেষ হয়ে গেল যে!

সকলে প্রস্তরমূর্তিরবৎ বসিয়া রহিল। কাজেই দোলগোবিন্দকে বাধ্য হইয়া নিজে নিজেই সামলাইতে হইল।

গাঙ্গুলী মশায় কহিলেন, প্রকাশও মিণ্টাকে খ্রীষ্টানী মতে বিয়ে করেছে।

পদ্ম আর্তনাদ করিয়া উঠিল, অ্যাঁ! সে কি! একটা বেশ্যার সঙ্গে বিয়ে! পর-মুহূর্তেই ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ওমা, আমার কি হ'ল গো! পেত্নী গেল গেল, আমার ঘরের মটকা ভেঙে দিয়ে গেল গো! ওগো! যে আমার সর্বনাশ করলে, তার মাথায় বজ্রাঘাত হবে গো!

সভাভঙ্গের পর মন্নু আমাকে এক পাশে ডাকিয়া কহিল, সত্যি?

কহিলাম, হ্যাঁ, মিথ্যে লিখবে কেন?

বীরুও কাছে দাঁড়াইয়া ছিল; নিশ্চিন্তে নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, যাক, মেয়েটার জন্যে আর কোন ভাবনা নেই, না?

কহিলাম, না।

মণীন্দ্র বিদ্রূপের স্বরে কহিল, কিছু ভাবনা নেই। এক জামাই হারিয়েছ, আর এক জামাই পেলে। এর পর নাতি-নাতনী হবে, ভাবনা কি হে?—বলিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল। বীরু জবাব দিল না।

চলিতে চলিতে মণীন্দ্র কহিল, কি শয়তান মেয়ে! সব বেমালুম গোপন ক'রে ভাঁওতা মেরে আমার জাতটা মেরে দিয়ে গেল! দাদা ব'লেও আমাকে রেয়াত করলে না! পদ্ম যা বলেছে, সত্যি। মেয়েমানুষ নয়, পেত্নী। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, পদ্মর কান্না দেখলে কষ্ট হয়। একমাত্র ছেলেটাকে ভুলিয়ে নিয়ে চ'লে গেল! বীরুর দিকে তাকাইয়া কহিল, তুমি যে কিছুই বলছ না হে? মেয়ে-জামাইয়ের চিন্তায় মশগুল হয়ে গেলে যে!

বীরু কহিল, কি বলব ভাই? আমার নিন্দে করবার মুখ নেই।

মেয়েটাকে আমার জাহান্নমের হাত থেকে বাঁচিয়েছে যে, যাবার আগে সমস্ত ঋণ থেকে যে আমাকে মুক্তি দিয়ে গেছে, তার নিন্দে করলে যে ধর্মে সইবে না।

মণীন্দ্র থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, সত্যি?

বীরু কহিল, হ্যাঁ, যাবার আগে আমাকে ডাকিয়ে আমার দলিলটা নিজের হাতে ছিঁড়ে দিয়ে গেল।

মণীন্দ্র সক্ষোভে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, সবাইকে সব দিয়ে গেলি, শুধু ভাইয়ের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে দিয়ে গেলি হতভাগী!

পাড়ার সকলেই মাথা মুড়াইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিল। দিন কয়েকের জন্য সমস্ত পাড়াটা একটি বৌদ্ধ বিহারের মত দেখাইতে লাগিল। সরোজিনীর মত সাংঘাতিক মেয়েমানুষ যে এত অল্পেই সকলকে নিষ্কৃতি দিয়া গিয়াছে—ভাবিয়া সকলে আরামের নিশ্বাস ফেলিল। কিন্তু সরোজিনীকে কেহ ভুলিতে পারিল না; তিনু কাহাকেও ভুলিতে দিল না। প্রবোধ গাঙুলীর বাড়ির ফটকের পাশে দুইটা মোটা ও মজবুত শালকাঠের গুঁড়ি পুঁতিয়া, সে তাহাতে একটা তক্তার তৈয়ারি সাইন-বোর্ড আঁটিয়া দিল—"সরোজিনী কর্ম-মন্দির"।

দুই বেলা যাইতে আসিতে তাহা চোখে পড়ে ও সর্বনাশী সরোজিনীর কথা সকলকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

সক৮

॥ সমাপ্ত ॥